contents
কাসাসুল কুরআন-৯
আসহাবুল কাহ্ফ ওয়ার রাকিম
সাবা ও সাইলুল আরিম
আসাহাবুল উখদুদ বা কওমে তুব্বা
আসহাবুল ফিল
মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.
www.eelm.weebly.com

কাসাসুল কুরআন-৯

আসহাবুল কাহ্‌ফ ওয়ার রাকিম

সাবা ও সাইলুল আরিম

আসহাবুল উখদুদ বা কওমে তুব্বা

আসহাবুল ফিল

কাসাসুল কুরআন-৯

আসহাবুল কাহ্‌ফ ওয়ার রাকিম
সাবা ও সাইলুল আরিম
আসহাবুল উখদুদ বা কওমে তুব্বা
আসহাবুল ফিল

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

contents

কাসাসুল কুরআন-৯

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা

মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক

হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ২২০ [দুইশত বিশ] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [9]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 220.00
ISBN : 978-984-90977-4-7
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

সূচি

contents

আসহাবুল কাহ্‌ফ ওয়ার রাকিম

[আনুমানিক ১০০ খ্রিস্টাব্দ]

কুরআন মাজিদ ও আসহাবুল কাহ্ফ ওয়ার রাকিম

মুহাম্মদ বিন ইসহাক হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এ-বিষয়ে পরামর্শ হলো যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মকাণ্ড বেশ গুরুতর হয়ে উঠেছে। সে সত্যবাদী না-কি মিথ্যাবাদী এ-ব্যাপারে কোনো নিশ্চিন্ত মীমাংসায় পৌঁছা উচিত, যাতে আমরা তাঁর ব্যাপারে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে পারি। আর এই সমস্যাটির সমাধান মদিনার ইহুদিদের মাধ্যমে করাই সঙ্গত হবে। কেননা, ইহুদিরা নিজেদেরকে আহলে কিতাব বলে থাকে এবং এ-ধরনের কর্মকাণ্ডে তারা বেশ বিচক্ষণ।

কুরাইশরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে নদর বিন হারিস ও উতবা বিন মুয়িতের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল ইহুদিদের আলেমদের কাছে প্রেরণ করলো। ইহুদিদের আলেমগণ তাদেরকে জানালেন যে, তোমরা তাঁকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করবে, যদি তিনি সেগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর সত্য রাসুল। তোমাদের জন্য তাঁর বিরোধিতা করা কখনো উচিত হবে না। আর যদি তিনি প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে অক্ষম হন, তবে তাঁর সঙ্গে তোমাদের যা ইচ্ছা করো। প্রশ্নগুলো হলো : ১. যুলকারনাইনের ঘটনা কী? ২. আসহাবে কাহ্ফ কারা ছিলো এবং তাদের ব্যাপারে কী ঘটেছিলো? ৩. আত্মার স্বরূপ কী?

প্রতিনিধি দল মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশের নেতৃবৃন্দকে বিস্তারিত অবস্থা জানালো। কুরাইশদের এই পরামর্শটি বেশ পছন্দ হলো। তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ওই প্রশ্ন তিনটি উপস্থাপন করলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওহি আসার পর আমি এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেবো। পরে ওহির মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনাগুলোর বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করা হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা কাহ্ফের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করে ঘটনাগুলোর বাস্তবতা তাদের সামনে তুলে ধরলেন।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا () إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ
إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا () فَضَرَبْنَا
عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا () ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا
لَبِثُوا أَمَدًا () نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ
هُدًى () وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ
نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا () هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا
يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا () وَإِذِ
اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا () وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ()
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ()
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ()
إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا
() وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ
يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا
عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا () سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ
خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي
أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ
مِنْهُمْ أَحَدًا () وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا () إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ

رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا () وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا () قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (سورة الكهف)

"তুমি কি মনে করো[১] যে, গুহা ও রাকিমের[২] অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর? যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিলো তখন তারা বলেছিলো, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।' তারপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।[৩] পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম জানার জন্য যে, দুই দলের[৪] মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। আমি তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি : তারা ছিলো কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিলো এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। এবং আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়ালো তখন বললো, 'আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্যকোনো ইলাহকে আহ্বান করবো না; যদি করে বসি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত (কাজ) হবে। আমাদের এই স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে। তারা এইসব ইলাহর ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেনো? যে-ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর

---

[১] ইহুদিদের পরামর্শে কুরাইশরা গুহাবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। তারই জবাবে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

[২] رقيم শব্দটির কয়েকটি অর্থ আছে; বিশেষ দুটি অর্থ এই : ১. যেখানে গুহা অবস্থিত ছিলো সেই পর্বত বা পল্লীর নাম; ২. ফলক, যাতে গুহাবাসীর নাম ও বিবরণ খোদিত ছিলো।—লিসানুল আরব।

[৩] فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ একটি আরবি বাগধারা, এর অর্থ ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া।—লিসানুল আরব।

[৪] একদল আসহাবুল কাহ্ফ, আর একদল যারা তাঁদেরকে অনুসরণ করতে গিয়েছিলো, তারা।

কে?' তোমরা যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। তুমি দেখতে পেতে—তারা গুহার প্রশস্ত চত্তরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পাশে হেলে যায় এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে, এইসব আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাঁকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনো তার কোনো পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না। তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিলো নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং তাদের কুকুর ছিলো সামনের পা দুটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে। এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো?' কেউ কেউ বললো, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' কেউ কেউ বললো, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ করো। সে যেনো দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে যেনো কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য। সে যেনো বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করে এবং কিছুতেই যেনো তোমাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জানতে না দেয়। তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথরের আঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং সে-ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।' এইভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক[৫]

---

[৫] ইকরামা রহ. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী তারা কিয়ামত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করছিলো। ভিন্নমতে আসহাবুল কাহফের সংখ্যা, তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তারা

করছিলো তখন অনেকে বললো, 'তাদের ওপর সৌধ নির্মাণ করো।' তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললো, 'আমরা তো নিশ্চয় তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করবো।' কেউ কেউ বললো, 'তারা ছিলো তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর' এবং কেউ কেউ বললো, 'তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিলো তাদের কুকুর', (কথাটা বললো) অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বললো, 'তারা ছিলো সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।' বলো, 'আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন'; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং তাদের কাউকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না। কখনোই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, 'আমি তা আগামী কাল করবো', 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে'—এই কথা না বলে। যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো এবং বলো, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে তা (গুহাবাসীর বিবরণ) অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।' তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশো বছর, আরো নয় বছর। তুমি বলো, 'তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহই ভালো জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাদের অন্যকোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরিক করেন না।" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৯-২৬]

কাহ্ফ ও রাকিম

অভিধানে পাহাড়ের অভ্যন্তরীণ প্রশস্ত গুহাকে কাহ্ফ বলা হয়। অবশ্য রাকিম শব্দের অর্থ কী এ-ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। আদ-দাহ্হাক বিন মুযাহিম আল-হিলালি ও ইসমাইল বিন আবদুর রহমান আস-সুদ্দি রহ. প্রতিটি তাফসিরি রেওয়ায়েতকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর প্রতিই সম্পৃক্ত করেছেন। এ-ব্যাপারেও তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত

বিতর্ক করছিলো বা তাদের জন্য সৌধ নির্মাণ করা নিয়ে বিতর্ক করছিলো।—জালালাইন।

করেছেন। ১. রাকিম শব্দটি রাকম থেকে উদ্ভূত এবং রাকিম শব্দটি এখানে মারকুম (মাকতুব বা লিখিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৎকালীন বাদশাহ তাঁদের সন্ধান লাভের পর তাদের নাম একটি প্রস্তরখণ্ডে খোদাই করে রেখেছিলো। এ-কারণে তাঁদেরকে আসহাবুর রাকিম (শিলালিপিওয়ালা) বলা হয়েছে। সাঈদ বিন জুবাইর রহ. এই মতেরই সমর্থন করেন এবং মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে এই মতই প্রসিদ্ধ। ২. যে-পাহাড়ে এই গুহাটি অবস্থিত ছিলো এটি ওখানকার উপত্যকার নাম ছিলো রাকিম। ওই গুহার মধ্যে আসহাবুল কাহ্‌ফ আত্মগোপন করে ছিলেন। কাতাদা রহ., আতিয়্যা আওফি এবং মুজাহিদও এই মতেরই সমর্থন করেন। ৩. যে-পাহাড়ে গুহাটি অবস্থিত ছিলো তার নাম রাকিম। ৪. ইকরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم ؟ كتاب أم بنيان.

"আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, আমি জানি না রাকিম কী; কোনো শিলালিপি না-কি প্রাসাদ।"[৬]

৫. কা'ব আল-আহবার, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাকিম হলো আইলার (আকাবার) নিকটবর্তী একটি শহর। এটি রোম রাজ্যে অবস্থিত।

ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রেক্ষিতে শেষোক্ত মতটিই সঠিক এবং কুরআনুর কারিমের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য বক্তব্যগুলো নিছক ধারণা ও অনুমান নির্ভর।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্তসার বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের কিছু পাতা পাঠ করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা হযরত ইসা আ.-এর প্রেরিত হওয়ার কিছুকাল পরের ঘটনা। এটি আনবাত [আনবাত নাবত-এর বহুবচন] সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা। এই আনবাত কারা ছিলো এবং তাদের আবাসস্থল ও জন্মভূমি কোথায়—এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

আরব ইতিহাসবিদগণ আনবাত সম্প্রদায়গুলো সম্পর্কে সাধারণত বর্ণনা করেন যে, তারা অনারব বংশোদ্ভূত। এবং এ-কারণে তারা নাবতিদেরকে

---

[৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০।

আরবদের প্রতিপক্ষ স্থির করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। আরব ইতিহাসবেত্তাদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বক্তব্য, তাওরাতের ভাষ্য এবং রোমান ও গ্রিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে, নাবতিরা খাঁটি আরব এবং তারা ইসমাইলি বংশোদ্ভূত। তবে যাযাবর জীবনযাপন ত্যাগ এবং হিজায থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ফলে তারা আরবদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে পড়েছিলো। এমনকি তারা নিজেরাও ভুলে গিয়েছিলো যে, আরবদের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক। এ-ব্যাপারে হযরত উমর ফারুক রা.-এর একটি উক্তি বিখ্যাত হয়ে আছে—

قال عمر رضي الله تعالى عنه (تعلموا النسب و لا تكونوا كنبط السواد) إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا

'হযরত উমর রা. বলেন, "তোমরা বংশবিদ্যা শিখে রাখো। ইরাকের নাবতিদের মতো হয়ো না।" কেননা, তাদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন বংশের, সে জবাব দেয়, আমি অমুক এলাকার অধিবাসী।'[৭]

কিন্তু 'আনবাত'-এর আলোচনা পরিত্যাগ করে যখন আরব ইতিহাসবিদদের জিজ্ঞেস করা হয় 'নাবত' বা 'নাবিত' কারা, তখন তারা কোনো ধরনের মতভেদ না করেই তৎক্ষণাৎ জবাব প্রদান করেন যে, 'ইবনে ইসমাইল আ.', অর্থাৎ, হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর। কারণ, হযরত ইসমাইল আ.-এর বারোজন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিলো 'নাবিত' বা 'নাবত'।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ-ব্যাপারে লিখেছেন—

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولديه نابت وقيذر، وكان الرئيس بعده والقائم بالامور الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل وهو ابن أخت الجرهميين.

---

[৭] মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪।

ثم تغلبت جرهم على البيت طمعا في بني أختهم فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني إسماعيل مدة طويلة فكان أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر بن نبت بن جرهم.

"হিযাজবাসী সমস্ত আরবের বিভিন্ন গোত্রের বংশধারা হযরত ইসমাইল আ.-এর দুই পুত্র 'নাবিত' ও 'কিদার' পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়। আর হযরত ইসমাইল আ.-এর মৃত্যুর পর নাবিত বিন ইসমাইল তাঁর স্থলাভিষিক্ত শাসক হন; তিনি সমস্ত বিষয়ের নির্বাহী, মক্কার শাসনকর্তা এবং যমযম ও কাবা শরিফের তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত হন। নাবিত বনি জুরহামের ভাগ্নে ছিলেন।"

"এরপর (নাবিতের মৃত্যুর পর) জুরহাম তাদের বোনের বংশধরদের সঙ্গে সম্পর্কের দাবিতে কা'বার (মক্কার) দখলদারিত্ব গ্রহণ করে এবং হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধরদের পরিবর্তে জুরহামের বংশধরেরাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত মক্কা ও তার আশপাশের এলাকা শাসন করে। নাবিত বিন ইসমাইলের পরে প্রথম যিনি কা'বার (মক্কার) কর্তৃত্ব বুঝে নেন তিনি হলেন মাদাদ বিন আমর বিন সাদ বিন রাকিব বিন ইবার বিন নাবত বিন জুরহাম।"[৮]

কিন্তু এর পরে নাবিত বা নাবত বিন ইসমাইল আ.-এর বংশ যখন অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলো তখন হিজাযের ভেতরেই কি তাদের বসবাস সীমাবদ্ধ ছিলো না আশপাশের অন্যান্য এলাকায়ও তারা ছড়িয়ে পড়েছিলো, যদি তারা আশপাশে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে থাকে তবে তাদের বসতি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো—এ-ব্যাপারে আরব ইতিহাসবিদগণ নীরব থেকেছেন।

অবশ্য ইবনে খালদুন এ-বিষয়ে কিছুটা অতিরিক্ত তথ্য যোগ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"নাবিত বিন ইসমাইল বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লি হয়েছিলেন এবং তাঁর ভাইদের সঙ্গে মক্কাতেই বসবাস করেছিলেন। তাঁর বংশধররা বৃদ্ধি পেয়ে

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২।

যখন মক্কায় স্থান সংকুলান হচ্ছিলো না তখন তারা হিজাযের আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো।"[৯]

অবশ্য তাওরাত এ-বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় যা-কিছু বলেছে তা প্রকৃত সমস্যার সমাধানে বেশ সহায়ক ও সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছে। তাওরাত প্রথমে হযরত ইসমাইল আ.-এর বারোজন পুত্রের তালিকা প্রদান করেছে। তারপর বলেছে, নাবিতের বংশধরগণ সায়ির (সিরাত পর্বত) পর্যন্ত, অর্থাৎ, হিজায থেকে শাম এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং আইলা (আকাবা)-ও তাদের দখলে চলে গিয়েছিলো। তাওরাতে নাবিত শব্দটিও বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়েছে : কোথাও নাবিত (نبيت), কোথাও নাবিত (نبيط) এবং কোথাও নাবাইউত (نبايوط) বলা হয়েছে।

তাওরাতের বর্ণনাগুলো এমন—

"এগুলো হলো হযরত ইসমাইল আ.-এর পুত্রদের নাম। তাঁদের নাম ও বংশপরম্বপরার তালিকা : ইসমাইল আ.-এর প্রথম পুত্রের নাম নাবিত, তারপর কিদার, উবাইল, বিসাম, মিসমা, দুমা, মানশা, হাদার, তাইমাহ, আতওয়ার, নাফিস ও কাদমাহ।"[১০]

নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে জেরুজালেমকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

"অন্য সম্প্রদায়গুলোর সম্পদ তোমার (জেরুজালেমের) কাছে এসে পুঞ্জীভূত হবে—উটের সারিগুলো এবং মাদয়ান ও উনাফার উটগুলো তোমার আশেপাশে এসে সমবেত হবে। আর সাবার যা-কিছু সম্পদ তাও তোমার কাছে একত্র হবে। কিদারের সব ভেড়ার পাল তোমার কাছে এসে হাজির হবে। নাবিতের ভেড়ার পালগুলোও তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে।"[১১]

আর নবী হিযকিল আ.-এর সহিফায় আছে—

"আর নাবাউতের (নাবিতের) ভেড়াগুলো মান্নত হিসেবে গৃহীত হবে।"[১২]

---

[৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

[১০] তাকবিন, অধ্যায় ২৫, আয়াত ১৩-১৪।

[১১] তাকবিন, অধ্যায় ২১, আয়াত ১৪।

[১২] তাকবিন, অধ্যায় ২৫, আয়াত ১৮।

আর সিফরে তাকবিনে নাবিতের বসবাসের এলাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"আর তারা হাবিলা থেকে শোর এলাকা পর্যন্ত—মিসরের সামনের যে-পথ দিয়ে আসুরে যাওয়া যায় তাতে অবস্থিত—বসবাস করতো। তার সম্পূর্ণ ভূখণ্ডটি তাদের সকল ভাইয়ের সামনেই ছিলো।"[১৩]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের বিবরণ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য নাবতিদের সমসাময়িক রোমান ইতিহাসবিদদের সাক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তা থেকে সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আনবাত ও হযরত ইসমাইল আ.-এর পুত্র নাবিতের বংশধরগণ একই লোক। তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতিহীন জীবন পরিত্যাগ করে সভ্যতাপূর্ণ জীবনযাপন অবলম্বন করেছিলো।

রোমান ইতিহাসবিদ ইউসিফাস খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গত হয়েছেন এবং তিনি আনবাত বা নাবতিদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

"লোহিত সাগর থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত এলাকাটি ইসমাইলের বারো পুত্রের দখলে রয়েছে। এ-কারণে জায়গাটির নাম হয়েছে নাবুতিনা (Nabotena/نبوطينة)। পশ্চিম দিকে তার সীমা মিসর ও আরবের প্রস্তরময় ভূখণ্ড (Petania Nabayot) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এবং অনেক মরুভূমি ও উঁচু-নিচু ভূমি তার অন্তর্ভুক্ত, যা পূর্ব দিকে পারস্য সাগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। সাধারণভাবে এই ভৌগলিক এলাকার অধিবাসীদের নাম নাবাউতে আরব (Nabayotn)।"[১৪]

আর খ্রিস্টপূর্ব ৮০ শতকের ইতিহাসবিদ ডাইডোরাস বর্ণনা করেন—

"আইলা (আকাবা) উপসাগরের পাশে আনবাত অবস্থিত।"[১৫]

অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন—

---

[১৩] তাকবিন, অধ্যায় ২৫, আয়াত ১৮।

[১৪] আরদুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১, গোল্ড কায়েস অব রীন থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২২৫, এন্টি ১২।

[১৫] আরদুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১, গোল্ড কায়েস অব রীন থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২২৫, এন্টি ১২।

"ওপরের দিকে গিয়ে তুমি ·আকাবা (আইলা) উপসাগরের তীরে পৌঁছবে। তীরের সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেক আরব বসবাস করে। তাদেরকে নাবতি বলা হয়।"[১৬]

আর প্রত্নতত্ত্ব ও শিলালিপিসমূহে নাবতিদের নাম সর্বপ্রথম ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে খোদিত হয়েছে বলে দেখা যায়। এতে আশুর বনিপাল শাহে আসিরিয়ার শিলালিপিতে তাঁর নিজের বিজিতদের তালিকায় শাহে নাবত নাতানের আলোচনা করেন।[১৭]

এসব বিবরণ পাঠ করার পর এই সত্যটি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আইলা (আকাবা) উপসাগর থেকে শাম পর্যন্ত এবং মিসরীয় উপকূল থেকে পারস্য সাগর পর্যন্ত, উপরিউক্ত বর্ণনা অনুযায়ী যে-সম্প্রদায়কে ক্ষমতাসীন দেখা যায় তারা নাবিত বিন ইসমাইল আ.-এর বংশধর। তাদেরকে 'নাবত', 'আনবাত', 'নাবাইউত' ও 'নাবিত' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

অবশ্য মনে একটি খটকা লাগে যে, নাবিত বিন ইসমাইল আ.-এর বংশধর সম্পর্কে তাওরাত ও রোমান ইতিহাসবিদগণ বিস্তারিতভাবে অবগত আছেন, অথচ এতদিন পর তারা নিজেদের ভাই আরববাসীদের দৃষ্টিতে এতটা অপরিচিত কেনো? বরং, স্বয়ং নাবতিরা কেনো ভুলে গেলো যে, তারা আরব বংশোদ্ভূত, হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর? এ-ব্যাপারে হযরত ইয়াকুত হামাবি রহ.-এর একটি বাক্যের মাধ্যমে সহজেই জবাব দেয়া যেতে পারে। ইয়াকুত হামাবি রহ. 'আরাবা' শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করেন—

وأما النبطيُّ فكل من لم يكن راعياً أو جندياً عند العرب من ساكني الأرضين.

"পশুচারক নয় বা যোদ্ধা নয় এমন প্রতিটি মানুষই আরবদের কাছে নাবতি বলে গণ্য হয়ে থাকে।"[১৮]

এ থেকে বুঝা যায়, হিজায থেকে বের হয়ে দীর্ঘদিন পরে নাবতিরা যাযাবর ও যোদ্ধাজীবন ত্যাগ করেছিলো এবং সভ্য ও শহুরে জীবনযাপন অবলম্বন করেছিলো। ফলে ধীরে ধীরে আরবদের দৃষ্টিতে নাবিত বিন

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০।
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০।
[১৮] মুজামুল বুলদান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৯।

ইসমাইলের বংশধরগণ অপরিচিত হয়ে ওঠে। তারা নাবতিদেরকে অনারব শাসকশ্রেণির মতোই মনে করতে থাকে। নাবতিদের থাকা-খাওয়া, সামাজিক সংস্কৃতি ও অন্যান্য অবস্থার পার্থক্য ওই হিজাযিদের থেকে পৃথক করে দিয়ে তাদের ভাইদের দৃষ্টির ওপর আবরণ সৃষ্টিকারী পর্দা টেনে দেয়।

ইতিহাসবিদদের কাছে নাবতিদের শাসন-বলয় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন যুগের সম্প্রদায়ের শাসনবলয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১. সামুদ সম্প্রদায়ের রাজ্য ছিলো 'ওয়াদিউল কুরা', এটির রাজধানী ছিলো বিখ্যাত শহর 'হিজর'। ২. মাদয়ান রাজ্য, মাদয়ান শহরই ছিলো এই রাজ্যের রাজধানী। ৩. আদওয়াম রাজ্য, এই রাজ্যের রাজধানী ছিলো রাকিম।

নাবতিদের শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে শুরু হয়ে ১০৬ খ্রিস্টাব্দে এসে শেষ হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শুরুর দিকেই রোমানরা নাবতিদের ওপর আক্রমণ করে, তাদেরকে পরাজিত করে এবং রাকিম ও তার পুরো এলাকা দখল করে নেয়। কেবল হিজর এলাকাটি নাবতিদের দখলে থেকে যায়। ১০৬ খ্রিস্টাব্দে হিজরও তাদের হস্তচ্যুত হয়। ফলে চিরকালের জন্য নাবতিদের শাসনক্ষমতার অবসান ঘটে। রোমানরা রাকিম দখল করে নেয়ার পর এটিকে তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে। জায়গাটির রাকিম নাম বদল করে তারা এর নাম রাখে পেত্রা।

পেত্রাই ওই রাকিম, কুরআন মাজিদের আসহাবুল কাহ্ফের ঘটনায় যার উল্লেখ রয়েছে—

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

"তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর?"

এই শহরেরই কয়েকজন ভাগ্যবান মানুষ মূর্তিপূজা ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন এবং মূর্তিপূজক শাসকদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এই শহরেরই পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর উক্তি—রাকিম হলো আইলার নিকটবর্তী একটি শহর এবং তা ছিলো রোমান এলাকার অন্তর্ভুক্ত—সম্পূর্ণ সঠিক এবং কুরআন মাজিদের বর্ণনা হুবহু

অনুরূপ। রাকিম শহরটি নিঃসন্দেহে আইল (আকাবা) উপসাগরের কাছে অবস্থিত ছিলো। রোমানরা এই এলাকা দখল করে নিয়েছিলো। সুতরাং রাকিমকে রোমানদের এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা সম্পূর্ণ সঠিক।
কিন্তু ইতিহাসের এই পরিবর্তনে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। রোমানরা নাবতিদের কেন্দ্রীয় শহরটিকে দখল করে এটির নাম পেত্রা রাখার পর অল্প দিনের মধ্যেই এই নামটি বেশ খ্যাতি অর্জন করে ফেলে। আরব ও অনারব সবাই তার শিল্পকলা ও অন্যান্য সুকুমার বৃত্তির বৈচিত্র্যে এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়লো যে, শহরটির আসল নাম তারা ভুলে গেলো এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাদের কাছে রাকিম একটি অপরিচিত ও অজ্ঞাত নাম হয়ে উঠলো। এমনকি আরবে অধিবাসীরাও এটিকে পেত্রা নামেই স্মরণে রাখলো। এর পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, কুরআন মাজিদ যখন শহরটির আসল নাম বললো, তখন অন্যদের মতো আরবরাও বিস্মিত হয়ে পড়লো রাকিম কি কোনো গুহার নাম, না লোহার কোনো পাতের নাম, না কোনো পাহাড়ের নাম, না কোনো শহরের নাম! কিন্তু নাবতিদের ভাই হিজাযিরা যে-নামটিকে ভুলে গিয়েছিলো তাওরাত তার বর্ণনায় সেটিকে সংরক্ষিত করে রেখেছিলো। যাতে উম্মি নবী যখন ওহির মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের ঘোষণা করেন তখন ওই বর্ণনা নবীর সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে।[১৯]
গত বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে আরো নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো রাকিম বা পেত্রা নগরীর আবিষ্কার। এই নগরীর ব্যাপারে যতটুকু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলেছে তার মাধ্যমে কুরআন মাজিদের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে।
আইল (আকাবা) উপসাগর থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হলে পর্বতরাশির দুটি সমান্তরাল সারি দেখা যায়। এখানকরাই একটি পর্বতের চূড়ায় নাবতিদের রাজধানী রাকিম অবস্থিত ছিলো।
বর্তমান সময়ে এই নগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের যে-পরিমাপ করা হচ্ছে তাতে নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার পর্বতসমূহের আশ্চর্যজনক

---

[১৯] সিফরে আদাদ, তাওরাত এবং নবী ইয়াসা'ইয়ার সহিফায় এই শহরটির নাম রাকিম (راقيم) বর্ণিত হয়েছে।—দায়িরাতুল মাআরিফ।

ও বিস্ময়কর গুহাগুলোও উল্লেখযোগ্য। এসব গুহা বেশ প্রশস্ত এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। গুহাগুলো এমনভাবে রয়েছে যে সূর্যের আলো ও উত্তাপ তাতে পৌঁছতে পারে না। একটি গুহা এমনও আবিষ্কৃত হয়েছে যে, তার মুখের ওপর প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। ওখানে অনেক খুঁটির ভগ্নাবশেষও রয়ে গেছে। ধারণা করা হয় যে, তা ছিলো কোনো ইবাদতখানার ইমারত।

এসব স্পষ্ট ও পরিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের পর এ-কথা বলা খুবই সহজ হয়ে যায় যে, কুরআন মাজিদ যে-আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনা করেছে তা এই রাকিম নগরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ঘটনা

ইসমাইলি বংশোদ্ভূত আরবদের ধর্ম সম্পর্কে ইতিহাস এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাদের মধ্যে কিছুকাল পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের সত্যধর্ম মিল্লাতে ইবরাহিম অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা মিসর, শাম ও ইরাকের মূর্তিপূজকদের সংস্পর্শে আসে এবং আমর বিন লুহাই কর্তৃক তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার কিছুকাল পর আরবের অধিবাসীরা শিরকে এতটাই সিদ্ধি অর্জন করেছিলো যে, তারা অন্যদের অগ্রনায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ফলে নাবিতের বংশধররাও শিরকের পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলো এবং তাদের বিখ্যাত মূর্তিগুলো ছিলো যুশ-শিরা, লাত, মানাত, হুবাল, কাসআ, আমইয়ানিস ও হুরাইশ।[২০] বহু শতাব্দী পর্যন্ত নাবতিরা মূর্তিপূজার পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত ছিলো।

ইতোমধ্যে হযরত ইসা আ.-এর যুগের প্রথম দিকে নাবতিদের রাজধানী রাকিমে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ—

খ্রিস্টধর্মের প্রাথমিক যুগ চলছে। নাবতিদের শাসনাধীন রাজ্যগুলোতে অর্থাৎ শাম ইত্যাদি অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। এ-সময় রাকিমের কয়েকজন পবিত্রাত্মা যুবক শিরকে অসন্তোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং তাঁরা একত্ববাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ফলে তাঁরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে এই সংবাদ তৎকালীন বাদশাহর কানে পৌঁছে। বাদশাহ যুবকদেরকে তাঁর দরবারে ডেকে নেন এবং তাঁদের অবস্থা কী

---

[২০] আল-আসনাম, ইবনুল কালবি।

তা জিজ্ঞেস করেন। যুবকেরা নির্ভয়ে ও সাহসের সঙ্গে আল্লাহর বাণী উচ্চারণ করেন। বাদশাহ ব্যাপারটিকে অপছন্দ করেন। তারপরও তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য যুবকদেরকে কিছুদিনের অবকাশ দেন। যুবকেরা বাদশাহর দরবার থেকে ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, কোনো পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থাকা উচিত। এতে মুশরিকদের ক্ষতিসাধন থেকে আত্মরক্ষা করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারবো। এই সিদ্ধান্তে র পর তাঁরা কোনো গুহায় আত্মগোপন করলেন। তাঁরা পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করার পর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করেন। নিদ্রামগ্ন থেকেই তাঁরা পাশ পরিবর্তন করতে থাকে। গুহাটির অবস্থা আশ্চর্যজনক, অভ্যন্তরে অত্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা গুহাটিকে এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, তাতে জীবনরক্ষার সব প্রাকৃতিক উপকরণ বিদ্যমান। একদিকে আছে গুহার মুখ, আর অপর দিকে আছে বায়ু চলাচলের পথ। এর মাধ্যমে সবসময় সতেজ বায়ু ভেতরে প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে যায়। গুহাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাভে অবস্থিত। ফলে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় তার কিরণ ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না; কিন্তু মৃদু ও হালকা আলো সবসময়ই পৌঁছতে পারে। গুহাটিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সেটি এমন অন্ধকারও নয় যে, তাতে কোনোকিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, আবার তা উন্মুক্ত মাঠের মতো এত বেশি আলোকিতও নয়। ঠিক এ-অবস্থায় কয়েকজন মানুষ গুহাটিতে নিদ্রামগ্ন। তাদের সঙ্গী কুকুরটি সামনের পা দুটি ছড়িয়ে দিয়ে গুহার মুখে বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছে।

এসব বিষয় একত্র হয়ে এমন এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে যে, পর্বতমালার মধ্যে এই গুহাটির অভ্যন্তরে কেউ উঁকি দিলে ভয়ে তার আত্মা কেঁপে ওঠে এবং সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

বহু বছর পর্যন্ত এই যুবকেরা গুহার অভ্যন্তরে এই অবস্থায় আরামের সঙ্গে নিদ্রামগ্ন ও সুরক্ষিত থাকেন। ইতোমধ্যে শহরে বিপ্লব ঘটে যায়। রোমান খ্রিস্টানরা নাবতিদের রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে। তারা শত্রুদেরকে পরাজিত করে এবং তাদের রাজ্য দখল করে নেয়। এভাবে রাকিম (পেত্রা নগরী) খ্রিস্টানদের শাসনাধীন চলে যায়। তারপর আল্লাহ ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত হলো যে, এই যুবকেরা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হোক। ফলে তাঁরা

জাগ্রত হলেন। তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কতদিন নিদ্রিত ছিলাম? একজন জবাব দেন, এক দিন। আর একজন বলেন, অথবা এক দিনের কিছু অংশমাত্র। তারপর তাঁরা বলেন, আমাদের কেউ একজন শহরে গিয়ে খাবার নিয়ে আসুক এবং এই মুদ্রাটি নিয়ে যাক। কিন্তু যে-ই যাক, এমনভাবে লেনদেন করবে, যাতে শহরবাসীর কেউই বুঝতে না পারে আমরা কে এবং আমরা কোথায় আছি। তা না হলে আমাদের ওপর বিপদ আপতিত হবে। বাদশাহ একে তো অত্যাচারী, তার ওপর মুশরিক। হয়ত সে আমাদের বাধ্য করতে মুশরিক ও বিধর্মী হয়ে যেতে, অথবা আমাদের হত্যা করে ফেলবে। ফলে ফলে এসব কর্মকাণ্ড আমাদের দীন ও আখেরাত দুটোরই ধ্বংসকারী সাব্যস্ত হবে।

তারপর যুবকদের মধ্য থেকে একজন মুদ্রাটি নিয়ে শহরে গমন করলেন। শহরে গিয়ে দেখলেন সার্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। নতুন মানুষ ও নতুন সংস্কৃতি দেখা যাচ্ছে। তারপরও তিনি ভয়ে ভয়ে একজন বাবুর্চির দোকানে গিয়ে পৌছলেন। খাদ্য ও পানীয় বস্তু ক্রয় করলেন। মূল্য পরিশোধ করার সময় তিনি যখন মুদ্রাটি দিলেন, বাবুর্চি দেখলো মুদ্রাটি বেশ প্রাচীন। এইভাবে অবশেষে ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়লো। মানুষ যখন প্রকৃত ঘটনাটি জানলো, তারা যুবকটিকে অভ্যর্থনা জানালো। যুবকদের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনাটি শহরবাসীর চিত্ত বিমোহিত করলো। কেননা, অনেক কাল আগেই ওখানকার মুশরিক বাদশাহর রাজত্বের পতন ঘটেছিলো এবং ওখানকার অধিবাসীরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো।

যুবকটি সব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। খ্রিস্টধর্মের বিস্তারলাভে তিনি অত্যন্ত পুলকিত হলেন। তবুও তিনি তাঁর নিজের ও সঙ্গীদের জন্য দুনিয়ার ঝুট-ঝামেলা থেকে বেঁচে আল্লাহ তাআলার স্মরণে দিন কাটিয়ে দেয়াটাকেই পছন্দ করলেন। তিনি জনতার হাত থেকে কোনোভাবে আত্মরক্ষা করে পাহাড়ের পথ ধরলেন। তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌছে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। অপরদিকে শহরবাসীদের মধ্যে যুবকদের অনুসন্ধানের আগ্রহ দেখা গেলো। তারা অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে পর্বতের এক গুহায় যুবকদের দেখা পেলো। লোকেরা তাঁদেরকে জোর অনুরোধ জানালো যে, তাঁরা যেনো শহরে গমন করে শহরবাসীদের সঙ্গে অবস্থান করেন এবং তাঁদের পবিত্র সাহচর্যের দ্বারা

জনগণের উপকার করেন। কিন্তু যুবকেরা কোনেক্রমেই রাজি হলেন না এবং তাঁরা তাদের জীবনের বাকি অংশটুকু ওই গুহায় সংসারত্যাগী জীবনযাপনেই অতিবাহিত করলেন।

যখন আল্লাহ-অন্তপ্রাণ এই সংসারত্যাগী যুবকেরা মৃত্যুবরণ করলেন, লোকদের মধ্যে কথাবার্তা বলাবলি হতে লাগলো যে, তাঁদের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা আবশ্যক। লোকদের মধ্যে যাঁরা ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী ছিলেন তাঁরা বললেন, আমরা তাদের গুহার ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করবো। তাঁরা গুহার মুখে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, শহরে গমনকারী ওই যুবকের পেছনে তৎকালীন বাদশাহ ও জনসাধারণ আগমন করে। কিন্তু তারা গুহার কাছে আসার পর জানতে পারে না যে যুবকটি কোন দিকে চলে গেছেন। বহু অনুসন্ধান করেও তারা আসহাবে কাহ্ফের দেখা পেলো না। অগত্য তারা শহরে ফিরে গেলো এবং যুবকদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওই পাহাড়ের ওপর একটি ইবাদতখানা (মসজিদ) নির্মাণ করলো।

ঘটনাটির ঐতিহাসিক মর্যাদা

আল্লামা ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ও অন্যান্য মনীষীর রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, এই ঘটনা হযরত ইসা আ.-এর আবির্ভাবের কিছুকাল পরের। অর্থাৎ, এটি হযরত ইসা আ.-এর যুগের প্রথম দিকের ঘটনা। কিন্তু এই বক্তব্যে আমার একটি সন্দেহের উদ্রেক হয়। ব্যাপারটা হলো, এই ঘটনার শানে-নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আসহাবে কাহ্ফের ব্যাপারে ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলো যে, তারা যেনো অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রশ্নটিও করে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, এই ঘটনার বিষয়ে ইহুদিদের বিশেষ আগ্রহ ছিলো। সুতরাং, এই ঘটনা যদি খ্রিস্টধর্মের উৎকর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তবে তার ব্যাপারে ইহুদিদের এত আগ্রহের কারণ কী হতে পারে? ইহুদি

ও খ্রিস্টানদের মধ্যে তো সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এই দুই দল পরস্পর বিরোধী। এতে মনে হয় যে, আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা হযরত ইসা আ.-এর আগমনের বহু পূর্বে ইহুদিদের যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[২১]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু ঐতিহাসিক সনদসমূহ এর সমর্থন করে না। বরং ইতিহাস যে-সিদ্ধান্ত দেয়া তা এর বিপরীত। কেননা, এটা স্বীকৃত যে, আলোচ্য ঘটনাটি রাকিম শহরে ঘটেছিলো। আর এটাও স্বীকৃত বিষয় যে, রাকিম শহরটি তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে কখনোই ইহুদি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তা ছাড়া নাবতিদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিলো। রোমানরা রাকিম দখল করে নিলে তা খ্রিস্টধর্মের অধীন চলে আসে। এই দুই যুগেই রাকিমের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সুতরাং, একটি বিশেষ সূক্ষ্ম কারণের প্রেক্ষিতে নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কী করে আসহাবে রাকিমের ঘটনাকে ইহুদিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে? আরো একটি বিষয়ের মাধ্যমে এই ঘটনা যে ইহুদিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তার সমর্থন পাওয়া যায়। খ্রিস্টধর্মের প্রাথমিক যুগে এই ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। মুশরিক ও মূর্তিপূজক বাদশাহদের ভয়ে অনেক নাসারা গুহা ও পর্বতমালায় পালিয়ে গিয়ে সংসারত্যাগী জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন, আফসুন শহরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো। আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো আন্তাকিয়া শহরে। রোম শহরে ঘটেছিলো একইরকম আরেকটি ঘটনা। কুরআন মাজিদ এমনই একটি ঘটনার সংবাদ প্রদান করছে, যা রাকিম শহরে ঘটেছিলো।

এই প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর রেওয়ায়েতের ব্যাপারে দুটি কথার একটিকে মেনে নিতে হবে। প্রথমত, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়েতে যে-তিনটি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে তা থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, তার দুটি প্রশ্ন কেবল ইহুদি আলেমগণ কর্তৃক প্রণীত ছিলো এবং এগুলোর ব্যাপারে মক্কার মুশরিকরা সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলো। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নটি অর্থাৎ আসহাবুল কাহ্ফ বিষয়ক প্রশ্নটি সম্পর্কে মক্কার কুরাইশরাও কিছুটা অবহিত ছিলো। কারণ, এই ঘটনা তাদের অতি নিকটবর্তীকালে ঘটেছিলো। তারা 'রাকিম' শব্দটিকে ভুলে

---

[২১] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড; আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

গেলেও পেত্রা সম্পর্কে বেশ অবগত ছিলো। আর শামে (সিরিয়ায়) ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে নাবতিদের সঙ্গে সবসময়ই তাদের যোগাযোগ হতো। আর আসহাবুল কাহ্‌ফের ঘটনাটাও খুব বেশি প্রাচীন কালের ছিলো না। ফলে সম্ভবত এই ঘটনার কিছু কিছু সাধারণ বিষয় আরবরা অবহিত ছিলো। আহলে কিতাবদের সঙ্গে ছিলো এই ঘটনার সম্পর্ক। সুতরাং, মক্কার কুরাইশরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য ইহুদিদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ঘটনাকেও তাদের প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলো। আর যেহেতু সর্বাবস্থায় প্রশ্নগুলো মুশরিকদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তাই হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস তিনটি প্রশ্নকেই সংক্ষিপ্তভাবে একই ধারায় বর্ণনা করেছেন। এই সম্ভাবনা কেবল অন্ধকারে ছোঁড়া তীর নয়; বরং কুরআন মাজিদের বর্ণনাশৈলী থেকেও এর সত্যায়ন পাওয়া যাচ্ছে। আলোচ্য প্রশ্ন তিনটির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে কুরআন মাজিদের বর্ণনাশৈলী নিম্নরূপ—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

"তারা তোমার কাছে রুহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।"

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ

"তারা তোমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।"

আল্লাহ তাআলা দুটি জায়গাতেই প্রশ্নের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নের বিষয়ে বর্ণনাশৈলী ভিন্ন; তা এ-রকম—

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

"তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর?" [সুরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৯]

এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে; কিন্তু তার উদ্দেশ্য ওইসব লোক যারা তাঁকে প্রশ্ন করছে। তারা এই ঘটনার ব্যাপারে কিছুটা অবগত রয়েছে বলে একে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা মনে করছে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক বিস্তারিত বিবরণ প্রার্থনা করছে। তা ছাড়া কুরআন মাজিদ এটাও বলেছে যে, আপনি যখন এই ঘটনা তাদেরকে বিস্তারিত

শুনাবেন, আপনি ওই যুবকদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা শুনতে পাবেন।

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ... وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ

"কেউ বলবে তারা ছিলো তিন জন, কেউ বলবে পাঁচ জন।"

এটাও এ-কথার প্রমাণ যে, মক্কার কুরাইশরা নিশ্চয় এই ঘটনার ব্যাপারে কিছুটা অবগত ছিলো। এ-কারণেই কুরআন মাজিদ 'আর-রাকিম' বলে তাদের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করেছে যে, আজ যে-জায়গাটিকে তোমরা পেত্রা বলে উল্লেখ করে থাকো, তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই নাবতি ভাইদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় শহর 'রাকিম', এই নাম তোমরা ভুলে গেছো।

দ্বিতীয় কথা এই যে, হযরত মুসা আ.-এর কাল থেকেই রোমান শাসক কর্তৃক 'রাকিম' ও 'হিজর' বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইহুদিরা নাবতিদের হাতে সব ধরনের দুর্দশা-যন্ত্রণা ভোগ করে আসছিলো। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরোধমূলক অনেক যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিলো।[২২]

এই ঘটনায় খ্রিস্টধর্মের সত্যতার একটি দিক অবশ্যই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু নাবতিদের শিরকি জীবনযাপন এবং রোমান বিজেতাদের হাতে তাদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার দিকটিও কোনো অংশেই কম প্রকাশ পাচ্ছে না। যা সবসময়ই ছিলো ইহুদিদের আনন্দ ও উল্লাসের কারণ। এ-কারণেই খুব সম্ভব ইহুদিরা এই দিকটিকে উপেক্ষা করেছে এবং ওই দুটি প্রশ্নের সঙ্গে তৃতীয় প্রশ্নটিকেও বিশেষভাবে নির্বাচন করেছে।

তাফসির-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ

এক.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

"তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর?" [সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৯]

অর্থাৎ, যেসকল লোক এই ঘটনাকে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অনেক বড় নিদর্শন মনে করছে, তাদেরকে জানিয়ে দাও যে,

---

[২২] তাওরাত, সিফরে আদাদ, অধ্যায় ২০, আয়াত ১৪-২১।

আমার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ তো মানবজগতের জন্য অবশ্যই বিস্ময়কর ব্যাপার; কিন্তু তাঁর অন্তহীন ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রাখলে উল্লিখিত ঘটনাটি অন্যান্য নিদর্শনের তুলনায় তেমন বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। তা এ-কারণে যে, আসমান ও জমিনের নির্মাণকৌশল, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি, তাদের বিস্ময়কর আকর্ষণশক্তি, কক্ষপথের শৃঙ্খলার অনুপম পরম্পরা, মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার ওহি নাযিল হওয়া, বাহ্যিকভাবে সত্যের বৈষয়িক শক্তি দুর্বল এবং মিথ্যার শক্তি প্রবল হওয়া সত্ত্বেও সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয়—এমনসব বিষয় যা উল্লিখিত ঘটনা থেকে অনেকগুণ বেশি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। সুতরাং, যেসকল লোক তাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাকে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর মনে করে, তারা যদি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উল্লিখিত কার্যাবলির প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকায় এবং গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ক্ষমতার সামনে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাটি আশ্চর্যজনক নয়, বিস্ময়করও নয়। অবশ্য তা উপদেশমূলক ও শিক্ষণীয়।

لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

"যদি তারা বুঝতো।"[২৩]

দুই.

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি রহ. তাঁর সহিহুল বুখারিতে নামে أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم একটি অনুচ্ছেদে হাদিস সংকলন করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনা-সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদিসটি তাঁর নির্দিষ্ট শর্তাবলির অনুকূল প্রমাণিত হয় নি; ফলে তিনি এই হাদিসের মাধ্যমে সুরা কাহ্ফের আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসির করেন নি। অবশ্য তিনি বনি ইসরাইলের অন্য একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে—যা 'হাদিসুল গার' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে—মনে করেছেন 'আসহাবুল কাহ্ফ' ও 'আসহাবুর রাকিম' দুটি ভিন্ন ভিন্ন দল এবং 'হাদিসুল গার'-এ যেসকল

---

[২৩] সুরা তাওবা : আয়াত ৮১।

ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে তাঁরাই হলেন 'আসহাবুর রাকিম'-এর ব্যক্তিবর্গ। এ-কারণেই তিনি 'হাদিসুল গার'কে 'আসহাবুর রাকিম'-এর ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করেছেন।

'হাদিসুল গার'-এর ঘটনা নিম্নরূপ—

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك

منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.

“হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, পূর্বকালের কোনো এক উম্মতের তিন ব্যক্তি একবার ভ্রমণে বের হলো এবং পথিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কারণে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো। ওখানে তারা ঘুমানোর ব্যবস্থাও করলো। হঠাৎ একটি বিরাট পাথর পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলো। ফলে ওই তিন ব্যক্তি গুহার ভেতর অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় তারা পরস্পর বলাবলি করলো যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সর্বোত্তম নেক আমল উল্লেখ করে তার উসিলা ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তা ছাড়া উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই।

তারপর তাদের মধ্যে একটি দোয়া করলো, হে আল্লাহ, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন। আমি কখনো তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে আমার স্ত্রী-পুত্র, চাকর-চাকরানীদের খেতে দিতাম না। একদিনের ঘটনা এই যে, আমি কোনো জিনিসের তালাশে বহু দূরে চলে যাই। ওখান থেকে ফিরতে রাত হয়ে যায়। আমি বাড়িতে এসে দুধ দোহন করে দেখি তাঁরা উভয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁদের আহারের পূর্বে আমার স্ত্রী-পুত্র ও চাকর-চাকরানীদের আহার করতে দেয়া আমি ভালো মনে না করে দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি তাঁদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকলাম। এদিকে আমার সন্তানেরা ওই দুধ পান করার জন্য আমার পায়ে পড়ে চিৎকার করছিলো। এই অবস্থায় রাত ভোর হয়ে গেলো। তারপর তাঁরা ঘুম থেকে জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। মাতা-পিতার খেদমতে এইভাবে আত্মনিয়োগ করা—হে অন্তর্যামী আল্লাহ, তুমি জানো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করেছি। সুতরাং, তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাদের থেকে এই পাথরের বিপদ দূর করে দাও। এই দোয়া করার পর পাথরটি গুহামুখ থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলো। গুহামুখ কিছুটা উন্মুক্ত হলো, কিন্তু মানুষ বের হওয়ার মতো প্রশস্ত হলো না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করলো—হে আল্লাহ, আমার একটি চাচাতো বোন ছিলো। আমি তার

প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলাম। আমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য বহুবার তাকে আহ্বান করেছি; কিন্তু সে কখনো আমার আহ্বানে সাড়া দেয় নি। সবসময় সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। তারপর এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের বছর সে আমার কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হলো। আমি তাকে একশো বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দান করলাম এই শর্তে যে, আমার জন্য সে নিজেকে অর্পণ করবে। অগত্যা সে রাজি হলো। আমি যখন দীর্ঘদিনের কামনা পূরণ করার জন্য উদ্যত হয়ে তার মুখোমুখি বসলাম তখন সে আমাকে বললো, হালাল ও জায়েয বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে আমি তোমাকে চিরজীবনের অস্পর্শিত বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করতে সম্মতি দিই না, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তখন এই কাজকে পাপ বলে উপলব্ধি করার শুভবুদ্ধি আমার উদয় হলো এবং পাপ ও গোনাহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ না করে সরে পড়লাম, অথচ সে আমার অত্যন্ত আসক্তির মানুষ ছিলো। এবং ওই একশো বিশটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে দিয়ে দিলাম। হে অন্তর্যামী আল্লাহ, তুমি জানো, একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি আমার বাসনা পূরণের সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাদের বিপদমুক্ত করো। তখন গুহার মুখ আরো উন্মুক্ত হলো; কিন্তু বের হওয়ার পরিমাণমতো হলো না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া করলো— হে আল্লাহ, আমি কয়েকজন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। তাদের সবাই মজুরি নিয়ে চলেগিয়েছিলো; কিন্তু তাদের একজন মজুরি না নিয়ে চলেগিয়েছিলো। তার মজুরি ছিলো এক ধামা ধান। আমি ওই ধান বপন করলাম এবং তা থেকে যা উৎপন্ন হলো তা দ্বার উট ক্রয় করলাম। এইভাবে গুরু, ছাগল ও ক্রীতদাস ক্রয় করলাম। কিছুদিন পর ওই শ্রমিক এলো এবং তার মজুরির দাবি জানালো। আমি তাকে বললাম, এই গরু, ছাগল, উট, ক্রীতদাস সবই তোমার। সে বললো, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন না। আমি বললাম, আমি মোটেও ঠাট্টা করি নি। (এই কথা বলে তাকে বিস্তারিত ঘটনা বললাম।) তখন সে ওইসব নিয়ে চলে গেলো। হে আল্লাহ, তুমি জানো, একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই কাজ করেছিলাম। তুমি

তোমার অনুগ্রহে আমাদের বিপদমুক্ত করো। সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গেলো এবং তারা গুহা থেকে বের হতে সক্ষম হলো।"[২৪]

এই হাদিসের ব্যাখ্যা করে ইবনে হাজার আসকলানি রহ. বলেন, 'বায্যার ও তাবরানি রহ. উত্তম সনদের সঙ্গে হাদিসটিকে নুমান বিন বাশির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাতে কেবল এতটুকু সংযোগ করেছেন যে, নুমান বিন বাশির বলেন, "আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাকিমের আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আটকে-পড়া তিন ব্যক্তির ঘটনা শুনাচ্ছিলেন।" সম্ভবত এ-কারণেই ইমাম বুখারি রহ. 'আসহাবুর রাকিম'-এর তাফসিরে এই 'হাদিসুল গার' বা গুহার হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন।"[২৫]

কিন্তু ইতোপূর্বে যে-তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে কুরআন মাজিদের বর্ণনা, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আসহাবুল কাহ্ফ যে-নগরীর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন ওই নগরীর নাম 'রাকিম'। সুতরাং, মুসনাদে বায্যার ও মু'জামুত তাবরানির রেওয়ায়েতের অস্পষ্ট শব্দাবলি থেকে আসহাবুর রাকিমকে আসহাবুল কাহ্ফ থেকে ভিন্ন মনে করা শুদ্ধ হতে পারে না। বিশেষ করে যখন নুমান বিন বাশির রা.-এর রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাকিমের আলোচনা করছিলেন এবং সেই সঙ্গে বনি ইসরাইলের ওই ঘটনাটাও উল্লেখ করেছিলেন। ফলে রাবি (রেওয়ায়েতকারী) ভুল করে মনে করে নিয়েছেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসুল গার (গুহার হাদিস)-এর ঘটনা 'আসহাবুর রাকিম'-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া আরবি ভাষায় 'রাকিম' শব্দটি কখনো 'গুহা'র অর্থে ব্যবহৃত হয় না; প্রকৃত অর্থেও না এবং রূপক অর্থেও না। তা হলে এটা কীভাবে ঠিক হতে পারে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাকিম শব্দটিকে গুহার অর্থে ব্যবহার করে হাদিসুল গারকে আসহাবুর রাকিমের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন? এটা রাবি বা রেওয়ায়েতকারীর অনুমানমাত্র। আর খুব সম্ভব

---

[২৪] সহিহুল বুখারি : হাদিস ২২৭২।

[২৫] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, হাদিসুল গার।

বায্‌যার ও তাবরানি ব্যতীত আর কেউই উল্লিখিত অতিরিক্ত কথাটি বর্ণনা করেন নি, অথচ হাদিসের কিতাবসমূহে এই হাদিসটি বহুবার বর্ণিত হয়েছে। সহিহুল বুখারিতেও এই অতিরিক্ত শব্দগুলো উল্লেখ করা হয় নি। তা ছাড়া সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পরিষ্কার ও স্পষ্ট শব্দমালায় 'রাকিম' শব্দের ব্যাখ্যা বলে দিয়েছেন। তবে এটা কেমন করে সম্ভব যে, উচ্চ মর্যাদাবান মুফাস্‌সিরগণ তাঁদের নিজ নিজ বিশ্লেষণ অনুসারে 'রাকিম' শব্দের ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃত করেছেন? স্বয়ং হাফেযে হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এরও এই দুঃসাহস হতো না যে, তিনি উল্লিখিত রেওয়ায়েতটির (যা নুমান বিন বাশির রা. থেকে উদ্ধৃত) বিরুদ্ধে এ-উক্তি করেন—শুদ্ধ ও সঠিক হলো, আসহাবুর রাকিম ও আসহাবুল কাহ্‌ফ একই দল। কেননা, তিনি বলেছেন—

وقال قوم أخبر الله عن قصة أصحاب الكهف ولم يخبر عن قصة أصحاب الرقيم قلت وليس كذلك بل السياق يقتضي أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم والله أعلم.

"এবং অন্য একটি দল বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আসহাবুল কাহ্‌ফের কাহিনি শুনিয়েছেন এবং আসহাবুর রাকিমের কাহিনি শুনান নি। আমি বলি, ব্যাপারটা তা নয়। বরং কুরআন মাজিদের বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে বুঝা যায় আসহাবুল কাহ্‌ফই হলেন আসহাবুর রাকিম।"[২৬]

তিন.

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

"তারপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম।"

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, "পরিষ্কার অর্থ তো এই যে, দুনিয়ার দিক থেকে তাঁদের কান

[২৬] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৩।

সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ, দুনিয়ার কোনো আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছাতো না।"[২৭]

আয়াতটির তাফসিরে এ-ধরনের বক্তব্য দুর্বল ও বিরল।[২৮] এর বিপরীতে, মুফাস্‌সিরগণের কাছে আয়াতটির প্রসিদ্ধ তাফসির এই যে, তাঁদের ওপর নিদ্রা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ কোনো আওয়াজ শুনতে পায় না। এ-কারণে তাঁদের নিদ্রার অবস্থাকে ضرب على الآذان শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ-তাফসির সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, উল্লিখিত তাফসিরের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, আরবি ভাষায় কোথাও নিদ্রার অবস্থার জন্য ضرب على الآذان শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁরা (মুফাস্‌সিরগণ) বলেন, এটা এক ধরনের উপমা; গভীর নিদ্রার অবস্থাকে ضرب على الآذان বা কান বন্ধ করে দেয়ার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[২৯]

আমাদের মতে মুফাস্‌সিরগণের তাফসিরই প্রণিধানযোগ্য। আর উপমা বা তুলনা প্রতিটি ভাষার বাকপদ্ধতিতেই পাওয়া যায়। উদাহরণ—মা যখন কোলের শিশুকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে থাকেন, তখন শিশুটির কান ও বাহুর ওপর হাত বুলিয়ে থাকেন। এ-কারণে উর্দু ভাষাতেও کانوں کو تھپک دینا শব্দবন্ধটি 'ঘুম পাড়িয়ে দেয়া'র অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব রহ. উল্লিখিত বাক্যটির অনুবাদ করেছেন এভাবে—

پھر تھپک دیئے ہم نے ان کے کان اس کھوہ (غار) میں چند برس گنتی کے (کہف)

"এরপর আমি তাদেরকে বহু বছরের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।" [সুরা কাহ্ফ]

তা ছাড়া আরবি ভাষায় ضرب على أذنه শব্দগুলো منعه أن يسمع বা 'শ্রবণ বন্ধ করে দেয়া'র অর্থে ব্যবহৃত হয়। শ্রবণ বন্ধ করে দেয়া কয়েকটি

---

[২৭] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড।

[২৮] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড।

[২৯] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড।

অবস্থায় হতে পারে : ১. কোনো ব্যক্তি বসতি থেকে দূরে বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান নিলো এবং ওই কারণে পৃথিবীর কথাবার্তা থেকে তার কান সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। ২. বধির হওয়ার ফলে শ্রবণে অক্ষম হয়ে পড়লো। ৩. সে ঘুমিয়ে পড়লো এবং তার অন্যান্য বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মতো কানও (শ্রবণশক্তিহীন হয়ে) অকেজো হয়ে পড়লো। সুতরাং, ضرب على الأذان বাগধারাটি এই কয়েক অবস্থার জন্য সমানভাবে ব্যবহার করা যায়। এটা যদি তুলনা বা উপমা হয় তবে এই তিনটি অবস্থার জন্যই হবে।

অবশ্য মাওলানা আবুল কালাম আযাদ কর্তৃক বর্ণিত তাফসিরে এই জিজ্ঞাসা অবশ্যই উত্থাপিত হয় যে, ضرب على الأذان-এর অর্থ যদি এই হয় যে, দুনিয়ার দিক থেকে তাঁদের কান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো, অর্থাৎ, তাঁরা জাগ্রত অবস্থায় স্বাভাবিক জীবনযাপন অনুযায়ী আবাসস্থল থেকে দূরে পাহাড়ের গুহার মধ্যে সংসারত্যাগী জীবনযাপন করছিলো, তবে নিম্নলিখিত আয়াতটির অর্থ কী—

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (سورة الكهف)

এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছো?' কেউ কেউ বললো, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' [সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১৯]

এই আয়াতটি কি নিজের স্পষ্ট অর্থে এটা ব্যক্ত করে না যে, এখানে ضرب على الأذان-এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা ওটাই যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সিরিনে কেরামের কাছে বিশুদ্ধ ও প্রণিধানযোগ্য? বরং এ-ধরনের ক্ষেত্রে بَعَثْنَاهُمْ 'আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম' বাক্যের চাহিদা তো এই যে, মুফাস্‌সিরগণের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্যকোনো ব্যাখ্য গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব।

এখানে এ-ব্যাপরটিও অনুধাবন করা উচিত যে, কুরআন মাজিদ আসহাবে কাহ্ফের পাহাড়ের গুহায় নিদ্রিত থাকার সময়সীমা সম্পর্কিত কথোপকথনের পর তাঁদের এই আলোচনাও উল্লেখ করেছে যে, তাঁদের

মধ্যে যে-কেউ শহরে যাবেন, অতি গোপনীয়তার সঙ্গে যাবেন, যাতে কেউ টের না পায়। এ-বিষয়টিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সিরিনে কেরামের তাফসিরকে সমর্থন করছে। কেননা, গুহায় অবস্থানের সময়সীমা সম্পর্কে কথোপকথন এবং তারপর হঠাৎ খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ—কথা দুটিকে পরস্পর সংযুক্ত করলে পরিষ্কার অর্থ ওটাই পাওয়া যাবে যা মুফাস্‌সিরগণ বর্ণনা করেছেন। আর মাওলানা আবুল কালাম আযাদের এমন ব্যাখ্যা—দীর্ঘকাল পরে শহরের অবস্থা জানার জন্য তাঁদের মনে আগ্রহ জেগে উঠলো এবং এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে এই কথোপকথন হলো—পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়।

এ-কারণে মাওলানা আযাদকে এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অযৌক্তিক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজিদ আসহাবুল কাহ্ফের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছে—

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ (سورة الكهف)

"তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিলো নিদ্রিত।" [সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১৮]

এখানে মাওলানা আযাদকে নিজের তাফসির ঠিক রাখার জন্য يقظة-এর অর্থ করতে হয়েছে জীবত এবং رقد-এর অর্থ করতে হয়েছে 'মৃত'। অথচ এই শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ জাগরণ ও নিদ্রা। এই দুটি প্রকৃত অর্থ এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রযোজ্য হয়। সুতরাং, এখানে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ওপর ওই কথাই প্রযোজ্য হয় যা তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসিরকারের জন্য আবশ্যক করে তুলেছেন : ففي الكلام تجوز بطريق الاستعارة। 'এ-কথায় রূপকের পথে তুলনা ব্যবহার করা হয়েছে।

যদি আরো গভীর দৃষ্টির সঙ্গে দেখা যায়, তবে 'প্রকৃত অর্থ প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও রূপক অর্থ গ্রহণ করা' মাওলানা আযাদের তাফসিরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসিরকারের তাফসিরের ওপর প্রযোজ্য নয়।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসিরে মুফাস্‌সিরগণের মনোনীত বক্তব্যের বিরুদ্ধে একটি দুর্বল উক্তিকে নিজের পছন্দনীয় করে নিয়েছেন। তবে তিনি মুফাস্‌সিরগণের বক্তব্যকে

সম্ভাবনার পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়ে (তাঁদের বক্তব্যেরও বিশুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে) তাঁদের সমর্থনে তিনি যে-বাক্যগুলো বলেছেন, তা নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষভাবে পাঠযোগ্য যাঁরা এই জাতীয় ঘটনাবলিকে নিছক বিস্ময়কর মনে করে যুক্তি ও বুদ্ধিবিরুদ্ধ বলে দেন। মাওলানা আযাদ বলেছেন—

"যাইহোক। যদি এখানে ضرب على الأذان-এর উদ্দেশ্য হয় নিদ্রার অবস্থা, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তাঁরা অস্বাভাবিক দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় নিমজ্জিত ছিলেন। তখন ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ বাক্যের উদ্দেশ্য বলতে হবে যে, তারপর তাঁরা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।"

"একজন মানুষের ওপর অস্বাভাবিক দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রার অবস্থা আচ্ছন্ন থাকে, তারপরও সে জীবিত থাকে এটা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার একটি স্বীকৃত সত্য। অভিজ্ঞতায় এ-ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। সুতরাং, আল্লাহর কুদরতে যদি আসহাবুল কাহ্ফের ওপর এমন কোনো অবস্থা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাঁদেরকে অস্বাভাবিক দীর্ঘকাল নিদ্রিত রেখেছে, তবে তা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।"[৩০]

চার.

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (سورة الكهف)

"পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।" [সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১২]

এখানে দুই দলের এক দল আসহাবুল কাহ্ফ এবং অপর দল শহরবাসী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি তা এজন্য করেছি যাতে সঠিক সময়সীমা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বহু বছর পর্যন্ত নিদ্রিত অবস্থায় জীবিত রেখেছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন জীবনধারণের সব ধরনের পার্থিক উপকরণ থেকে বঞ্চিত'—এই বিষয়টি জেনে নেয়ার পর লোকদের বিশ্বাস হবে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা

---

[৩০] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড।

মানুষকে তার মৃত্যুরও এইভাবে জীবিত করবেন এবং নিঃসন্দেহে কিয়ামত ও মৃত্যুপরবর্তী পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি সত্য।

আল্লাহ আসহাবুল কাহ্ফের যুবকগণকে নিদ্রার অবস্থা থেকে জাগ্রত করলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন যুবক খাদ্য ক্রয় করার জন্য শহরে গেলো। তখন নগরবাসীরা البعث بعد الموت 'মৃত্যুপরবর্তী পুনরুজ্জীবন' বিষয়ে ঝগড়া ও তর্কবিতর্ক চলছিলো। এক দল বলছিলো, কেবল রুহ বা আত্মার পুনরুজ্জীন ঘটবে। আরেক দল বলছিলো, আত্মা ও দেহ দুটিরই পুনরুজ্জীবন ঘটবে। এই দুই দল ছিলো নাসারা বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের । আর যেসকল নাবতি মুশরিক ওই নগরীর অধিবাসী ছিলো তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে একেবারেই অস্বীকার করতো। এমন একটি নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা ওই যুবককে গুহা থেকে জাগ্রত করে নগরে প্রেরণ করলেন। এইভাবে আসহাবুল কাহ্ফের ঘটনা সবার কাছে জানাজানি হয়ে গেলো। এই ঘটনা সবার সামনে এ-দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করলো যে, জীবনধারণের যাবতীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও যেভাবে আত্মার সঙ্গে দেহও বহু বছর পর্যন্ত অক্ষত ও নিরাপদ থেকেছে, একইভাবে البعث بعد الموت 'মৃত্যুপরবর্তী পুনরুজ্জীবন'ও আত্মা ও দেহ উভয়টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আর যেভাবে দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকার পর আসহাবুল কাহ্ফের সদস্যদের জাগ্রত করা হয়েছে, তেমনিভাবে কবরে (আলমে বারযাখে) শত শত এবং হাজার হাজার বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর কিয়ামতের দিন জীবিত করা হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন—

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ (سورة الكهف)

'এইভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম (তাদের বিষয়টি আর গোপনীয় থাকে নি) যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোনো সন্দেহ নেই, যখন তারা (কিয়ামতের ব্যাপারে) তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো .... ।"' [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ২১][৩১]

---

[৩১] তাফসিরে ইবনে কাসির, ষষ্ঠ খণ্ড, সুরা কাহ্ফ।

আয়াতের এই তাফসির ইকরামা রহ. থেকে গৃহীত। এই তাফসিরকেই সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আযাদ لَا رَيْبَ فِيهَا (তাতে কোনো সন্দেহ নেই)-কে إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ (তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো) থেকে পৃথক করেছেন এবং আয়াতটির অর্থ করেছেন এমন : "ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো যে, তাঁদের (আসহাবুল কাহ্ফের) ব্যাপারে কী করা যায়, তখন তারা বললো, তাঁদের গুহার ওপর একটি ইমারত নির্মাণ করো।"

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহও (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) একই তরজমা করেছেন—

"লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো আসহাবুল কাহ্ফের ব্যাপারে, তখন তারা বললো, তাঁদের ওপর ইমারত নির্মাণ করো।"

অর্থাৎ, তাঁরা يَتَنَازَعُونَ শব্দে কিয়ামতের ব্যাপারে শহরবাসীদের নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও মতভেদ করাকে উদ্দেশ্য করেন না; বরং তাঁরা আসহাবুল কাহ্ফের শয়নগুহার ওপর উপাসনাগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে যে-বিতর্ক হয়েছিলো সেই বিতর্ককে উদ্দেশ্য করেন।

পাঁচ.

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ

আমরা এই ঘটনার যে-বিবরণ প্রদান করেছি, কুরআন মাজিদের অভ্যন্তরীণ ইঙ্গিত এবং ইতিহাস ও উদ্ধৃতিসমূহের বাহ্যিক সাক্ষ-প্রমাণ যে-বিষয়গুলো প্রমাণিত করেছে, সাধারণ মুফাস্সিরগণ তার থেকে ভিন্ন এই মত পোষণ করেন যে, এটি বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত ইহুদিদের প্রাচীনকালের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিলো আফসান শহরের মুশরিক বাদশাহ দাকইয়ানুসের (دقيانوس) শাসনামলে। তাঁদের বক্তব্যের অর্থ এই যে, আসহাবুল কাহ্ফের যুবকগণ খ্রিস্টধর্ম নন, বরং ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎকালীন বাদশাহর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো।

অবশ্য আমরা এ-ব্যাপারে ইতোপূর্বে আলোচনা করে প্রমাণ করেছি যে, এই ঘটনার সম্পর্ক খ্রিস্টযুগের সঙ্গে।

ছয়.

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (سورة الكهف)

"কেউ কেউ বললো, 'তারা ছিলো তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিলো তাদের কুকুর' এবং কেউ কেউ বললো, 'তারা ছিলো পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিলো তাদের কুকুর', (কথাটা বললো) অজানা বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বললো, 'তারা ছিলো সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিলো তাদের কুকুর।'" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ২২]

আল্লাহ তাআলা প্রথমে আসহাবুল কাহ্ফের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন, যেগুলো উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে উপকারী। তারপর তিনি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছোটখাট বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ-বিষয়গুলো নিকছ ঐতিহাসিক মর্যাদা রাখে, এগুলো জানায় বিশেষ কোনো ফায়দা অর্জিত হয় না। আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিচ্ছেন, আপনি এসব নিষ্ফল আলোচনা থেকে বেঁচে থাকুন এবং এসব ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেবেন না। অর্থহীন বিষয় অনুসন্ধানে চিন্তা-ভাবনা করবেন না। যেমন, ওই যুবকগণের সংখ্যা কত ছিলো? তাঁদের বয়সের সামঞ্জস্য কেমন ছিলো? কতকাল তাঁরা গুহায় ঘুমিয়েছিলেন? তাঁদের অবস্থানকালের সঠিক পরিমাণ কী? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (سورة الكهف)

"বলো, 'আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভালো জানেন'; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না এবং তাদের কাউকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

করো না। (কেননা, তারা যা বলবে, তা অনুমানের ভিত্তিতেই বলবে।)" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ২২]
তবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেছেন, 'যে-অল্প কয়েকজন আসহাবুল কাহ্ফের সদস্যদের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত আছেন, আমিও তাঁদের একজন।' তিনি বলেন, 'তাঁরা ছিলেন সাতজন এবং অষ্টমটি ছিলো তাঁদের কুকুর। তা এ-কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সংখ্যার ব্যাপারে প্রথমে দুটি উক্তি উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, এই উক্তিগুলো অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তৃতীয় উক্তিটি উল্লেখ করার পর এ-ধরনের কোনো কথা বলেন নি। সুতরাং, এটাই তাঁদের সঠিক সংখ্যা।'[৩২]

সাত.

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (سورة الكهف)

"তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশো বছর, আরো নয় বছর।" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ২৫]
সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ এই আয়াতটির তরজমা করেছেন এভাবে যে, 'যেনো আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান করছেন যে, তাঁরা তিনশত নয় বছর গুহার মধ্যে অবস্থান করেছিলেন।' কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে যে-তরজমা বর্ণিত আছে তার মর্মার্থ হলো, এই কথাটি মানুষের উক্তি; আল্লাহ তাআলার নিজের উক্তি নয়। অর্থাৎ, এই দুজন সাহাবি .. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ আয়াতটিকে তার পূর্ববর্তী বাক্য سَيَقُولُونَ-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং তাঁরা আয়াতটির তরজমা করেন এরকম : লোকেরা (খ্রিস্টানরা) আসহাবুল কাহ্ফের সংখ্যা সম্পর্কে যেভাবে বিভিন্ন ধরনের উক্তি করে থাকে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তেমনি তাদেরকে এটাও বলতে দেখা যায় যে, আসহাবুল কাহ্ফ তিনশত নয় বছর গুহায় অবস্থান করেছিলো।
মুহাম্মদ বিন আলি বিন মুহাম্মদ আশ-শাওকানি রহ. তাঁর তাফসিরগ্রন্থ ফাতহুল কাদিরে উদ্ধৃত করেছেন—

[৩২] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, সুরা কাহ্ফ।

وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيهوي أبعد ما بين السماء والأرض ، ثم تلا { وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ } الآية ، ثم قال : كم لبث القوم؟ قالوا : ثلثمائة وتسع سنين ، قال : لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله { قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } ولكنه حكى مقالة القوم فقال : { سَيَقُولُونَ ثلاثة } إلى قوله : { رَجْماً بالغيب } فأخبر أنهم لا يعلمون ، ثم قال : سيقولون { وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثلاثمائة سِنِينَ وازدادوا تِسْعًا}.

"ইবনে আবি হাতিম ও ইবনে মারদুবিয়াহ রহ. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'মানুষ কুরআন মাজিদের আয়াতের তাফসির করে এবং মনে করে যে, সে একেবারে সঠিক তাফসির করেছে। অথচ সে (এত মারাত্মক ভুল করে যে,) আকাশ-জমিন দূরত্বে গিয়ে পতিত হয়।' এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন, ... وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 'তাঁরা তাদের গুহায় ছিলেন.... ।' তারপর বলেন, 'তাঁরা কতদিন অবস্থান করেছিলেন? লোকেরা বলে, তিনশত নয় বছর।' তারপর তিনি বলেন, 'যদি তাঁরা গুহায় তিনশত নয় বছর অবস্থানই করতেন, তবে আল্লাহ তাআলা বলতেন না, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا "তুমি বলো, তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহই ভালো জানেন।" কিন্তু (তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উক্তি নয়) আল্লাহ তাআলা মানুষের উক্তিকে বর্ণনা করেছেন এবং سَيَقُولُونَ ثلاثة থেকে শুরু করে رَجْماً بالغيب পর্যন্ত আয়াতটি বলেছেন। আল্লাহ জানিয়েছেন, লোকেরা তাঁদের সঠিক সংখ্যা জানে না। তারপর আল্লাহপাক মানুষের (দ্বিতীয়) উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা বলবে, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا "তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশো বছর, আরো নয় বছর।"'[৩৩]

ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. তাঁর তাফসিরে কাতাদা রহ. থেকে উদ্ধৃত করে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন—

---

[৩৩] ফাতহুল কাদির, সুরা কাহ্ফ।

قال: وفي قراءة عبد الله: "وقالوا: ولبثوا يعني أنه قاله الناس وهكذا قال قتادة ومطرف بن عبد الله.

"কাতাদা রহ. বলেন, 'হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর কেরাতে রয়েছে, وقالوا ولبثوا 'লোকেরা বলে, তাঁরা অবস্থান করেছিলেন'। অর্থাৎ, তা মানুষের উক্তি।' এটাই কাতাদা ও মুতরিফ বিন আবদুল্লাহর বক্তব্য।"[৩৪]

আমার কাছেও এই অর্থই প্রণিধানযোগ্য। কেননা, কুরআন মাজিদের বর্ণনাশৈলী থেকে এই অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে। কারণ, এই আয়াতগুলোতেই কুরআন মাজিদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নসিহত করছে, যেনো তিনি এ-ধরনের অর্থহীন ও অনুমানপ্রসূত কথার পেছনে না ছোটেন। সুতরাং, যখন وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (তারা তাদের গুহায় ছিলো তিনশো বছর, আরো নয় বছর) বলার পর বলা হলো قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (তুমি বলো, 'তারা কতকাল ছিলো তা আল্লাহই ভালো জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই।') তখন এ-বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আসহাবুল কাহ্ফের গুহায় অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কিত বাক্যটি অন্ধকারে তীর ছোঁড়ামাত্র। এ-কারণে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের প্রতি সোপর্দ করে দেয়াই এ-ব্যাপারে সঠিক কার্যপদ্ধতি। সুতরাং, এ-অবস্থায় এটি আল্লাহ তাআলার উক্তি নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে যারা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে নিরর্থক কথা বলে বেড়াতো, এটি তাদেরই উক্তি।

তা সত্ত্বেও আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সিরের প্রদত্ত অর্থকেই প্রণিধানযোগ্য বলেছেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর বক্তব্যকে মুনকাতা বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেছেন এবং তাঁর

---

[৩৪] তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, সুরা কাহ্ফ।
হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর কেরাতের অর্থ এই যে, তিনি এখানে তাফসিরস্বরূপ এই বাক্য পড়তেন।—লেখক।

কেরাতকে শায বা বিরল সাব্যস্ত করে একে দলিল হিসেবে গ্রহণের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর সহিহ রেওয়ায়েতটির ব্যাপারে ইবনে কাসিরের কাছে কী জবাব আছে? ইবনে কাসির আরো বলেছেন যে, 'আল্লাহ তাআলা প্রথমে তিনশত বছরের কথা বলেছেন এই এটা হলো সৌরবর্ষ গণনার হিসাব অনুসারে। তারপর وَازْدَادُوا تِسْعًا বলে আরো নয় বছর বৃদ্ধি করেছেন, যাতে সৌরবর্ষের হিসাব চান্দ্রবর্ষের হিসাবের অনুরূপ হয়।' কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই বলা যেতে পারে এই বক্তব্য আয়াতের তাফসির নয়, বরং তাবিল। তা এ-কারণে যে, কুরআন মাজিদ তো একদিকে উপদেশ ও নসিহতের উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত বিবরণকে অর্থহীন বলেছে, অপরদিকে (ইবনে কাসিরের বক্তব্য মেনে নিলে) কুরআন নিজেই এমনসব বিষয়ের পেছনে পড়ে রয়েছে যার সঙ্গে উপদেশ ও নসিহতের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং তা নিছক জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়।[৩৫]

ইবনে কাসির যে উল্লিখিত উক্তিকে মানুষের উক্তি মনে করেন না তার আরো একটি যুক্তি আছে। নাসারাদের কাছে আসহাবুল কাহ্ফের সদস্যরা তিনশত বছর গুহায় অবস্থান করেছিলো বলে প্রসিদ্ধি আছে। আর তাদের ওখানে নয় বছরের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এই যুক্তি সঠিক নয়। কেননা, অন্য মুফাস্সিরগণ উভয় উক্তিই বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত অপর উক্তিটি আল্লামা ইবনে কাসিরের দৃষ্টিগোচর হয় নি।

আট.

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ..... لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (سورة الكهف)

"তুমি দেখতে পেতে—তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পাশে হেলে যায় এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে....তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে

[৩৫] তা ছাড়া উভয় পদ্ধতির গণনার জন্য ৯ (নয়)-এর বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়।

তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে ও তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে।" [সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১৭-১৮]

কুরআন মাজিদ এই আয়াতগুলোতে আসহাবুল কাহ্ফের সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেছে, শুরুর দিকে যখন তাঁরা গুহার মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। তা এজন্য যে, এই আয়াতগুলোর সংলগ্ন যেসব আয়াত এই ঘটনার ওপর আলোকপাত করছে, তাতে এই কথাগুলো বলা হয়েছে, তারা নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন এবং তাঁদের একজন সঙ্গীকে খাদ্যদ্রব্য আনার শহরে প্রেরণ করলেন।' ফলে শহরাবাসীর কাছে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয়ে পড়লো। অপ্রাসঙ্গিক বাক্যরূপে আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে এই বাস্তব অবস্থাকে প্রকাশ করে দেয়ার উপকারিতা বর্ণনা করলেন। তাঁরা পুনরায় গুহায় প্রবেশ করেন এবং নির্জনবাস অবলম্বন করেন। শহরবাসীরা ওই গুহার ওপর একটি উপসনাগৃহ নির্মাণ করে। এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করার পর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আসহাবুল কাহ্ফ নিদ্রামগ্ন থাকা অবস্থায় যে-অবস্থা ঘটেছিলো তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ওই গুহাটির অভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন ছিলো তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে : সূর্যের আলো এবং সতেজ হাওয়া পৌঁছা ও না-পৌঁছার কী অবস্থা ছিলো; দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রিত অবস্থায় থাকার আকৃতি কীরূপ ছিলো; দীর্ঘকাল তাঁরা এক কাতেই শুয়েছিলেন না-কি জীবিত মানুষের মতো কাত পরিবর্তন করছিলেন; তাদের কুকুরটি কীভাবে বিশ্বস্ততার হক আদায় করছিলো এবং বাইরে থেকে উঁকি মেরে দর্শনকারী লোকদের ওপর এই সামগ্রিক অবস্থার প্রভাব কীরূপ ছিলো।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্সির এই তাফসিরই করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও পর্যায়ক্রম হিসেবে এটা খুবই পরিষ্কার ও স্পষ্ট তাফসির। কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মনে করেন, সবগুলো আয়াত আসহাবুল কাহ্ফের পুনরায় গুহায় প্রবেশ করে নির্জনবাস অবলম্বন-সম্পর্কিত। তিনি বলেন, কুরআন মাজিদ আসহাবুল কাহ্ফের মৃত্যু হওয়ার পর যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তার বিবরণ দিচ্ছে। তিনি ايقاظا শব্দে يقظة-এর (আভিধানিক 'জেগে ওঠা' বা 'জাগ্রত হওয়া' অর্থ গ্রহণ না করে) জীবন লাভ করা অর্থ গ্রহণ করে এবং رقود শব্দে رقد-এর (আভিধানিক 'নিদ্রা' বা 'ঘুমিয়ে থাকা' অর্থ না নিয়ে) মৃত্যুবরণ করা অর্থ গ্রহণ করে বেশ কষ্ট স্বীকার করেছেন। কিছু ভূমিকা সংযুক্ত করে তিনি

তাঁর তাফসিরকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মুফাস্‌সিরগণ উল্লিখিত আয়াতগুলোকে আসহাবুল কাহ্‌ফের প্রথমবার গুহায় আত্মগোপন করে থাকা-সম্পর্কিত বলেছেন। ফলে তাঁদেরকে আয়াতগুলোর তাফসির করতে গিয়ে অস্থির হতে হয়েছে।' অথচ পুরো বিবরণ পাঠ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসিরে পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরগণকে কিছুমাত্র অস্থির হতে হয় নি। অবশ্য মাওলানা আযাদকে তাঁর মনোনীত তাফসিরকে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করার জন্য অবশ্যই মনগড়া মত অবলম্বন করতে হয়েছে। সত্য কথা বলতে গেলে, এখানে তাঁর তাফসির তাবিল হয়ে গেছে।

নয়.

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ "তা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির অন্তর্গত।"

অর্থাৎ, পাহাড়ের মধ্যে গুহার এই অভ্যন্তরীণ সামগ্রিক অবস্থা—গুহার মুখ সংকীর্ণ হলেও তার অভ্যন্তরে বেশ প্রশস্ততা রয়েছে; গুহাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত, এ-কারণে উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়া উভয় অবস্থাতেই সূর্য গুহার মুখ থেকে ডানে ও বামে সরে গিয়ে বের হয়ে যায় এবং গুহাটি সূর্যের তীব্র আলো ও উত্তাপ থেকে রক্ষিত থাকে; আর অপর দিকে খোলা থাকার কারণে প্রয়োজনীয় আলো ও বাতাস পৌঁছতে পারে; যেনো, দেহ রক্ষার জন্য ক্ষতিকর বস্তু অর্থাৎ সূর্যতাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ আলো ও বাতাসের বিদ্যমানত—এমনসব বিষয় যেগুলোকে আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য নিদর্শন বলা যেতে পারে। কারণ, এগুলোর সাহায্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ গুহার অভ্যন্তরে দুনিয়ার মেলামেশা থেকে পৃথক থেকে নিদ্রিত অবস্থায় কাটাতে পারলেন। এমন অবস্থায় তাঁরা জীবন কাটালেন, যখন তাঁরা ছিলেন পানাহার ও জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

দশ.

সাধারণভাবে এটি একটি প্রসিদ্ধ বিষয় যে, আসহাবুল কাহ্‌ফ এখন পর্যন্ত গুহার মধ্যে নিদ্রিত আছেন এবং তাঁরা জীবিতই আছেন। কিন্তু এ-কথা

ঠিক নয়। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আসহাবুল কাহ্‌ফের সদস্যরা মৃত্যুবরণ করেছেন।

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم، فرأوا فيه عظاما، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة. رواه ابن جرير.

"কাতাদা রহ. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. হাবিব বিন মাসলামার সঙ্গে কোনো জিহাদ-অভিযানে গমন করলেন। পথিমধ্যে রোম দেশে (পাহাড়ের) গুহাসমূহ অতিক্রম করলেন। ওখানে কোনো একটি গুহায় তাঁরা মানুষের হাড় ও দেহপিঞ্জর দেখতে পেলেন। তখন কেউ একজন বললেন, 'এগুলো কি আসহাবুল কাহ্‌ফের হাড়?' হযরত ইবনে আব্বাস রা. তখন বললেন, 'তাঁদের হাড়গোড় তো তিনশো বছরেরও বেশি আগে পচে গেছে।'—ইবনে জারির থেকে বর্ণিত।[৩৬]

এগারো.

কুরআন মাজিদ ও সহিহ রেওয়ায়েতসমূহ থেকে এটা আদৌ বুঝা যায় না যে, আসহাবুল কাহ্‌ফের সদস্যদের নাম কী ছিলো। তা ছাড়া কুরআন মাজিদ এ-ব্যাপারে মক্কার মুশরিক, নাবতি সম্প্রদায় ও রোমান নাসারাদের ওখানে যেসব কথা প্রচলিত ছিলো সেগুলোতে বিশ্বাস করতে এবং সেগুলোর তত্ত্বতালাশের পেছনে ছুটতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের নামগুলো হলো : মাকসালমিনা, তামলিখা, মারতুনাস, কাসতুনাস, বিরুনাস, ওয়ানিমুস, নাতুনাস; এবং তাঁদের কুকুরের নাম ছিলো কিতমির বা হামরান।

وقال ابن عباس: هم سبعة مكسلمينا تمليخا مرطونس، نينونس ساربونس، ذونوانس فليستطيونس وهو الراعي.

[৩৬] এই রেওয়ায়েত এ-কথা প্রমাণ করে যে, আসহাবুল কাহ্‌ফের ঘটনাটি ঘটেছিলো খ্রিস্টীয় প্রথম যুগে।

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, 'তাঁরা ছিলেন সাতজন : মাকসালমিনা, তাসলিখা, মারতুনাস, নিনুনাস, সারবুনাস, যুনাওয়ানাস এবং ফালইয়াসতায়ুনাস। ইনি ছিলেন পাহারাদার।'"[৩৭]

বারো.

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ "এবং তাদের কুকুর ছিলো সামনের পা দুটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে।"

তাঁদের কুকুরটি প্রভুভক্তি ও প্রাণ উৎসর্গের প্রমাণ দিয়েছিলো এব সৎকর্মপরায়ণ মানুষের সংসর্গ লাভ করেছিলো। কুরআন মাজিদও তার ভালো আলোচনা করে তাকে সম্মান দিয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের ঈর্ষার পাত্র বানিয়ে দিয়েছে। শায়খ সাদী রহ. কেমন চমৎকার বলেছেন—

سگ اصحاب کہف روز چندپے نیکاں گرفت مردم شد

پسر نوح بابداں بہ نشست خندان نبوتش گم شد

অর্থ : "আসহাবুল কাহ্ফের কুকুর কিছুদিনের জন্য সৎ মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করে মানুষ হয়ে গিয়েছিলো । আর নুহ আ.-এর পুত্র (কিনআন) পাপিষ্ঠদের সঙ্গে ওঠাবসা করে নবুওতের বংশের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিলো।"

তেরো.

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا "কখনোই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, 'আমি তা আগামী কাল করবো', 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে'—এই কথা না বলে।" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ২৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ইচ্ছা থাকে, তবে দাবির সঙ্গে এ-কথা বলা কখনোই উচিত নয় যে, অবশ্যই আমি এই কাজ করবো। কেননা, কাল কী ঘটবে আর বক্তা আগামীকাল বেঁচে থাকবে কি-না তা কেউ জানে না। সুতরাং, ভবিষ্যতের ব্যাপারগুলো আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ বলা উচিত।

---

[৩৭] তাফসিরুন নববি, সপ্তম খণ্ড, সুরা কাহ্ফ।

চৌদ্দ.

وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًا "এবং বলো, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে তা (গুহাবাসীর বিবরণ) অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করবেন।'" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ২৪]

এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারেও এমন ব্যাপার ঘটবে; বরং তা হবে এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ব্যাপার। অর্থাৎ, নিজের পিতৃপুরুষের দেশ, মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে। পথিমধ্যে কয়েকদিন সুর নামক গুহায় আত্মগোপন করে থাকবেন। শত্রুরা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছেও তাঁর সন্ধান লাভ করতে পারবে না। তিনি নিরাপত্তার সঙ্গে ও শান্তিতে মদিনায় পৌঁছে যাবেন। ওখানে রাসুলের জন্য বিজয় ও সাফল্যে বহুবিধ পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তা আসহাবুল কাহ্ফের ঘটনার চেয়ে বহুগুণে উচ্চ ও মহান হবে।

সুরা কাহ্ফ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মক্কি জীবনের শেষ সুরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এই সুরা নাযিল হওয়ার কিছুকাল পরেই হিজরতের মহান ঘটনাটি ঘটেছিলো। তা মুসলমানদের জীবনে বিস্ময়কর বিপ্লব নিয়ে এসেছিলো এবং মিথ্যা সত্যের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলো।

পনেরো.

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا "তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললো, 'আমরা তো নিশ্চয় তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করবো।'" [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ২১]

জানি না, তাদের এ-কথার উদ্দেশ্য কী ছিলো। বাস্তবিকই কি তাঁদের কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে সেটিকে সর্বসাধারণের সেজদার স্থান বানিয়েছিলো? কেননা, আসহাবুল কাহ্ফ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে নাসারাদের এই কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দা ও ঘৃণার যোগ্য। কারণ হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ « لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ».

“হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সর্বশেষ রোগশয্যায় বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা ইহুদি ও নাসারাদের লানত করুন। কারণ, তারা তাদের নবীগণের সমাধিসমূহকে মসজিদরূপে গ্রহণ করেছিলো।’”[৩৮]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا.

“হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা আমার কবরকে উৎসব (ঈদপর্ব) বানিয়ে নিও না।’”[৩৯]

আর যদি ওই নাসারাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, আসহাবুল কাহ্ফের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁদের গুহার মুখে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করবে এবং তাতে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত হবে, তবে তাদের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

ফল ও উপদেশ

এক.

আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচারে কোনো বিষয় যদি আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর মনে হয়, তার অর্থ এই নয় যে, ওই বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই বিচিত্র ও বিস্ময়কর। আর যদি তা বিস্ময়কর হয়ও, তবে তা কেবল আমাদের জন্য। বিশ্বজগতের স্রষ্টার জন্য নয়, যিনি বিশ্বজগতের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বিশ্বজগৎকে এমন সুদৃঢ় শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। অবশ্য চোখ প্রতিদিন তা দেখে এবং অন্তর প্রতিমুহূর্তে তার সত্যতা স্বীকার করে : وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ “আল্লাহ তাআলার পক্ষে ওই কাজ কঠিন কিছু নয়।” [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ২০]

---

[৩৮] সহিহুল বুখারি : হাদিস ১৩৩০; সহিহু মুসলিম : হাদিস ১২১২।

[৩৯] মুসনাদে আহমদ : হাদিস ৮৮০৪; সুনানে আবু দাউদ : হাদিস ২০৪৪।

দুই.

অন্যায়-অনাচার, ফেতনা-ফাসাদ এবং অত্যাচার ও অবাধ্যাচরণ যদি এতবেশি বৃদ্ধি পায় যে, আল্লাহ তাআলার সৎ বান্দাগণের জন্য কোথাও আশ্রয়ের জায়গা না থাকে, এ-অবস্থায় সংকল্পের দৃঢ়তা যদি এই স্তরের হয় যে, বিশ্বজগতের কল্যাণ ও হেদায়েতের খাতিরে সব ধরনের দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করে সত্যের বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহর বান্দাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনবাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করবে না, তবে তা উত্তম। কিন্তু চারপাশের অবস্থা যদি ভয়ঙ্কর সঙ্কটময় হয়ে ওঠে—মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে হয়তো প্রাণ দিতে হবে অথবা মিথ্যা ধর্ম গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হবে এবং অবস্থা যদি এমন পর্যায়ে এসে পড়ে—

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

'তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথরের আঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং সে-ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না।'[৪০] তবে জানের হেফাজত ও দীনের রক্ষার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্জনবাস অবলম্বন করার অবকাশ রয়েছে।

যেনো তা অপরাগতা ও অক্ষমতার অবস্থায় একটি আপৎকালীন ও সাময়িক প্রতিকার। যা কেবল দীন ও ঈমান রক্ষার জন্যই করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে তা কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়। আর স্বাধীন অবস্থায় সন্ন্যাসী জীবন অবলম্বন করা হয়ো রাহবানিয়্যাত (বৈরাগ্য)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,. لا رهبانية في الاسلام 'ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই।'[৪১]

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, প্রথম যুগে সত্যিকারের কয়েকজন ইসা আ.-এর অনুসারীকে আসহাবুল কাহ্ফের মতো কয়েকটি ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। জানা যায়, তার মধ্যে

---

[৪০] সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৩০।

[৪১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, তৃতীয় খণ্ড।

একটি ঘটনা রোমে, আর একটি ঘটনা আন্তাকিয়ায় এবং অন্য একটি ঘটনা আফসুস শহরে ঘটেছিলো। তাঁরা অপরাগতা ও অক্ষমতার অবস্থায় বাধ্য হয়ে বৈরাগ্য-জীবন অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য নতুন আবিষ্কৃত (বেদআতি) কর্মকাণ্ডের মতো সন্ন্যাসব্রতও খ্রিস্টান ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও পছন্দনীয় আমল বলে পরিগণিত হতে লাগলো। যেভাবে হিন্দুস্তানের সনাতন ধর্ম অনুসারে যাবতীয় পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে হিন্দু যোগীরা পাহাড়ের গুহা ও পোড়োবাড়িগুলোতে বসে যোগধর্ম পালন করাকে পবিত্র কাজ বলে মনে করছে, একইভাবে খ্রিস্টানরাও স্বেচ্ছামূলক বৈরাগ্যকে ধর্মের পবিত্র কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলো।

কুরআন মাজিদ তাদের এ-ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে মৌলিকভাবে এই কাজ (সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যবাদ) কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়। বরং এটি আহলে কিতাবের ধর্মীয় বেদআতসমূহের মধ্যে একটি বেদআত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (سورة الحديد)

"তারপর আমি তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসুলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ইসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রবর্তন করেছিলো। আমি তাদেরকে এর বিধান দিই নি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলো, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" [সুরা হাদিদ : আয়াত ২৭]

আল্লাহ তাআলা বৈরাগ্যবাদের পন্থাকে তাদের ধর্মীয় পন্থাগুলোর মধ্যে নির্ধারণ করে দেন নি। তারা নিজেরাই এটাকে প্রবর্তন করেছিলো। তারা

প্রথম প্রথম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই এই কাজটি করতো; কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তা রক্ষা করতে সক্ষম হয় নি। তারা বৈরাগ্যের অন্তরালে দুনিয়া-পূজারীদের থেকেও দুনিয়ার অধিক লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তিপূরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো।

সত্য এই যে, পরিষ্কার ও সরল পথই হলো মধ্যপন্থা। তাতে জটিলতা নেই এবং উচ্চতা বা নীচতাও নেই। এই পন্থা বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা উভয়টি থেকে বাঁচিয়ে রেখে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। ইসলাম হলো স্বভাব-অনুকূল ধর্ম। ফলে ইসলাম প্রতিটি ব্যাপারেই মধ্যপন্থাকে পছন্দনীয় কার্য বলে সাব্যস্ত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পার্থিব মোহে মত্ত হয়ে পড়া যতটুকু নিন্দনীয়, আল্লাহর সৃষ্টি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে যোগী ও সন্ন্যাসী জীবনযাপনও ততটুকু নিন্দনীয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এই উম্মতের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করাই রাহবানিয়্যাহ (বৈরাগ্য)। কেননা, জিহাদের ময়দানের দিকে মানুষ তখনই পা বাড়ায়, যখন সে নিজের সত্তা, পরিবার-পরিজন ও সব ধরনের পার্থিব সম্পর্ক থেকে বেপরোয়া হয়ে এক আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা পূরণ করাকেই তার উদ্দেশ্য ও প্রধান গন্তব্যস্থল বানিয়ে নেয়।

তিন.

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا () إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ "কখনোই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, 'আমি তা আগামী কাল করবো', 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে'—এই কথা না বলে।" আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে। তা হলো এই : মক্কার মুশরিকরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসহাবুল কাহ্ফ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর ওহির মাধ্যমে অবগত হয়ে আগামীকাল তোমাদেরকে এই প্রশ্নের জবাব দেবো। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। এ-কারণে প্রায় পনেরো দিন পর্যন্ত ওহি নাযিল হওয়া বন্ধ ছিলো। তখন মুশরিকদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও উদ্বিগ্ন হতে শুরু করলেন। পনেরো দিন পর ওহি নাযিল

হলো। আল্লাহ তাআলা ঘটনা প্রয়োজনীয় বিবরণসহ এটাও বলে দিলেন যে, মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। এ-কারণে জরুরি হলো, যখন আগামীকাল কোনো কাজের ওয়াদা বা সংকল্প করবে, তখন অবশ্যই আল্লাহর তাআলার ইচ্ছার প্রতি সোপর্দ করবে। আর কখনো যেনো এ-কথা ভুলে না যায় যে, কাল কী ঘটবে বান্দা তার কিছুই জানে না। সে জীবিত থাকবে কি-না এবং জীবিত থাকলে প্রতিশ্রুতিপূরণে বা সংকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম হবে কি-না তাও কেউ জানে না।

চার.

দীন ও ধর্ম আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট ও সরল পথের নাম। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বা বাধ্যকরণে এই দীনের মর্ম হৃদয়ে প্রবেশ করবে না। ধর্ম নিজেই তার সত্য আলো দ্বারা মানুষের মনকে আলোকিত করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দীনে কোনো প্রকাম জবরদস্তি নেই।' কিন্তু সত্যধর্মের বিপরীতে মিথ্যা ও বাতিলের সবসময় এই চেষ্টা থাকে যে, সে আল্লাহর সৃষ্টির ওপর জুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাধ্যমে তা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে এবং দলিল-প্রমাণ পেশ করার বদলে বল প্রয়োগ করে কাজ আদায় করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় অবশেষে সত্য ও সত্যধর্মকে জয়ী এবং মিথ্যা ও বাতিলকে পরাভূত করে দেয়। সত্যের হাতেই শেষফল থেকে যায়। অবশ্য আল্লাহ তাআলার পাকড়াও করার নীতি প্রথমে যথেষ্ট অবকাশ প্রদান করে থাকে। ফলে অত্যাচারী সম্প্রদায় তাদের অজ্ঞতাবশত এই অবকাশকে নিজেদের সাফল্য বলে মনে করে এবং আল্লাহর কঠিন পাকড়াওয়ের কথা ভুলে যায়। এ-কারণেই ইতিহাস তার শিক্ষা পুনরাবৃত্তি করে থাকে।

পাঁচ.

অভিজ্ঞতা এ-বিষয়টির সাক্ষ্য যে, হক ও সত্যের আন্দোলন, এবং শুধু সত্যের আন্দোলনই নয়, বরং প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলন জাতির যুবক শ্রেণির ওপর যত দ্রুত এবং যে-পরিমাণ প্রভাব ও ক্রিয়া করতে পারে, জাতির বয়স্ক ও প্রবীণদের ওপর তত দ্রুত ও সে-পরিমাণ প্রভাব ও

ক্রিয়া করতে পারে না। মনোবিজ্ঞান (psychology) বিষয়ে অভিজ্ঞগণ এর কারণ বর্ণনা করেন যে, বয়স্ক ও প্রবীণদের মন ও মস্তিষ্ক তাদের জীবদ্দশার প্রধান অংশে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও রীতি-নীতিতে কঠিনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীন সামাজিক আচার ও নীতির সঙ্গে তারা দীর্ঘকাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, তাদের শিরা ও ধমনীতে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। ফলে যেসব আন্দোলনে প্রাচীন প্রথা ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নতুন বিশ্বাস ও প্রত্যয় প্রকাশ পায়, সেগুলোর প্রভাবে তাদের মন ও মস্তিষ্ক যন্ত্রণা ও পীড়ন বোধ করে। প্রাচীন সংস্কার ও নতুন বিপ্লবের দ্বন্দ্ব তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা নতুন বিপ্লব বা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য তাদের মধ্যে যাদের মন ও মস্তিষ্ক আবেগের মোকাবিলায় বিবেক ও বুদ্ধিকে এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপরীতে দলিল ও প্রমাণকে পথপ্রদর্শক করে নেয় এবং প্রতিটি বিষয়ে নতুনত্ব ও প্রাচীনত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলোর কল্যাণ ও অকল্যাণ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা, করে তারা উল্লিখিত সাধারণ নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র। যখন তারা প্রমাণের শক্তিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের কল্যাণকে অনুভব করে, ওই আন্দোলনের জন্য তারা শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক প্রমাণিত হয়। কিন্তু দল ও জাতির মধ্যে এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম হয়ে থাকে।

অন্যদিকে বয়স্ক ও প্রবীণ লোকদের বিপরীতে যুবক শ্রেণির মন ও মস্তিষ্ক বেশ বড় পর্যায়ে নিরপেক্ষ হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার ততটা দৃঢ়মূল হয় না। ফলে তাদের মানসপটে নতুন চিত্রসমূহ খুব দ্রুত অঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা কোনো পরিবর্তন ও বিপ্লবকে কেবল এ-কারণে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে না যে, তা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানাচ্ছে। তারা হৃদয়ের স্পৃহার সঙ্গে আন্দোলনে অগ্রগামী হয়ে থাকে এবং পরিচ্ছন্ন ও সরল মন ও মস্তিষ্কের সঙ্গে সে-ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে সততা ও সত্যতা সক্রিয় থাকবে এবং দল ও জাতিকে ভ্রান্তির পথ থেকে বের করে এনে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে আহ্বান জানাবে। ফলে দলে দলে মানুষ ওই আন্দোলনের প্রতি ধাবমান হবে। তার অনুসরণকারীদের জীবন

বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে এবং বিশ্বজগতের জন্য তাদের অস্তিত্ব হয়ে ওঠে রহমতস্বরূপ। আর যদি বৈপ্লবিক আন্দোলন বিপরীত চরিত্রের হয়, তবে তা নতুন এবং পরিচ্ছন্ন মন-মস্তিষ্কের অধিকারী যুবক শ্রেণিকে ধ্বংস ও বিনাশের পথে নিয়ে যায়। তাদের অস্তিত্ব মানবজগতের জন্য আপদ ও শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়।

কুরআন মাজিদ আসহাবুল কাহ্ফের ঘটনাটিকে প্রকাশ করার মাধ্যমে উপদেশ ও নসিহতের কিছু দিক স্পষ্ট করেছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নাফসিয়্যাত বা মানসিকতা ও মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

কুরআন মাজিদ বলতে চায় যে, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোকদের অধিকাংশই ইসলামের পবিত্র শিক্ষা থেকে বিমুখ ছিলো এবং ব্যক্তিক ও সামগ্রিক মানবজীবনের নতুন বিপ্লব (ইসলাম)-এর ব্যাপারে ভীত ছিলো। তাদের যুবক শ্রেণির অধিকাংশই দ্রুত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো এবং ইসলামের বিপ্লবী আহ্বানের আকর্ষণে দলে দলে তার ছায়াতলে সমবেত হয়েছিলো। এটা পৃথিবীর কোনো অদৃষ্টপূর্ব প্রদর্শনী নয়; বরং যখনই প্রাচীন রীতি-নীতি এবং মিথ্যা প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী ও রাসুলগণ সত্য ও সততার বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়েছেন, তখন সত্য গ্রহণ করার জন্য বয়স্ক লোকদের চেয়ে যুবকদের মন ও মস্তিষ্কের ওপরই তার গভীর প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে।

contents

ভূমিকা

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মধ্যে সাবা ও সাইলুল আরিমের ঘটনাও অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে এবং বহু জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাসে শত-সহস্র শিক্ষা ও উপদেশের উপকরণ জুগিয়ে দেয়।

জাতিরসমূহের উত্থান ও পতনের পটভূমি অদৃষ্ট বা দৈব ক্রিয়াকাণ্ডের অনুগ্রহের ফল নয়; বরং তা সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত মৌলনীতির ভিত্তিতেই রচিত হয়ে থাকে। অবশ্য কখনো কখনো উত্থান ও পতনের কারণগুলো এতটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে থাকে যে, সাধারণভাবে তা হয়তো চোখে দেখা যায় অথবা জ্ঞান-বুদ্ধির সামান্য মনোনিবেশেই চিনে নেয়া যায়। আবার কখনো কখনো উত্থান-পতনের উপস্থিতি এমনসব কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে যার সম্পর্ক সাধারণ কারণ ও উপকরণ থেকে ভিন্ন এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও অবাধ্যাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে একটি জাতির মধ্যে উন্নতি ও উৎকর্ষের কারণ ও উপকরণ বিদ্যমান থাকে, তারপরও ওই জাতি অকস্মাৎ ধ্বংস ও বিনাশের মুখে পতিত হয়। ফলে মানবজগতের জন্য ওই জাতির ধ্বংস বিস্ময়কর ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন তাদের অবাধ্যাচরণ ও বিদ্রোহ এবং আল্লাহর হুকুম-আহকামের অবিরাম লঙ্ঘন ও বিরুদ্ধবাদিতার ওপর থেকে পর্দা সরে যায় এবং আল্লাহর ওহি তাদের কৃতকর্ম ও পরিণামের সর্বসাধারণের সামনে উপস্থিত করে, তখন বুদ্ধিমান মানুষেরা বিশ্বাস করে নেন যে, ওই জাতির সামাজিক জীবনের চমৎকার খোলসের মধ্যে এমন নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত অবস্থা বিরাজমান ছিলো। অতএব, ওই জাতির ধ্বংস ও বিনাশ অদৃষ্ট বা দৈব ক্রিয়াকাণ্ডের ফল নয়; বরং তা আল্লাহর বিধানাবলির 'কৃতকর্মের পরিণাম-নীতি' অনুসারেই ঘটেছে।

সাবা ও সাবার সম্প্রদায়ের যে-শিক্ষনীয় পরিণাম এবং তাদের উত্থান ও পতনের যে-উপদেশমূলক ঘটনা নিচে বর্ণনা করা হচ্ছে, তা জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের দ্বিতীয় নীতি—'কৃতকর্মের পরিণাম-নীতি' অনুযায়ীই ঘটেছিলো। ইতিহাসের পাতাসমূহ এই সত্যের সাক্ষী রয়েছে যে, যে-জাতি সচ্ছলতা ও বিলাসময় জীবনের উঁচু স্তরে পৌঁছে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে জীবনযাপন করছিলো, তারা অকস্মাৎ ধ্বংস ও বিনাশের

লাঞ্ছনাদায়ক গহ্বরে পতিত হয়েছে কেবল দৈব কারণে নয়; বরং তাদের অন্তহীন অপকর্মের পরিণামে এমন নিকৃষ্ট দিন তাদেরকে দেখতে হয়েছিলো।

এখন সঙ্গত হবে কুরআন মাজিদ ওইসব বাস্তব ঘটনাকে যে-শৈলীতে বর্ণনা করে উপদেশ ও শিক্ষার উপকরণ প্রদান করেছে, ইতিহাসের নিখুঁত প্রমাণের মাধ্যমে তার বিবরণ উপস্থিত করা। যাতে কুরআন মাজিদের সত্যতার এই দিকটিও কুরআন অবিশ্বাসকারীদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ হয়ে ওঠে।

সাবা

সাবা কাহতানি সম্প্রদায়গুলো একটি শাখাগোত্র। আরব ইতিহাসবিদগণ তার বংশ-পরম্পরা বর্ণনা করেছেন এভাবে : সাবা বিন ইয়াশযাব বিন ইয়া'রাব বিন কাহতান।

কিন্তু তাওরাতে বলা হয়েছে যে, সাবা কাহতানের পুত্র।

আর ইয়াকতান (কাহতান) থেকে জন্মগ্রহণ করে আমলুদাদ, সালাফ, হিসার, মাদাত, আরাখ, হাদওয়ারাম, আওযাল, ওয়াকলাহ উবাল, আবি মায়িল, সাবাহ, খাযারমাউত, আউকির, হাবিলাহ, ইয়ারিজ, ইয়া'রাব ও ইউবাব। এরা সবাই ছিলো ইয়াকতানের বংশধর। মিসা থেকে সিফার যাওয়ার পথে এবং ইউরোপের পাহাড় পর্যন্ত তাদের আবাসভূমি বিস্তৃত ছিলো।[৪২]

যুবাইর বিন বাকার বলেন, আরবি ভাষায় কাহতান (قحطان) এবং হিব্রু ও সুরইয়ানি ভাষায় ইয়াকতান (يقطان) বা ইয়াকতান (يقطن) বলা হয়।

আধুনিক ইতিহাসবিদগণ তাওরাতের বর্ণনাকে সঠিক বলে মনে করেন। এ-কারণে কাহতানের বংশধর সম্পর্কে তাওরাতে যে-বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে তা ইতিহাসের বক্তব্যসমূহ ও শিলালিপির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক ইতিহাসবিদগণের এই বিশ্লেষণ ছাড়াও আরো একটি বিষয় হলো, এ-ধরনের বিষয়ে তাওরাতের বর্ণনা বা ভাষ্যকে অন্যান্য ঐতিহাসিক বক্তব্যের মোকাবিলায় অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

---

[৪২] আবির্ভাব, ১১শ অধ্যায়, আয়াত ২৬-৩০।

মোটকথা, তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী সাবা কাহতানের পুত্র ছিলো এবং আরবদের বর্ণনা অনুসারে কাহতানের পৌত্র ছিলো। আর ইয়ারাব তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে সাবার ভাই ছিলো আর আরবদের বক্তব্য অনুসারে কাহতানের পুত্র ছিলো।

বংশবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও ইতিহাসবিদগণ এ-ব্যাপারে একমত যে, কাহতান সম্প্রদায় সাম বিন নুহ আ.-এর বংশধরদের একটি শাখা। অবশ্য এ-ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, তারা 'আরবে আরিবা'র অংশ, না-কি 'আরবে মুস্তারিবা'র অংশ, অর্থাৎ হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। আদনানি ও কাহতানি কি একই বংশপরম্পরা, অথবা আদনানিরা তো ইসমাইল আ.-এর বংশধর আর কাহতানিরা তাদের থেকে ভিন্ন একটি প্রাচীন বংশপরম্পরা—এ-ব্যাপারে মতবিরোধ থেকে গেছে।

কোনো কোনো আরব ইতিহাসবিদের প্রবল মত এই যে, কাহতানি সম্প্রদায়গুলোও হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর এবং আরবের যাবতীয় গোত্র হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশ ছাড়া অন্যকোনো বংশ থেকে নয়। বংশবিদ্যায় অভিজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে যুবাইর বিন বাক্কার ও মুহাম্মদ বিন ইসহাকের মত এটাই।[৪৩]

আর ইমাম বুখারিও এই মত পোষণ করেছেন। এ-কারণে তিনি তাঁর সহিহুল বুখারিতে باب نسبة اليمن إلى إسماعيل শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ সংকলন করেছেন।

এই অনুচ্ছেদে তিনি একটি হাদিস সংকলন করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বনি আসলামকে—যাদেরকে খোযআর একটি শাখাগোত্র বলা হয়—নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসমাইল বলেছেন; আর খোযআ হলো বনি আয্‌দের একটি শাখা এবং সর্বসম্মতিক্রমে বনি আয্‌দ হলো কাহতান বংশোদ্ভূত। অতএব, কাহতানিরা হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশোদ্ভূত। সহিহুল বুখারির হাদিসটি নিম্নরূপ—

[৪৩] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا.

"হযরত সালামা বিন আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলাম গোত্রের একটি দলের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তারা তীর ছোঁড়ার রেওয়াজ করছিলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, 'হে বনি ইসমাইল, তোমরা তীর ছোঁড়ার অভ্যাস করো। কেননা, তোমাদের পিতা ইসমাইল আ. তীরন্দাজ ছিলেন।'"[৪৪]

আর 'আহাদিসুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে হযরত ইবারহিম আ.-এর কাহিনিতে হযরত হাজেরা রা.-এর উল্লেখ করে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন—

تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ

"হে বনি মাউস্‌সামা, হাজেরাই হলেন তোমাদের আদি মাতা।"[৪৫]

হাফেয ইবনে হাজার আসকলানি রহ. এই বাক্যের ব্যাখ্যা লিখেছেন—

"হযরত আবু হুরায়রা রা. আরবদেরকে بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ বা 'আকাশের পানির সন্তান' বলেছেন এজন্য যে, তারা নিজেদের জন্য এবং তাদের এমনসব জায়গায় তাঁবু ফেলতো যেখানে আকাশের পানি জমা হয়ে থাকতো। অথবা, আকাশের পানি দ্বারা এখানে যমযম উদ্দেশ্য। এই দুটি অর্থের প্রেক্ষিতে এই বাক্য ওইসব ব্যক্তির জন্য দলিল হতে পারে যাঁরা বলেন যে, সমগ্র আরব জাতি হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশোদ্ভূত।"

আর কেউ কেউ উল্লিখিত বাক্যে আরবদের এমন নামকরণের যে-কারণ বর্ণনা করেছেন তা হলো, বংশমর্যাদার জন্য আরব জাতিকে আকাশের পানির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বর্ষিত পানি যেমন পরিচ্ছন্ন ও নির্মল হয়ে থাকে, তেমনিভাবে আরবগণও বংশমর্যাদা ও বংশপরম্পরায় পরিষ্কার ও ত্রুটিমুক্ত। বাক্যের অর্থ যদি এটাই হয়ে থাকে তবে এটা উল্লিখিত ব্যক্তিদের জন্য দলিল নয়।

একটু এগিয়ে গিয়ে হযরত ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন—

---

[৪৪] সহিহুল বুখারি : হাদিস ২৮৯৯; ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা।

[৪৫] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৩৫৮।

"ইনশাআল্লাহ, একটু পরেই মানাকিব ও ফাযায়িল-এর আলোচনার শুরুতে এ-বিষয়ে আরো বিস্তারিত বিবরণ আসবে।"[৪৬]

কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ওই স্থানে পৌঁছে প্রথম কথাটিকে স্বীকার করেন না এবং দ্বিতীয় বক্তব্যকেই সঠিক বলে মনে করেন। একটু পরেই তা জানা যাবে।

গবেষকগণ দাবি করেন যে, সমগ্র আরব জাতির বংশসমূহের উৎস মাত্র দুটি : আদনান ও কাহতান। আদনান হলো হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর এবং আরবে মুস্তারিবা (অর্থাৎ, আদি আরব নয়) আর কাহতান আরবে আরিবা (আদি আরব)। যেনো, তাঁদের মতে কাহতানিরা হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর নয়। হামদানি[৪৭], ইবনে আবদুল বার[৪৮], ইবনে হাজার আসকালানি, ইবনুল কালবি এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এই মতই পোষণ করেন—

قال هشام: ومن زعم أن قحطان ليس من ولد إسماعيل فإنه يقول: قحطان، هو يقطون بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح.

قال أبو عمر: هكذا قال ابن الكلبي في العرب العاربة، ورأيت بخط أبي جعفر العقيلي، قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سلام بن مسكين، قال: نا عون بن ربيعة، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، قال: العرب العاربة: قحطان بن الهميسع، والامداد، والسالفات وحضرموت.

وهذا حديث حسن الإسناد، وهو أعلى ما روي في هذا الباب وأولى بالصواب، والله أعلم.

"হিশাম বলেন, যাঁরা দাবি করেন যে, কাহতান হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর নন, তাঁরা বলেন, (কাহতানের বংশপরম্পরা বর্ণনা করে থাকে এভাবে—) কাহতান, তিনি হলেন ইয়াকতুন বিন আবির বিন শালিখ বিন আরফাখ্শায্ বিন সাম বিন নুহ।"

---

[৪৬] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, পরিচ্ছেদ : واتخذ الله إبراهيم خليلا।

[৪৭] আবু মুহাম্মদ আল-হাসান বিন আহমদ আল-হামদানি রহ.।

[৪৮] আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল বার আন-নামিরি আল-উনদুসি, আল-কুরতুবি রহ. (৯৭৮-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ)।

"আবু উমর (ইবনে আবদুল বার) বলেন, ইবনুল কালবিও আরবে 'আল-আরাবুল আরিবা' ব্যাপারে একই কথা বলেছেন। আর আমি আবু জাফর আল-আকিলির হস্তলিখিত একটি রেওয়ায়েত দেখেছি, (তা হলো,) তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন ইসমাইল থেকে, তিনি সালাম বিন মিসকিন থেকে, তিনি আউন বিন রবিয়া থেকে, তিনি ইয়াযিদ আল-ফারিসি থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল-আরাবুল আরিবা হলো কাহতান বিন হুমাইস, আলমদাদ, আস-সালিফাত এবং হাযারামাউত।"

"এই হাদিসটির সনদ হাসান; এই অনুচ্ছেদে যা-কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এটি সর্বোচ্চ স্তরের এবং অধিকতর শুদ্ধ।"[৪৯]

বরং আল্লামা ইবনে কাসির তো বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মত এটাই—

لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل. وعندهم أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين قحطانية وعدنانية.

"সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের এ-ব্যাপারে একমত যে, কাহতানি আরবগণ—চাই তারা ইয়ামানি হোক বা ইয়ামানি না হোক—হযরত ইসমাইল আ-এর বংশধর নয়। তাঁদের মতে আরবের সমগ্র জাতি দুটি উৎসস্থলে বিভক্ত : কাহতানি ও আদনানি।"[৫০]

আর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের পক্ষে ইবনে হাজার আসকালানি রহ. 'বনি আসলাম' সম্পর্কিত হাদিসটির যে-জবাব প্রদান করেছেন তা হলো, এই হাদিস থেকে এমন প্রমাণ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, যে-কোনো গোত্রই কাহতানের সঙ্গে সম্পর্কিত তারা সবাই হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশোদ্ভূত। কেননা, কোনো কোনো কাহতানি গোত্র সম্পর্কে বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, তারা কাহতানি না-কি আদনানি। বনি খোযাআ সম্পর্কে এ-ধরনের বিতর্ক আছে। সুতরাং এটা সম্ভব যে, বনি আসলামের ব্যাপারে এ-ধরনের মতভেদ আছে।

[৪৯] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।

[৫০] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

(প্রকৃতপক্ষেই আছে।) আর ইবনে আবদুল বার এই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাতে একটি অতিরিক্ত কথা আছে : বনি খোযাআ ও বনি আসলাম উভয় সম্প্রদায়ই তীরনিক্ষেপ চর্চা করছিলো। তো হতে পারে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি খোযাআর সদস্য সংখ্যা অধিক থাকায় তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে এ-ধরনের কথা বলেছেন।[৫১]

এসব জবাব প্রদান ছাড়াও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি আরবের বংশ-সম্পর্কিত বিদ্যার বিখ্যাত আলেম হামদানি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়ামানি সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব কাহতানি সম্প্রদায় হিজাযে এসে বসবাস করতে শুরু করে তাদের মধ্যে ও আদনানি গোত্রগুলোর মধ্যে অধিক হারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো। এ-কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপক অর্থে এ-ধরনের কথা বলে থাকবেন। অর্থাৎ, পৈত্রিক বংশপরম্পরার পরিবর্তে মাতৃবংশ-পরম্পরায় তাদেরকে হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর বলেছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে হামদানির এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইয়ামান থেকে বের হওয়ার পর কাহতানি ও আদনানি গোত্রগুলোর পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক এই অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ কাহতানি সম্প্রদায়গুলোকে আদনানি আর আদনানি সম্প্রদায়গুলো কাহতানি বলেছেন। যেমন, মদিনার আনসার (আওস ও খাযরাজ) গোত্রগুলো সম্পর্কে বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ সবাই একমত যে, তারা মূলত কাহতানি। অবশ্য এই বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ব্যাপক অর্থে কোনো কোনো সময় তাদেরকে আদনানিও বলা হয়ে থাকে এবং এ-কারণে কোনো কোনো ইতিহাসবিদের এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, তাঁরা কাহতানি নন, বরং আদানানি।

ইবনে আবদুল বার[৫২] বলেন—

---

[৫১] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২০।

[৫২] আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল বার আন-নামিরি আল-উনদুসি, আল-কুরতুবি রহ. (৯৭৮-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ)।

فأول ذلك الأزد، وهي جرثومة من جراثيم قحطان.

قال ابن إسحاق، وابن الكلبي: الأزد بن الغوث بن النبت بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

وافترقت الأزد، فيما ذكر ابن عبدة وغيره من علماء النساب، على نحو سبع وعشرين قبيلة، فمنهم: الأنصار، وهم حيان: الأوس والخزرج.

قال ابن إسحاق: أمهما قيلة، ابنة كاهل بن عذرة، من قضاعة، كانت تحت حارثة بن ثعلبة.

وروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، رضي الله عنهما: إن قضاعة، ابن معد.

"ইয়ামানি গোত্রগুলোর মধ্যে প্রথম গোত্রটি হলো আল-আয্দ। তারা কাহতানের বীজবংশগুলোর একটি বংশ।"

"মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও ইবনুল কালবি বলেন, আয্দ বিন গাউস বিন নাবত বিন যায়দ বিন মালিক বিন যায়দ বিন কাহলান বিন সাবা বিন ইয়াশযাব বিন ইয়ারাব বিন কাহতান।"

"ইবনে আবদুহু ও বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ অন্য উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী আয্দ (সম্প্রদায়) প্রায় সাতাশটি গোত্রে বিভক্ত। তাদের মধ্যে আনসারদের দুটি গোত্র আওস ও খাযরাজও রয়েছে।"[৫৩]

"মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, আওস ও খাযরাজের মাতা কাইলাহ বিনতে কাহিল বিন উযরাহ ছিলেন কোযাআ গোত্রের সন্তান। তাঁকে হারিসাহ বিন সা'লাবা বিয়ে করেছিলেন। (আর সা'লাবা ছিলেন কাহতানি বংশোদ্ভূত।)"[৫৪]

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, বনি কোযাআর বংশপরম্পরা হলো কোযাআ বিন মা'দ (বিন আদনান)।"[৫৫]

---

[৫৩] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ১০৬।

[৫৪] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ১০৯।

[৫৫] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ৬৩।

একইভাবে 'আরদুল কুরআন'-এর রচয়িতার বক্তব্যও সঠিক। তিনি এ-ব্যাপারে বর্ণনা করেন, 'বংশবিদ্যা ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ কতিপয় আলেম স্বয়ং কাহতানকে কেনো হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশোদ্ভূত বলেন?' তিনি বলেন, 'এই অত্যুক্তির মধ্যে আসল সত্য কেবল এতটুকু যে, কোনো কোনো কাহতানি ইসমাইলি বংশোদ্ভূত; ইয়ামানে বসবাসের ফলে বা অন্যাকোনো কারণে তাদেরকে কাহতানি ধরে নেয়া হয়েছে।'

একদিকে কতিপয় আদনানি গোত্রের ইয়ামানে গিয়ে স্থায়ী আবাসস্থল নির্মাণ করা, আর অন্যদিকে সাবা জাতির বিস্তৃতির ফলে কতিপয় কাহতানি গোত্রের হিজায, শাম, ইরাক, নাজদ ও বাহরাইনে গিয়ে আবাসভূমি বানানো এবং আদনানি গোত্রগুলোর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন—এমনসব বিষয় যার ফলে কোনো কোনো গোত্রের কাহতানি বা আদনানি হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য আরবদের মনে স্বয়ং কাহতানের ইসমাইলি বংশীয় হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কেনো এলো—এই প্রশ্নের জবাবে আমি 'আরদুল কুরআন'-এর রচয়িতার সঙ্গে একমত নই। কারণ, বংশবিদ্যায় পারদর্শী ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ যে-আলেমগণ কাহতানকে ইসমাইল আ.-এর বংশোদ্ভূত বলেছেন, তাঁরা এ-কথা বলেছেন এই বিভ্রান্তির কারণে নয় যে, কোনো কোনো আদনানি গোত্র ইয়ামানে বসবাস করার কারণে কাহতানি নামে অভিহিত হয়েছিলো। যেমন, সাইয়িদ সুলাইমান নদবি সাহেবের ধারণা, বরং এটি বংশবিদ্যায় ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ কতিপয় উলামার কাছে গৃহীত একটি স্বতন্ত্র মত। তাঁদের মতে, সমগ্র আরব জাতি হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর এবং তাঁরা মনে করেন, আরবে মুসতারিবা ব্যতীত আরবে বায়িদা বা আরবে আরিবার কোনো শাখা আরব ভূখণ্ডে অবশিষ্ট নেই।

হিজায, কা'বাতুল্লাহ ও হারাম শরিফের সঙ্গে হযরত ইসমাইল আ.-এর যে-সম্পর্ক তার মাহাত্ম্য এবং আরবের অধিকাংশ সম্প্রদায়ের আদি পিতা হওয়ার যে-সম্পর্ক তার গুরুত্ব—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণেই সম্ভবত কোনো কোনো কাহতানি গোত্রও নিজেদেরকে আদনানি নামে অভিহিত করতে শুরু করেছিলো। বিশেষ করে হিজাযে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কাহতানি গোত্রগুলো অধিক হারে নিজেদেরকে আদনানি

বলে প্রচার করেছে। ফল এই দাঁড়ালো যে, যেসব গোত্র নিজেদেরকে এই পর্দার আড়ালে গোপন রাখতে পারলো না তারা আরো এগিয়ে গিয়ে বলতে শুরু করলো যে, কাহতানিও ইসমাইলি বংশোদ্ভূত। যাতে আদনানি ও কাহতানি গোত্রগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্যই অবশিষ্ট না থাকে। কোনো কোনো গোত্রের ইসমাইলি বংশোদ্ভূত আর কোনো কোনো গোত্রের ইসমাইলি বংশোদ্ভূত না হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার পার্থক্য ছিলো। ফলে এ-বিষয়টি বংশবিদ্যায় পারদর্শী উলামায়ে কেরামের কাছে মতভেদযুক্ত হয়ে পড়েছে। হাদিসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ কতিপয় উলামায়ে কেরাম এই বক্তব্যের সমর্থন করেছেন। তার কারণ সম্ভবত এই যে, কতগুলো সহিহ রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, সমগ্র আরব জাতিই হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশোদ্ভূত। যেমন, يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ বাক্যটিতে এক ধরনের ব্যাপকতা পাওয়া যায়। অথবা যেমন, কাহতানি বলে ধারণা করা হয় এমন কতিপয় গোত্রের উদ্দেশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বনি ইসমাইল' বলে উক্তি করেছেন।

অবশ্য মুহাদ্দিসগণের এই ধারণা ঠিক নয়। ইবনে হাজার আসকালানি, ইবনে আবদুল বার, ইবনে কাসির এবং উমর ফারুক রা. ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বক্তব্য থেকে আমরা প্রমাণ করেছি যে, তাঁরা রেওয়ায়েতগুলোর এই শব্দরাশি থেকে কী উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। বরং ইবনে আবদুল বার বিষয়টিকে পরিষ্কার করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই দাবিটির প্রমাণে কয়েকটি 'মারফু' হাদিসও পেশ করা হচ্ছে। যাতে 'জুরহাম', 'সালাফ' ও 'সাকিফ'কে বাদ বাকি সব আরব গোত্রকে দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসমাইলি বংশোদ্ভূত বলেছেন। হাদিসটি নিম্নরূপ—

وروي عن النبي أنه قال: كل العرب من ولد إسماعيل إلا جرهم، فإنهم من عاد وثقيف، فإنهم من ثمود، وقبائل من حمير، فإنهم من تبع.

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের প্রতিটি গোত্র হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশ; জুরহাম ব্যতীত,

তার আদের বংশধর; এবং সাকিফ ব্যতীত, তারা সামুদের বংশধর; এবং হামিরের গোত্রগুলো ব্যতীত, তারা তুব্বার বংশধর।"[৫৬]

জানা আবশ্যক যে, এই হাদিস এবং এ-জাতীয় অন্যান্য হাদিস নির্ভর করার যোগ্য নয় এবং প্রমাণ গ্রহণেরও অযোগ্য। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এ-জাতীয় হাদিসের সম্পর্ক জুড়ে দেয়া ভুল। ইবনে আবদুল বার রহ.-এর বক্তব্যও আমাদের চিন্তার সহায়ক—

قال أبو عمر: أكثر الاختلاف المذكور في كتابنا هذا وفي غيره عن أهل النسب تولّد من اختلافهم في نسبة جميع العرب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، على ما قدمنا ذكره في كتابنا هذا في باب قحطان وغيره.

"আবু উমর (ইবনে আবদুল বার) বলেন, আমার এই কিতাবে এবং বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ অন্য আলেমগণের কিতাবে আরবের গোত্রগুলো সম্পর্কে যে-মতভেদ পাওয়া যায় তা এই মতবাদের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে যে, 'সমগ্র আরব জাতি হযরত ইসমাইল বিন ইবরাহিম (আলাইহিমাস সালাম)-এর বংশধর।' কাহতান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদে ইতোপূর্বে আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি।"[৫৭]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ.-এর বক্তব্যও আমাদের চিন্তার সমর্থন করছে—

قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والتحية والاكرام.

والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل وقد قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفي زمانه أيضا.

"বলা হয়ে থাকে যে, আরবের সব জাতিই বংশপরম্পরায় ইসমাইল বিন ইবরাহিম (আলাইহিমাস সালাম ওয়াত তাহিয়্যাহ ওয়াল ইকরাম)-এর

---

[৫৬] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার। এ-ধরনের রেওয়ায়েতগুলোর সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৫৭] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ১০৬।

সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ কথা এই যে, 'আল-আরাবুল আরিবা' (আরবের প্রাচীন গোত্রগুলো) হযরত ইসমাইল আ.-এর (জন্মের) পূর্ব থেকেই আরবের বাসিন্দা। আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, 'আল-আরাবুল আরিবা'-এর গোত্রগুলো—আদ, সামুদ, তাস্ম, জাদিস, আমিম, জুরহাম ও আমালিক এবং অন্যান্য গোত্র, কেবল আল্লাহই তাদের অবস্থা অবগত আছেন, হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর (জন্মের) পূর্ব থেকেই আরবে ছিলো এবং তাঁর যুগেও ওইসব গোত্রের বংশধরেরা ছিলো।"[৫৮]

হযরত আবু হুরায়রাহ রা. আরববাসীদের সম্বোধন করে হযরত হাজেরা রা. সম্পর্কে যে-উক্তি করেছিলেন—অর্থাৎ, تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ "হে বনি মাউস্সামা, হাজেরাই হলেন তোমাদের আদি মাতা"—তার ব্যাপারে বলা যায়, তিনি হিজাযে বসবাসকারী আদনানি গোত্রগুলোর সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ করেই সম্ভবত এ-ধরনের কথা বলেছিলেন। অথবা, এ-কারণে বলেছেন যে, আরবের কাহতানি গোত্রগুলো বা আদনানি গোত্রগুলো পিতার দিক থেকে অথবা মাতার দিক থেকে কোনো-না-কোনো সম্পর্কে অবশ্যই হযরত হাজেরা রা.-এর বংশধর।

পক্ষান্তরে, হযরত আবু হুরায়রাহ রা.-এর উক্তি থেকে যদি এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয় যে, আরবের সব জাতি পিতার দিক থেকে হযরত হাজেরার সন্তান হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর, তবে তা প্রকৃত ঘটনার বিরোধী হবে এবং ওইসব সহিহ রেওয়ায়েতেরও বিরোধী হবে যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আরব জাতিগুলো বংশপরম্পরায় কাহতানি ও আদনানি গোত্রগুলো ছাড়াও জুরহাম ও অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত, যাদেরকে 'আল-আরাবুল আরিবাহ' বলা হতো। তাওরাত এবং ইতিহাসবিদগণ তাদের অনেক ধারা বর্ণনা করেছেন।

সাবা শব্দটি নাম না উপাধি

'সাবা' শব্দটি কারো নাম না-কি উপাধি—এই প্রশ্নের জবাবও আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাওরাতের বক্তব্য অনুযায়ী এটি নাম আর

[৫৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, 'সাবা' হলো উপাধি আর নাম হলো 'আমর' বা 'আবদে শাম্‌স'।[৫৯] বর্তমান যুগের ইতিহাসবিদগণ এই বক্তব্যকেই সঠিক বলে মনে করেন। আরব ইতিহাসবিদগণ 'সাবা' শব্দটির উপাধি হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, উপাধি হিসেবে সাবা শব্দটি তার 'কায়দ' (বন্দি করা) অর্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। সে প্রথম আরবে 'যুদ্ধবন্দি'র নীতি প্রচলন করেছিলো এবং যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস বানিয়েছিলো। এ-কারণে সে সাবা উপাধি লাভ করেছে। আধুনিক ইতিহাসবিদগণ বলেন, 'সাবা' শব্দটি س 'সিন', ب 'বা' ও الف مع الهمزة 'হামযাযুক্ত আলিফ'-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থও রয়েছে। সাবা ও তার সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতো; ফলে সে ও তার সম্প্রদায় 'সাবা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন, আজও আরবি অভিধানগুলো শব্দটি 'মদ ব্যবসায়'-এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে : سبأ الخمر شراها بشربها و سبي سباء الخمر حملها من بلد إلى بلد।[৬০]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, আর-রায়িশও (الرائش) ছিলো তাদের উপাধি। অভিধানে ريش বা رياش-এর অর্থ সম্পদ। এই ব্যক্তি ছিলেন অনেক বড় বিজেতা ও দানবীর। মানুষকে বিপুল পরিমাণে দান-খয়রাত করতেন। ফলে এই উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শাসনকাল

সাধারণ ইতিহাসবিদগণ বলেন, সাবা চল্লিশ বছর শাসন করেছেন।[৬১] তবে আধুনিক ইতিহাসদর্শনের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত বাক্যের অর্থ মনে করা হয় যে, এতে সাবার বংশের শাসনকাল বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই নিয়ম এখানে সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, যদি কাহতানের তৃতীয় পুরুষ থেকে এই সময়সীমা শুরু করা হয়, তবে তা খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২৫০০ সাল হতে পারে। এই হিসেবে সাবার শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালে

---

[৫৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮; তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড।

[৬০] আকরাবুল মাওয়ারিদ।

[৬১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ আমরা হযরত সুলাইমান আ.-এর আলোচনায় তাওরাত থেকে প্রমাণ করেছি যে, খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০ সালে 'সাবা'র রানি বিলকিস হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন পেশ করেছিলেন। সুরা নামলে বর্ণিত সাবার রানির ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওই সময়টা ছিলো সাবার শাসনকালের চরম উন্নতির সময়। যেমন, যাবুরে হযরত দাউদ আ.-এর প্রার্থনার উল্লেখ রয়েছে—

"হে আল্লাহ, বাদশাহকে ন্যায়বিচারের গুণাবলি দান করুন এবং বাদশাহর পুত্রকে সততা দান করুন। সে আপনার বান্দাদের মধ্যে সততার সঙ্গে শাসনকর্ম পরিচালনা করবে। তারসিস ও দ্বীপসমূহের শাসকেরা নযরানা ও উপহার পেশ করবে। সে জীবিত থাকবে এবং সাবার স্বর্ণরাশি তাঁকে দেয়া হবে। তার জন্য সবসময় প্রার্থনা করা হবে।"[৬২]

হযরত দাউদ আ.-এর এই প্রার্থনা গৃহীত হলো এবং খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০ সালে তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে সাবার রানি উপস্থিত হয়ে বিপুল স্বর্ণ ও মহামূল্যবান মণি-মুক্তা-হীরা পেশ করলেন।

সুতরাং, আমাদের মনে হচ্ছে যে, হয়তো সাবার আয়ুষ্কালের ব্যাপারে অত্যুক্তি করা হয়েছে অথবা ওই বক্তব্যের মাধ্যমে সাবা বংশের সব বাদশাহর শাসনকাল বর্ণনা করা হয় নি; বরং তাদের শাসনের দ্বিতীয় স্তর সাবা রাজ্যের শাসনকালের সীমা উল্লেখ করা হয়েছে যা কমবেশি চারশো চল্লিশ বছর।[৬৩]

সাবা ও শাসনকালের স্তরসমূহ

ইতিহাসবিদগণ বলেন, সাবার পুত্র ছিলো দুইজন : একজনের নাম হিমইয়ার এবং দ্বিতীয়জনের নাম কাহলান। সব কাহতানি গোত্র এই দুজনের বংশধরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইতিহাসবিদগণ এটাও বলেন যে, নাবিত ও কিদারের বংশধর আদনানি (ইসমাইলি) গোত্রগুলোর বাসস্থান আরবের উত্তরাঞ্চল (ইয়ামান)।

---

[৬২] যাবুর, ৭২।

[৬৩] আরদুল কুরআন।

সাধারণ বংশবিদ্যা-বিশেষজ্ঞগণ যখন সাবার শাসনের উল্লেখ করেন, তাঁরা হিমইয়ারকে সরাসরি সাবার স্থলাভিষিক্ত বলে থাকেন এবং গোটা শাসন-পরম্পরাকে 'হিমইয়ারি শাসন' বলে স্মরণ করেন। তাঁরা সাবার শাসনকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেন না। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ-ধরনের চিন্তাধারা একেবারেই ভ্রান্তিমূলক। কেননা, ইয়ামানের সাবায়ি শাসনকালের যেসব শিলালিপি আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা ছাড়া সাবার সমসাময়িক গ্রিক ও রোমান ইতিহাসবিদগণ যেসব ঐতিহাসিক প্রমাণ রেখে গেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাবার শাসনকাল দুই স্তরে বিভক্ত। তারপর প্রত্যেক স্তরের শাসনকাল দুটি ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভক্ত।

প্রথম স্তরের প্রথম যুগ খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১১০০ সাল থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সালে এসে শেষ হয়েছে। কেননা, শিলালিপির উক্তি অনুসারে সর্বপ্রথম যাবুরে ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাবার শাসনকালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধারণা করা হয়, এটা ছিলো সাবার শাসনকালের উৎকর্ষের যুগ। এ-যুগে সাবার শাসনকর্তাদের উপাধি ছিলো 'মাকরাবে[৬৪] সাবা'। আর হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগের সাবার রানি বিলকিস এই যুগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

প্রথম স্তরের দ্বিতীয় যুগ খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সাল থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ সালে এসে শেষ হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। 'সাইলুল আরিম' (আরিমের প্লাবন) এবং সাবা জাতির বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া এই যুগের ঘটনা। এ-যুগপর্বের শাসকদেরকে 'মুলকে সাবা' বলা হতো।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম যুগ খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ সালে শুরু হয়ে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এসে সমাপ্ত হয়েছে। এই কালপর্বের বাদশাহদেরকে 'সাবা দারিদান' ও 'মুলকে হিমইয়ার নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। দারিদান তাদের বিখ্যাত দুর্গের নাম। আর সাবা ও হিমইয়ার জাতীয়তাকে প্রকাশ করে। হিমইয়ারি বর্ষ তেমন প্রসিদ্ধ নয়; কিন্তু তাদের একটি শিলালিপিতে হাবশার (আবিসিনিয়ার) শাসককর্তৃক ইয়ামান আক্রমণ এবং যু-নাওয়াসের মৃত্যুর (তারিখ) উল্লেখ রয়েছে। আরব ও রোমান ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুসারে এই ঘটনা ৬২৫

---

[৬৪] مكرب-এর বহুবচন مكارِب।

খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিলো, আর শিলালিপিতে ৬৪০ হিমইয়ারি সালের কথা লেখা আছে। এই হিসাব অনুযায়ী হিমইয়ারি সালের সূচনা খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ সালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। ওই যুগে সাবার এই বংশ কেবল ইয়ামান এবং ইয়ামানের আশপাশের এলাকার শাসক ছিলো।

আর দ্বিতীয় স্তরের দ্বিতীয় যুগ ৩০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে শুরু হয়ে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে এসে সমাপ্ত হয়েছে। এই যুগে শেষবারের মতো হাবশার অধিবাসীরা ইয়ামান দখল করে নেয়। এমনকি ইয়ামান পর্যন্ত ইসলামের সূর্যালোক পৌঁছে যায় এবং সমগ্র ইয়ামান একদিনে ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানিত হয়। এ-সময় সাবায়ি শাসনের ধারাবাহিকতা অবশিষ্ট ছিলো না। ৪০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে হাবশার আকসুমি বংশ ইয়ামান জয় করে কিছুদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করে। কয়েক বছর পর হিমইয়ারি শাসক তা পুনরুদ্ধার করে। আরব ইতিহাসবিদদের কাছে এই সময়ের ইয়ামানের শাসকদের 'তুব্বা' উপাধি প্রসিদ্ধি পায় এবং তাঁরা 'তাবাবিয়ায়ে ইয়ামান' নামে অভিহিত হয়। সামি (সেমিটীয়) ভাষায় তুব্বা শব্দের অর্থ সুলতান ও অত্যাচারী বাদশাহ। এই যুগে হিমইয়ারিরা ইয়ামান ছাড়াও হাযরামাউত, নাজদ ও তিহামা পর্যন্ত তাদের রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলো, ফলে তারা 'তুব্বা' নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলো। দেখা যাচ্ছে যে, তাদের যুগের শিলালিপিগুলোতে 'মুলকে সাবা ও দারিদান ও হাযরামাউত' এবং 'মুলকে সাবা ও দারিদান ও হাযরামাউত ও নাজদ' এবং অন্যান্য রাজ্যের নাম খোদিত রয়েছে। কুরআন মাজিদের সুরা দুখান ও সুরা কাফ-এ যে-তুব্বাদের কথা বলা হয়েছে এরাই ওই তুব্বা। দারিদানের দুর্গ তাদের প্রাথমিক রাজধানী ছিলো। এটি যিফার শহরের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত। এটি ইয়ামানের বর্তমান রাজধানী সানআর সংলগ্ন। সাবার প্রাথমিক স্তরের বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে তাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। তখন হিমইয়ারিরা মাআরিব পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত করে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ হামযা ইস্‌ফাহানির বর্ণনা থেকে সাবার উল্লিখিত স্তরবিন্যাস পাওয়া যায়—

و أول من ملك من أولاد قحطان حمير بن سبأ فبقى مليكا حتى مات هرما و تو‌ارث ولده الملك بعده فلم يعدهم الملك حتى مضت قرون و صار الملك إلى

الحارث و هو تبع الأول فمن ملك اليمن قبل الرائش ملكان ملك بسبا و ملك بحضرموت فكان لا يجمع اليمانيون كلهم عليهم إلى أن ملك الرائش فاجتمعوا عليه و تبعوه فسمي تبعا.

"কাহতানের বংশধরদের মধ্যে প্রথম বাদশাহর নাম হিমইয়ার বিন সাবা। এই ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত বাদশাহ ছিলো। তারপর এই রাজত্ব তার বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে চলতে লাগলো এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের অধিকারেই থাকলো। তারপর হারিস আর-রায়িশ বাদশাহ হলো। এ-ব্যক্তিই প্রথম তুব্বা। তার আগে বাদশাহ হতো দুইজন : একজন সাবায়, অন্যজন হাযরামাউতে। ইয়ামানিদের সবাই একই রাজার রাজত্বে একত্র হতো না। কিন্তু হারিস আর-রায়িশ বাদশাহ হওয়ার পর সবাই তার রাজত্বের অধীনতায় একত্র হলো এবং তার আনুগত্য গ্রহণ করলো। এ-কারণে তার নাম হয়েছে তুব্বা (অনুসৃত)।"[৬৫]

আর ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসিরও তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে এ-কথাই বর্ণনা করেছেন—

وكانت العرب تسمي كل من ملك اليمن مع الشحر وحضرموت تبعا، كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك مصر فرعون، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الهند بطليموس

"আর যে-বাদশাহ একইসঙ্গে ইয়ামানের সঙ্গে শাযার ও হাযরামাউতেরও বাদশাহ হতো, আরববাসীরা তাদেরকে তুব্বা বলতো। যেমন, শাম ও জাযিরাহ এই উভয় রাজ্যের রাজাকে তারা কায়সার বলতো। আর যারা পারস্যের রাজা হতো তাদেরকে কিসরা বলতো। মিসরের রাজাকে বলতো ফেরআউন, হাবশার রাজাকে বলতো নাজ্জাশি আর হিন্দুস্তানের রাজাকে বলতো বাতলিমুস।"[৬৬]

মোটকথা, সাবার রাজত্ব ও হিমইয়ারি রাজত্ব একই রাজত্ব মনে করা কেবল ইতিহাসের বিরোধী নয়; বরং কুরআন মাজিদের স্পষ্ট বর্ণনারও

---

[৬৫] পৃষ্ঠা ১০৮, কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

[৬৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯।

বিরোধী। তার কারণ এই যে, কুরআন মাজিদ সুরা নাম্‌ল ও সুরা সাবায় 'সাবা' সম্পর্কে দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছে; এই দুটি ঘটনার সম্পর্ক সাবার যে-স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা হিমইয়ারি বাদশাহগণ ও তুব্বাদের পূর্বেই অতীত হয়েছে। ফলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হিমইয়ার কখনো সরাসরি সাবার স্থলাভিষিক্ত হয় নি এবং সাবা ও হিমইয়ারের মধ্যে অনেক বেশি দূরত্ব রয়েছে। আর হিমইয়ার সাবার পুত্র হলেও তা থেকে এটা অবধারিত হয় না যে, তার নিজের যুগ এবং তার বংশধরদের মধ্যে রাজত্বকাল এক। বরং যুক্তির দাবি হলো, সাবার পরে তার বংশধরদের মধ্যে প্রথম স্তরের রাজত্বের ধারাবাহিকতা হিমইয়ারের বংশের পরিবর্তে কাহলানের কোনো পুরনো শাখায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কারণ, আমরা কাহলানের বংশধরদের মধ্যে সাবা ও মাআরিবের রাজ্যগুলোর ধ্বংসের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি। আর সাবার ধ্বংসের পর থেকেই মাআরিব পর্যন্ত হিমইয়ারি রাজত্ব শুরু হয়েছে। সাধারণ ইতিহাসবিদগণের বিপরীতে ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন যে, সাবার রাজত্ব কেবল হিমইয়ারের বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, কাহলানের বংশধরদের মধ্যেও সাবার রাজত্বের ধারাবাহিকতা চলছিলো। তিনি বলেন—

و ولد سبأ حمير بن سبأ و كهلان بن سبأ، فمن حمير و كهلان كانت ملوك اليمن من التبايعة و الأذواء.

"সাবার ছিলো দুই পুত্র পুত্র : হিমইয়ার বিন সাবা ও কাহলান বিন সাবা। হিমইয়ার ও কাহলানের বংশধরেরাই ইয়ামানের বাদশাহ তাবাবিআহ (তুব্বা-এর বহুবচন) ও আযওয়া হয়েছে।"

মাকারিবে সাবা ও মুলুকে সাবা

ইতিহাসের পাতায় সাবার প্রথম স্তরের প্রথম যুগের শাসকদেরকে 'মাকারিবে সাবা' উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মাকারিব শব্দটি 'মাকা', অর্থ ধর্মীয় এবং 'বির', অর্থ মালিক—এই শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। এ থেকে মনে হয় যে, ধর্মীয় নেতা, অর্থাৎ, কাহিন শাসকদের শাসনেই সাবার রাজত্বের প্রাথমিক যুগের সূচনা হয়েছিলো। এই বাদশাহদের রাজধানী ছিলো 'সারওয়াহ'। সারওয়াহ অবস্থিত ছিলো

সানআ ও মাআরিবের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং তার ধ্বংসাবশেষ আজো অবশিষ্ট আছে। মুলুকে সাবা বা সাবার রাজা-বাদশাহদের রাজধানী ছিলো মাআরিব। তাদের বাদশাহ তার প্রসিদ্ধ দুর্গ 'সালহিনে' বসবাস করতো। মুসলমান ইতিহাসবিদদের আগেই জাহেলি যুগের কবি ইবনে আলাকামা এই দুটি রাজত্বকালকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করে বলেছেন—

من يا من الحدثان بعد   ملوك صرواح و مارب

"সারওয়াহ ও মাআরিবের বাদশাহদের পরে এখন কে
আর কালের করালগ্রাস থেকে রক্ষিত থাকতে পারে?"

এই কবিই সালহিন দুর্গের উল্লেখ করে বলছেন—

و قصر سلحين قد عفاه   ريب الزمان الذى يريب

"আর সালহিন দুর্গের রাজমহলকে যুগের
অবিরাম ঘূর্ণিপাক বিলীন করে দিয়েছে।"

রাজত্বের বিস্তৃতি

দক্ষিণ আরব 'ইয়ামানে'র পূর্বাঞ্চল থেকে সাবার সাবার রাজত্ব শুরু হয়েছে। এই রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিলো সারওয়াহ, পরে রাজধানী হয়েছে মাআরিব। ধীরে ধীরে এই রাজত্ব উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করে। অন্যান্য রাজ্য জয় করার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক উপায়েও প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এভাবে সাবার রাজত্বের বলয় বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে শুরু করে। তার সীমান্তরেখাসমূহ উত্তর আরব থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত দৃশ্যমান হতে লাগলো। যেমন, হাবশা রাজ্যের উযনিয়া জেলা সাবার অধিকৃত অঞ্চলসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং সাবা রাজ্যের পক্ষ থেকে 'মাগাফির' উপাধিতে ভূষিত এক সাবায়ি ব্যক্তি ওখানে শাসনকর্ম পরিচালনা করতো। ইয়ামান থেকে হিজাযের পথে শাম পর্যন্ত যে-প্রাচীন বাণিজ্যিক সড়ক ছিলো এবং কুরআন মাজিদ সুরা কুরাইশে যাকে رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ বলে উল্লেখ করেছে এবং অন্য এক স্থানে বলেছে إِمَامٍ مُبِينٍ বলেছে, সেই সড়কও তাদের দখলে চলে এসেছিলো। শাম, ফিলিস্তিন ও মাদইয়ানের উপকণ্ঠেও তাদের অধিকৃত অনেক এলাকা ছিলো।

এইভাবে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে মাঈনবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে সাবার রাজত্ব আরবের সুবিশাল ও সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিলো।[৬৭]

শাসনপদ্ধতি

সাবার শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ বলেন, ওই যুগের সীমিত যোগাযোগব্যবস্থা ও উপকরণের প্রতি লক্ষ রেখে জরুরি মনে করা হতো যে, রাজধানী থেকে দূরে অবস্থিত শহর ও বসতিগুলোতে স্বাধীন গর্ভনরদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব হবে এবং তারা কেন্দ্রীয় রাজ্যের অধীন এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে তাদের রাজত্ব পরিচালনা করবেন। এই নীতি অনুসারে ইয়ামানের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তার নীতিমালা ও আইন-শৃঙ্খলা ছিলো এমন : কেন্দ্রের আশপাশের এলাকা ও ছোট ছোট শহরগুলোতে দুর্গ থাকতো। দুর্গের অধিপতি দুর্গেই থাকতো এবং তাদেরকে ওই শহর বা এলাকার শাসনকর্তা ও যু (ذو) নামে আখ্যায়িত করা হতো। আর সামগ্রিকভাবে বসতিগুলোর নাম ছিলো মাহফাদ (محفد)। ইয়ামানি ভাষায় যু (ذو) শব্দের অর্থ মনিব বা প্রভু। আরবি ভাষায় তার অর্থ মালিক। শব্দটি বহুবচন أذواء। দুর্গের নামের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দুর্গের অধিপতির উপাধি নির্ধারণ করা হতো। যেমন, যু-গামদান, যু-সা'লাবান।

আবার কয়েকটি মাহফাদ (محفد)-এর সমন্বয়ে গঠিত হতো একটি মাখলাফ (مخلاف)। মাখলাফের শাসনকর্তাকে বলা হতো কিল (قيل أقيال) বা সুবাদার। قيل শব্দটির বহুবচন أقيال। এইসব আকইয়াল (কেন্দ্রীয়) বাদশাহর অনুগত ও আজ্ঞাধীন ছিলো। ইয়ামানের ইতিহাসে এই (কেন্দ্রীয়) বাদশাহদেরকেই 'মাকারিবে সাবা' ও 'মুলুকে সাবা' বলা হতো। দারিদান দুর্গ ও সালহিন দুর্গ এই বাদশাহদেরই দুর্গ ছিলো। আর দুর্গ ও রাজধানীর প্রতি সম্পৃক্ত করে বাদশাহদের উপাধি নির্ধারিত হতো। যেমন, মালিকে সাবা যু-দারিদান বা মালিকে সাবা যু-সালহিন।

---

[৬৭] বুস্তানি কর্তৃক রচিত দায়িরাতুল মাআরিফ, (সাবা); মুজামুল বুলদান (ইয়ামান)।

মাআরিবের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ থেকে যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতে অঙ্কিত ছিলো এই কথা : ضرب بيت صلحين و حفر مارب 'এই মুদ্রা সালহিন দুর্গ ও মাআরিব শহরে (-র টাকশালে) তৈরি করা হয়েছে।'
ইয়ামান ইসলামি হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আকইয়াল ও আযওয়াদের শাসনবিধান প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছিলো। ইয়ামানের এই আকইয়ালদের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বরকতময় পত্রসমূহ প্রেরণ করেছিলেন এবং তারা আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

সাবার ইমারতসমূহ

হামদানি[৬৮] প্রাচীন ইতিহাসবিদদের মতো আধুনিক ইউরোপের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সত্যিকারের ইতিহাসবিদ বলে স্বীকৃত। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الإكليل (আল-ইকলিল)[৬৯]-এর একটি অধ্যায়ে সাবার বিশাল, বিস্ময়কর ও বিচিত্র ইমারতসমূহের বর্ণনা প্রদান করেছেন। সাবা ও সাবার রাজত্ব সম্পর্কে যেসব শিলালিপি পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশ হলো এসব দুর্গ ও চমৎকার প্রাসাদসমূহের শিলালিপি। আর ইউরোপীয় পর্যটকগণও এসব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন।
তাঁরা বলেন, গামদান দুর্গের ইমারতটি ছিলো অনুপম স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। এই ইমারতটি ছিলো বিশতলা। প্রতিটি তলার উচ্চতা ছিলো স্থাপত্যনিয়মে দশ গজ। সবচেয়ে উঁচু তলাটি মূল্যবান কাচ দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো। এই ইমারতে একশোটি বড় কক্ষ ছিলো। এমন অসাধারণ ইমারত ছিলো অনেক। এগুলো ছিলো তৎকালীন উন্নত সভ্যতা ও সাবার বিস্ময়কর উৎকর্ষের নিদর্শন।[৭০]

---

[৬৮] আবু মুহাম্মদ আল-হাসান বিন আহমদ আল-হামদানি রহ.।
[৬৯] গ্রন্থটি দশ খণ্ডে মুদ্রিত।
[৭০]
يقال – إن غمدان – قصر باليمن بناه يعرب بن قحطان وملكه بعده واحتله واثلة بن حمير بن سبأ ويقال كان ارتفاعه عشرين طبقة فالله أعلم.

সাবার সভ্যতা

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, সাবার অধিবাসীরা ছিলো একটি বণিক জাতি। এই বিশেষণটি তাদের জাতিগত স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। তারা রাজত্বের উন্নতি সাধনের যেসব পন্থা ছিলো তার মধ্যে বাণিজ্যকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতো। আল্লাহ তাদের রাজ্যের সীমার ভেতরে যেসব রত্ন-ভাণ্ডার প্রোথিত রেখেছিলেন সেগুলো আরো অধিক তাদের এই স্বভাবজাত গুণের কারণে গায়বি সাহায্য হয়েছিলো। কেননা, আরব দেশে স্বর্ণ ও হীরা-মুক্তার অসংখ্য খনি রয়েছে। সেগুলোর বেশির ভাগই তাদের রাজের পরিধির ভেতরে ছিলো। মাদইয়ানে স্বর্ণ ছাড়াও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য পাওয়া যেতো। দুই ধরনের সুগন্ধি দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ার জন্য ইয়ামান ও হাযরামাউত অঞ্চল বিখ্যাত ছিলো এবং এখনো আছে। আর আম্মান ও বাহরাইনের আছে মুক্তার ভাণ্ডার। আজো ওখান থেকে সমগ্র বিশ্বে মূল্যবান মুক্তসমূহ রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ইয়ামানের বন্দর ছিলো হিন্দুস্তান ও হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) উৎপন্ন দ্রব্যের একটি বড় বাজার। আর শাম (সিরিয়া), মিসর, ইউরোপ, হিন্দুস্তান ও হাবশার মধ্যে যেসব আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসায়িক কারবার হতো, সাবা তার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রক ছিলো এবং হিজাযের পথে যাবতীয় ব্যবসায়িক পণ্য পৌঁছে দিতো। এ-কারণেই তাওরাতে অধিক হারে সাবার সম্পদ ও তাদের সামাজিক মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর সহিফায় বর্ণনা করা হয়েছে—

"মিসরের শ্রমিক এবং হাবশা ও সাবার ব্যবসায়িক পণ্য এবং শক্তিশালী মানুষ সবকিছু তোমার কাছে আসবে এবং তোমারই হবে।"[৭১]

নবী ইয়াসা'ইয়াহ আ.-এর সহিফায় আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে—

(কথিত আছে যে, ইয়ামানের গামদান ইমারতটি নির্মাণ করেছিলো কাহতানের পুত্র ইয়ারাব। তারপর ওয়াসিলাহ বিন হিমইয়ার বিন সাবা ইমারতটি দখল করে নেয় এবং তার মালিক হয়। আরো কথিত আছে যে, ইমারতটির উচ্চতা ছিলো বিশতলা।) আল-বিদয়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯।

[৭১] আয়াত : ১৪-৪৫।

“হে জেরুজালেম, উটের সারিগুলো এসে তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, মাদইয়ান ও হাইফার উটগুলোও। এগুলো সাবা থেকে আসবে এবং স্বর্ণ ও লোবান নিয়ে আসবে।”[৭২]

আর নবী ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সহিফায় আছে—

“আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, কী উদ্দেশ্যে আমার কাছে সাবার লোবান পেশ করছো?”[৭৩]

আর নবী হিযকিল আ.-এর সহিফায় আছে—

“সাবার অধিবাসীদেরকে সাধারণ লোকদের সঙ্গে আরবের মরুভূমি থেকে আনা হয়েছে। তাদের হাতে স্বর্ণের বালা এবং তাদের মাথায় চমৎকার মুকুট রয়েছে।”[৭৪]

এই সহিফার অন্য জায়গায় আছে—

“আর সাবা ও রামার বণিকগণ তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করতো। তারা তোমার বাজারগুলোতে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম ও সুগন্ধ মসলা এবং সব ধরনের হীরা-জহরত ও সোনা (বিক্রি করতো)। ইয়ামানের শহর খারান, কানাহ ও আদন এবং সাবার বণিকগণ তোমার এবং আশুর ও কলমাও তোমার বণিক। তারাই ছিলো তোমার ব্যবসায়ী। সব ধরনের বস্ত্র : কিংখাব, চৌগা, গাওয়ানি, অর্থাৎ, লালচে হলুদ বর্ণের নকশি পোশাক এবং সব ধরনের বুটিদার উত্তম কাপড়ের গাঁটরি শক্ত করে বেঁধে তোমার বাজারে বেচার জন্য নিয়ে আসতো।”[৭৫]

মাআরিবের প্রাচীর

আরব দেশগুলোতে স্বতন্ত্র নদী-নালা না থাকার কারণে অধিকাংশ সময় বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ি ঝরনাও আছে। বৃষ্টির পানিই হোক আর ঝরনার পানিই হোক—সব ধরনের পানি নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে উপত্যকার মরুভূমির সঙ্গে মিশে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সাবা জাতি এই ধরনের পানি কাজে

---

[৭২] আয়াত : ৬-৬০।

[৭৩] আয়াত : ৬-২০।

[৭৪] আয়াত : ২৩-৪২।

[৭৫] আয়াত : ২২-২৪-২৭।

লাগানোর জন্য এবং বাগান ও কৃষিভূমিসমূহ উর্বর ও সজীব রাখার জন্য ইয়ামানের আশপাশের শহর ও বসতিগুলোতে একশোটিরও বেশি বাঁধ নির্মাণ করেছিলো। এসব বাঁধের ফলে গোটাদেশ সজীব ও সতেজ হয়ে উঠেছিলো। এই বাঁধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বাঁধ ছিলো সাদ্দে মাআরিব বা মাআরিবের প্রাচীর। এটি নির্মিত হয়েছিলো রাজধানী মাআরিবে।

এই প্রাচীর সম্পর্কে আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসবিদগণ এবং পর্যটকগণ যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রমাণ করছে যে, সাবা জাতি প্রকৌশল ও জ্যামিতি শাস্ত্রে যথেষ্ট পূর্ণতা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলো।

মাআরিবের দক্ষিণে ডানদিকে ও বামদিকে দুটি পাহাড় আছে। পাহাড় দুটি 'আবলাক' নামে প্রসিদ্ধ। তাদের মধ্যখানে অত্যন্ত লম্বা ও প্রশস্ত উপত্যকা আছে। উপত্যকাটির নাম বলা হয় 'উয্‌নিয়াহ'। বৃষ্টি হলে বা পাহাড়ি ঝর্না প্রবাহিত হলে উপত্যকাটি সাগরের রূপ লাভ করতো। সাবা জাতি এই অবস্থা দেখে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ সালে উল্লিখিত পাহাড় দুটির মধ্যস্থলে বাঁধ নির্মাণ করতে শুরু করে এবং দীর্ঘকাল তার নির্মাণকাজ অব্যাহত থাকে।

কোনো কোনো আরব ইতিহাসবিদ বলেন, এই বাঁধটি ছিলো দুই বর্গমাইল।[৭৬] 'আরদুল কুরআন'-এর রচয়িতা 'ইযমাও' নামের জনৈক ইউরোপীয় পর্যটকের রচনা থেকে উদ্ধৃত করেন যে, এই বাঁধটি মূলত ১৫০ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট প্রশস্ত একটি প্রাচীর। এর একটি বিরাট অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাচীরটির এক-তৃতীয়াংশ আজো বিদ্যমান। 'আরদুল কুরআন'-এর রচয়িতা আরো লিখেছেন যে, উল্লিখিত পর্যটক তার রচনার সঙ্গে ভগ্ন প্রাচীরটির একটি চমৎকার নকশাও প্রস্তুত করে প্রচার করেছেন। এটি কেবল ফ্রেঞ্চ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি আরদুল কুরআন-এও এটি উদ্ধৃত করেছেন।

আরব ইতিহাসবিদগণ বলেন, সাবা প্রাচীরটিকে নির্মাণ করেছিলো এভাবে যে, পানি বন্ধ করার পর মওসুমের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সেচ কাজের জন্য পানির ওপরে ও নিচে তিনটি স্তর নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং প্রতিটি স্তরে ছিলো তিরিশটি করে খিড়কি ছিলো। খিড়কিগুলো

---

[৭৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯।

দিয়ে পানি বন্ধও করা যেতো, ছাড়াও যেতো। খিড়কিগুলোর নিচে একটি বিশাল হাউয নির্মাণ করা হয়েছিলো। হাউযটির ডানদিকে ও বামদিকে দুটি বড় লোহার তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিলো। তোরণ দুটি দিয়ে হাউযের পানি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মাআরিবের দুদিকে নালাগুলো দিয়ে প্রবাহিত হতো এবং প্রয়োজনমতো ওই পানিকে কাজে লাগানো হতো। এই বিশাল বাঁধটির ফলে ডানে ও বামে তিনশো বর্গমাইলের মধ্যে খেজুরের বাগান, ফলফলাদির উত্তম ও চমৎকার বাগিচা, সুগন্ধ দ্রব্যসমূহের খেত, তৃণভূমি, দারুচিনি, আগর ও অন্যান্য সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষের ঘন উদ্যান এত বেশি সৃষ্টি হয়েছিলো যে গোটা এলাকাটি পুষ্পোদ্যান ও স্বর্গে পরিণত হয়েছিলো।[৭৭]

ইয়ামানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সুগন্ধ দ্রব্যসমূহ এবং ফুল ও ফলের বৃক্ষাদির আধিক্য, মাআরিবের বাঁধের ফলে সেগুলোতে ব্যাপক বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের ফলে সোনা, রুপা ও মণি-মুক্তার আধিক্য সাবা জাতির জন্য সচ্ছলতা, ভোগ-বিলাস, নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। ফলে তারা সবসময় আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ভোগ করতো এবং দিন-রাত স্বস্তি ও সুখের সঙ্গে জীবনযাপন করতো।

আর দেশের বসন্তময়তা ও পুষ্পময়তার ফলে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশে চমৎকার সামঞ্জস্য বিরাজমান ছিলো। এ-কারণে সাবার অধিবাসীরা মশা, মাছি, ছারপোকা ইত্যাদি কষ্টদায়ক কীটপতঙ্গ থেকে নিরাপদ ছিলো। সাবার সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ সাবার অধিবাসীদের এই ঈর্ষাজনক জীবনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ।

খ্রিস্টপূর্ব ১৯৪ সালে Erotoothens লিখেছেন—

আরবের শেষ সীমান্তে সাগরের (ভারত মহাসাগর ও আরব মহাসাগরের) তীরে সাবা জাতির বসবাস; মাআরিব তাদের রাজধানী। এই ভূখণ্ডটি মিসর রাজ্যে পড়েছে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় এবং নদী-নালা প্রবাহিত হয়। সেগুলো মাঠে ও পুকুরে গিয়ে শুকিয়ে যায়। এ-কারণেই ভূমি এত শ্যামল ও উর্বর যে, ওখানে বছরে দুইবার শস্যবীজ বোনা হয়ে থাকে। হাযরামাউত থেকে সাবা রাজ্য ৪০ দিনের পথ। আর মাঈন থেকে

[৭৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯।

বণিকেরা ৭০ দিনে আইলায় (আকাবায়) পৌঁছে থাকে। হাযরামাউত, মাঈন ও সাবার এলাকাগুলো আনন্দ ও উল্লাসে পূর্ণ এবং উপাসনাগৃহ ও রাজপ্রাসাদে সজ্জিত।"

খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫ সালে গ্রিক ইতিহাসবিদ Agathershidos লিখেছেন—

"সাবা জাতি আরব আবাদান অঞ্চলে বসবাস করে। ওখানে বেশ ভালো ভালো বিপুল পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের সংলগ্ন ভূমিতে বলসান[৭৮] বৃক্ষ ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ জন্মে। যা দেখে খুব সুখ লাগে। রাজ্যের ভেতরের অংশে আছে দুগন্ধি-দ্রব্য, দারুচিনি এবং খেজুরের খুব লম্বা লম্বা গাছের ঘন উদ্যান। এসব বৃক্ষ থেকে চমৎকার মিষ্টি ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে। বৃক্ষরাজির প্রজাতি ও প্রকরণ এত বেশি যে, প্রত্যেক জাতের গাছের নাম ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা মুশকিল। এসব বৃক্ষ থেকে যে-সুঘ্রাণ ছড়ায় তা জান্নাতের সুঘ্রাণ থেকে কম নয়। ভাষায় তার পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। যেসকল লোক মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে সাগরের তীর ধরে চলাচল করে, তারাও যখন তীরের দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় ওই সুঘ্রাণ অনুভব করে। সাবা জাতি যেনো আবে হায়াতের সুখ যাপন করছে। আমার এই উপমাও তাদের শক্তি ও সুখের তুলনায় অসম্পূর্ণ।"

এই ইতিহাসবিদই অন্য এক জায়গায় লিখেছেন—

"সাবায় আছে গোটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধানাঢ্য ব্যক্তি। চারদিক থেকে অধিক হারে সোনা ও রুপা সংগ্রহ করা হয়। দূরত্বের ফলে কেউ-ই এই রাজ্যটি জয় করে নি। এ-কারণে বিশেষ করে তাদের রাজধানীতে সোনা ও রুপার তৈজসপত্র ব্যবহৃত হয়। সিংহাসন ও রাজদরবারের স্তম্ভগুলো সোনা ও রুপার কারুকার্যখচিত। প্রাসাদ ও তার দরজাসমূহ সোনা ও মূল্যবান মণিমুক্তার কারুকৃতিতে শোভিত। এ-ধরনের শিল্পকর্ম ও সাজসজ্জায় তারা অত্যন্ত কলাকৌশল ও শ্রম ব্যয় করে থাকে।"

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও আফসুস শহরের অধিবাসী দার্শনিক Artimidor খ্রিস্টপূর্ব ১০০ সালে লিখেছেন—

"সাবার বাদশাহর ও তার রাজদরবার মাআরিবে অবস্থিত। তা বৃক্ষরাশিপূর্ণ পাহাড়ের ওপর আমোদ-প্রমোদপূর্ণ পরিবেশে বিদ্যমান।

---

[৭৮] মিসরে উৎপন্ন এক প্রকার গাছ। এর পাতা থেকে তেল নিষ্কাষণ করা হয়।

ফলমূলের প্রাচুর্যের ফলে ওখানকার মানুষেরা অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। সুগন্ধি গাছসমূহ শেকড়ে জড়িয়ে পড়ে আছে। তারা জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে দারুচিনি গাছ ও সুগন্ধ কাঠ পুড়িয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক মানুষ আছে যারা কৃষিজীবী। কিছু মানুষ দেশি ও বিদেশি মসলার ব্যবসা করে। সাগরের অপর তীরের হাবশার (আবিসিনিয়ার) বন্দর থেকে মসলাদি আনা হয়। চামড়ার তৈরি নৌকায় আরোহণ করে সাবার মানুষেরা সাগরের অপর তীরে যাতায়াত করে। নিকটবর্তী ও প্রতিবেশী গোত্রগুলো সাবা থেকে ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় করে এবং তাদের প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রি করে। এভাবেই এসব পণ্য হাতে-হাতে শাম (সিরিয়া) ও জাযিরাতুল আরব পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"

ডানে ও বামে দুটি উদ্যান

মোটকথা, ইয়ামানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও—যা ওই রাজ্যের শ্যামলতা ও মনোরম আবহাওয়ার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উপকরণের আকৃতিতে উপস্থিত ছিলো—রাজ্যের ভেতরে পানির ওই বাঁধ সুখশান্তিময় ও আমোদপ্রমোদপূর্ণ জীবনযাপনের যাবতীয় সরঞ্জামের সমাবেশ ঘটিয়েছিলো। তা ছাড়া আরো একটি বিষয় অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছিলো। ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত বিখ্যাত বাণিজ্যিক সড়ক 'ইমামুম্ মুবিন'-এর উপর দিয়ে সাবার অধিবাসীদের ব্যবসায়িক কাফেলা যাতায়াত করতো। এই সড়কের দুই পাশে সারি সারি বলসান ও দারুচিনির সুগন্ধি গাছ ছিলো। সাবা রাজ্যের সরকার কিছুটা ব্যবধান রেখে রেখে ভ্রমণকারীদের ভ্রমণকে আরামদায়ক করার জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেছিলো। এই ব্যবস্থা তাদেরকে আরামের সঙ্গে শাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতো। শীতল জল ও ফলমূলের প্রাচুর্যে তারা অনুভবই করতে পারতো না যে, তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরে আছে না-কি কষ্টদায়ক সফরের মধ্যে আছে। সাবার কাফেলাগুলো যখন ঠাণ্ডা ছায়ায় ও আনন্দদায়ক বাতাসে তাদের সরাইখানায় অবস্থান করতো, তাজা ফলমূল খেতো, শীতল ও মিঠা পানি পান করতে করতে শামের পথে যাতায়াত করতো, প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলো ঈর্ষা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাতো এবং বিস্ময়বোধ করতো। এইমাত্র আপনারা সমসাময়িক

ইতিহাসবিদদের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছেন, কী ভাষায় তাঁরা সাবার সচ্ছল ও শান্তিময় জীবনের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সুখ ও শান্তিময় জীবন সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠের পর এখান আমাদের কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ পাঠ করা উচিত। আয়াতগুলো সাবার সচ্ছল অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তার অধিবাসীদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিরাট দয়া ও অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করছে।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (سورة سبأ)

“সাবার[৭৯] অধিবাসীদের জন্য তো তাদের বাসভূমিতে ছিলো নিদর্শন : দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বামদিকে। (তাদেরকে বলা হয়েছিলো, হে সাবার অধিবাসীরা,) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযিক ভোগ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। উত্তম নগরী ও ক্ষমাশীল প্রতিপালক।” [সুরা সাবা : আয়াত ১৫]

ইতোপূর্বে বর্ণিত ইতিহাসবিদদের প্রদত্ত বিবরণ আরো একবার পাঠ করুন। কেবল মুসলমান ইতিহাসবিদদের বর্ণনাসমূহের আলোকেই নয়, বরং যেসব অমুসলিম ইতিহাসবিদ প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন, তাঁদের সমকালীন সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকেও পাঠ করুন। তারপর কুরআন মাজিদের উপরিউক্ত আয়াতগুলো পাঠ করুন। কুরআন মাজিদ বলছে, সাবা জাতির নিজেদের আবাসস্থলেই আল্লাহর নজিরবিহীন, আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো। নিদর্শনরূপে তাদের শহরের ডানে ও বামে শত শত মাইল জুড়ে ফলমূল, সুগন্ধি দ্রব্যের বৃক্ষরাশির ঘন সারি সারি বাগান ছিলো। এগুলো ছিলো আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত রিযিক; আশপাশের জাতিগুলোর মোকাবিলায় সাবা জাতিকে এগুলো দেয়া হয়েছিলো দুইভাবে : একটি হলো ওই রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—আল্লাহ তাআলার ফিতরত বা প্রাকৃতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহাওয়া, শীতল জল, উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি

---

[৭৯] ইয়ামান ও হাযরামাউত ও আসির এলাকা নিয়ে সাবা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আবদুশ্ শাম্‌স সাবা তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

দ্রব্যসমূহের বৃক্ষরাশির স্বাভাবিক বৃদ্ধির আকারে তা প্রকাশ পেয়েছিলো; আর দ্বিতীয়টি হলো পানি পৌঁছানোর উত্তম পন্থা ও ব্যবস্থা, যা প্রকৃতপক্ষে ছিলো বিশ্বস্রষ্টার প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধার ফসল। সুতরাং, সাবার অধিবাসীদের কর্তব্য ছিলো তারা নিজেদের আবাসভূমিতেই বিনা পরিশ্রমে যে-সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ও বিলাসপূর্ণ জীবনব্যবস্থা লাভ করেছিলো তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। যদি তারা এসব নেয়ামতের শোকর আদায় করতো এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করতো তবে নিঃসন্দেহে তাদের মনে অবশ্যই এই চিন্তা জাগতো যে, একদিকে তারা পার্থিব জীবনযাপনের জন্য উত্তম উপকরণমণ্ডিত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবাসভূমি লাভ করেছে আর অপরদিকে তাদের অন্তহীন জীবন ও আখেরাতে মুক্তির জন্য তাদের প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

সাবার অধিবাসী এবং আল্লাহর নাফরমানি

সাবার অধিবাসীরা এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্থিব স্বর্গকে আল্লাহ তাআলার মহান নিদর্শন ও নেয়ামত মনে করতো। তারা ইসলামের বলয়ের ভেতরে থেকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম সম্পাদন করাকে তাদের অবশ্য কর্তব্য বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সম্পদ ও ঐশ্বর্য, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন এবং সব ধরনের নেয়ামত তাদের মধ্যেও খারাপ স্বভাব ও চরিত্র সৃষ্টি করে দিলো যা তাদের পূর্ববর্তী অহঙ্কারী ও অনাচারী জাতিগুলোর মধ্যে ছিলো। এভাবে তারা নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণে এত বাড় বাড়লো যে, সত্য ধর্মকে ত্যাগ করলো এবং পূর্বের কুফর ও শিরকের জীবন দ্বিতীয়বার অবলম্বন করলো। কিন্তু ক্ষমাশীল প্রতিপালক (رَبٌّ غَفُورٌ) সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে পাকড়াও করলেন না। তাঁর দয়া ও করুণার ব্যাপকতা অবকাশ প্রদানের নীতি অনুযায়ী কাজ করলো। তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসুলগণ তাদেরকে সরল ও সত্য পথের শিক্ষা দিলো। তাঁরা তাদের বললেন, এসব নেয়ামতের অর্থ এই নয় যে, তোমরা ধন-ঐশ্বর্য, আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে মদমত্ত হয়ে উঠবে। তার অর্থ এও নয় যে, তোমরা সৎ স্বভাব ও মহৎ চরিত্র পরিত্যাগ করে খারাপ চরিত্র এবং শিরক ও কুফর অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ ঘোষণা করো। চিন্তা এবং বুঝার চেষ্টা করো যে, এটা মন্দ পথ এবং তার পরিণাম নিকৃষ্ট।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ইবেন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, ওই সময় সাবা জাতির মধ্যে আল্লাহ তাআলার তেরোজন নবী নবুওতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু তারা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করলো না এবং তাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনকে স্থায়ী উত্তরাধিকার মনে করে শিরক ও কুফরের মদমত্ততায় নিমজ্জিত থাকলো।[৮০]

অবশেষে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবং তাদের পরিণতিও তা-ই হলো যা হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তীকালে আল্লাহ তাআলার নাফরমান ও অবাধ্যাচারী সম্প্রদায়গুলোর।

সাইলুল আরিম বা বাঁধভাঙা বন্যা

অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দুই ধরনের শাস্তি আপতিত করলেন। ফলে তাদের স্বর্গসম উদ্যানগুলো বিনষ্ট হয়ে পড়লো এবং সেগুলোর জায়গায় জংলি বরই, কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ ও পিলু গাছ উৎপন্ন হয়ে এই সাক্ষ্য প্রদান করতে ও শিক্ষামূলক কাহিনি শুনাতে লাগলো যে, আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে যারা অবিরাম নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণ করে তাদের শাস্তি এমনই হয়ে থাকে।

প্রথম শাস্তি

পানি সেচের জন্য নির্মিত মাআরিবের বাঁধের জন্য সাবার অধিবাসীদের সীমাহীন গর্ব ছিলো। এই বাঁধের কল্যাণে তাদের রাজধানীর উভয় পাশে তিনশো বর্গমাইলব্যাপী সুন্দর ও শোভিত উদ্যান এবং সজীব-সতেজ-সরস শস্যশ্যামল মাঠ ছিলো। এগুলো থেকে উৎপন্ন ফল ও শস্যে ইয়ামান পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়েছিলো।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এই বাঁধ অকস্মাৎ ভেঙে পড়লো এবং হঠাৎ তার পানি বন্যায় পরিণত হয়ে উপত্যকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। মাআরিব ও আশপাশের ভূভাগকে প্লাবিত করলো। যেসব সুশোভিত ও মনোরম উদ্যান ছিলো সেগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে নষ্ট করে ফেললো। বন্যার পানি

---

[৮০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

ধীরে ধীরে শুকিয়ে এলো। তখন ওই স্বর্গসম উদ্যানগুলোর স্থলে পাহাড়ের দুই পাশের উপত্যকার উভয় পাশে ঝাউ গাছের ঝাড়, জংলি বরইয়ের ঝোঁপ ও সারি সারি পিলু গাছ উৎপন্ন হলো। পিলু গাছের ফল বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে।

সাবার অধিবাসীদের কোনো শক্তি বা প্রতাপ আল্লাহ তাআলার এই শাস্তি কে প্রতিরোধ করতে পারে নি। প্রকৌশল ও জ্যামিতিশাস্ত্রে তারা যে-দক্ষতার পরিচয় দিলো, বাঁধটিকে পুনর্নির্মাণ করতে তা কোনে কাজেই এলো না। আর সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের জন্মভূমি ও পরিচ্ছন্ন উত্তম শহর মাআরিব ত্যাগ করে অন্যকোথাও ছড়িয়ে পড়া ছড়া উপায় থাকলো না।

কুরআন মাজিদ এই শিক্ষামূলক ঘটনাটি বর্ণনা করে উপদেশ গ্রহণকারী চোখ ও জাগ্রত হৃদয়ের মানুষের জন্য নসিহতের সবক শুনিয়েছে—

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ () ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (سورة سبأ)

“পরে তারা (সাবার সম্প্রদায়গুলো) অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের ওপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙা বন্যা[৮১] এবং তাদের উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু বরই গাছ। আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরির জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাউকে এমন শাস্তি দিই না।” [সুরা সাবা : আয়াত ১৬-১৭]

গভীরভাবে চিন্তা করুন : এই বন্যা বাহ্যিক কার্যকারণের কোন্‌টার ফলে ছড়িয়ে পড়লো? এটা কি এ-কারণে যে, মাআরিবের বাঁধটি পুরনো হয়ে পড়েছিলো? না। কারণ, তা-ই যদি হতো, তবে যে-শ্রেণির জ্যামিতিবিদ ও প্রকৌশলী এই বাঁধ নির্মাণ করেছিলো, সাবা রাজ্যে তখনো তাদের অভাব ছিলো না। তা ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তারা বহু বাঁধ নির্মাণ

---

[৮১] সাবার অধিবাসীরা একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করে পানিসেচের ব্যবস্থা করেছিলো। ফলে সারা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। এক সময় এই বাঁধ ভেঙে ঘরবাড়ি ও খেতখামার পানিতে ভেসে যায়।

করাচ্ছিলো। তবে কি তারা বাঁধটির জীর্ণতা ও ভগ্নদশার জন্য এতটুকু ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারতো না যে, যদি বাঁধটি তার স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল শেষে ভেঙে পড়ারই উপক্রম করতো, তবে বাঁধের দুর্বলতা অনুসারে পানির বেগ কমিয়ে দেয়া হতো বা বাঁধের শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হতো, যাতে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে কঠিন বিপদের কারণ হয়ে না পড়ে।

ভেবে দেখুন, কেনো এলো এই বন্যা? এজন্যই কি যে, অচিরকালের মধ্যেই বাঁধটি ভেঙে পড়ে কঠিন বিপদের কারণ হবে জেনেও তারা অলসতা করে ওদিকে ভ্রূক্ষেপই করে নি? ইতিহাসের আলোকে এই বক্তব্যও ভুল। কারণ, সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ যেসব ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ সংগ্রহ করে রেখেছেন তা থেকে জানা যায় যে, সাবার অধিবাসীরা এই বাঁধের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বের জন্য সব ধরনের রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলো এবং এই বাঁধের মাধ্যমে সবসময় সেচকাজ চলছিলো।

প্রকৃত সত্য এই যে, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসসমূহ এই ভয়ঙ্কর ঐতিহাসিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে একেবারেই নীরব। নীরব এ-কারণে যে, সাবা জারি ওপর আরোপিত এই শাস্তি ছিলো ধারণার অতীত এবং তা আকস্মিকভাবে এসেছিলো। ফলে তারা নিজেরাও হতভম্ব ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো। তারা এটা ছাড়া আর কিছু বুঝতেও পারে নি যে, যা-কিছু ঘটেছে কুদরতি হাতের ইঙ্গিতেই ঘটেছে। কারণ, বাঁধের দৃঢ়তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাহ্যিকভাবে কোনোও ত্রুটি ছিলো না। তারপরও অকস্মাৎ বাঁধটি ভেঙে পড়া ও ভীষণ বন্যার আকারে পানি ছড়িয়ে পড়া এবং স্বর্গতুল্য সমস্ত এলাকাটাকে ধ্বংস করে দেয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি ছাড়া আর কী হতে পারে? তারা যখন বৈধ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনকে অন্যায় ভোগমত্ততা ও অসচ্চরিত্রতায় রূপান্তরিত করে দিলো, আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে গর্ব ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নেয়ামত ও অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা করেছে এবং নবী ও রাসুলগণের পৌনঃপুনিক হেদায়েত ও নসিহত সত্ত্বেও কুফর ও শিরকে বাড়াবাড়ি করেছে। সুতরাং, অকস্মাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে না তো কী করবে?

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

"পরে তারা (সাবার সম্প্রদায়গুলো) অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের ওপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙা বন্যা...."

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ

"আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরির জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাউকে এমন শাস্তি দিই না।"

ইবনে জারির, ইবনে কাসির ও অন্য কয়েকজন ইতিহাসবিদ এখানে একটি ইসরাইলি কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কাহিনিটি মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কাহিনিটি হলো এই : আল্লাহ তাআলা যখন মাআরিবের বাঁধটিকে অভিপ্রায় করলেন, বাঁধটির ভিত্তিমূলে বড় বড় ইঁদুর সৃষ্টি করলেন। ইঁদুরগুলো ধীরে ধীরে বাঁধের ভিত্তিমূল ফাঁকা করে দিতে শুরু করে। সাবা সম্প্রদায় তা দেখে ভিত্তিমূলের প্রতিটি স্তম্ভের সঙ্গে বিড়াল বেঁধে দিলো। যাতে বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরেরা পালিয়ে যায় এবং ভিত্তিমূলকে ফাঁকা করতে না পারে।

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. আরো বলেন, তাদের কিতাবসমূহে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ ছিলো যে, মাআরিবের বাঁধটি ইঁদুরের দ্বারা ধ্বংস হবে। ফলে যখন তারা বাঁধের মধ্যে ইঁদুর দেখলো, বিড়াল এনে বেঁধে দিলো। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় বাস্তব রূপ নেয়ার সময় এলে ইঁদুরগুলো এতটা নির্ভীক হয়ে পড়লো যে, বিড়াল দেখে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে তাদের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করলো। ইঁদুরগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই বাঁধের ভিত্তিমূল নড়বড়ে করে দিলো। পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, বাঁধ পানির স্রোতের বেগ সামলাতে পারলো না এবং পানি বন্যার আকারে প্রবাহিত হলো।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী এই রেওয়ায়েতটিকে সূত্রবিহীনভাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ও হযরত কাতাদা রহ.-এর সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছেন।

এই রেওয়ায়েতটি ইসরাইলি গল্প-কাহিনি ও রূপকথার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এটি রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের মৌলনীতি অনুসারে গ্রহণ-অযোগ্য। রেওয়ায়েত হিসেবে প্রমাণ গ্রহণের যোগ্য নয় এ-কারণে যে,

এর কোনো কোনো কোনো পন্থা সনদহীন আর কোনো কোনো পন্থা মুনকাতা (বিচ্ছিন্ন)। আর দেরায়াত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এক-কারণে যে, এই রেওয়ায়েতে বন্যা সম্পর্কে যে-ঘটনার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ, ইঁদুর ও বিড়ালের বিষয়টি, তা কেবল ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহের রেওয়ায়েতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহ কেবল ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকেই পাওয়া যায়। তা ছাড়া মাআরিবের বাঁধটির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে যদি ইঁদুর ও বিড়ালের মধ্যকার যুদ্ধে সামান্যতমও সংযোগ থাকতো, তবে ঘটনাটির এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশটাকে কুরআন মাজিদ কিছুতেই ত্যাগ করতো না। অন্ততপক্ষে কোনো সহিহ হাদিসে তার বিবরণ উল্লেখ করা হতো।

তা ছাড়া সাবা রাজ্যে সুদক্ষ প্রকৌশলীরা ছিলেন। তাঁরা মাআরিব ছাড়াও ইয়ামানের বিভিন্ন অংশে তাঁদের কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দৃঢ় ও শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধি-বিবেক কীভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, তাঁরা যখন জানতে পারলেন ইঁদুরেরা বাঁধের ভিত্তিমূল ফাঁকা করে দিচ্ছে তখন তাঁরা বাঁধের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব সাধনের জন্য প্রকৌশলশাস্ত্র ও নির্মাণশিল্পের দৃঢ়করণের নীতি অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে বাঁধের ভিত্তি স্তম্ভগুলোতে বিড়াল বেঁধে দেয়ার মতো একটি ছেলেখেলানো কাজকে যথেষ্ট মনে করলেন? তা-ও আবার ইঁদুরেরা মুক্ত আর বিড়ালেরা আবদ্ধ। এই বিস্ময়কর রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যবস্থা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই রেওয়ায়েতটির বিপরীতে কুরআন মাজিদের বর্ণনাশৈলী থেকে বুঝা যায় যে, সাবার অধিবাসীদের ওপর সাইলুল আরিমের শাস্তি অকস্মাৎ আপতিত হয়েছিলো। তা মাআরিব ও তার আশপাশের এলাকাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলো যে, মাআরিবের অধিবাসীরা নিজেদের সামলে নেয়ার এবং সামগ্রিক অবস্থার সঠিক অনুমানেরও সুযোগ পায় নি। সুতরাং, যদি ইঁদুর-সম্পর্কিত ঘটনাকে কোনোভাবে মেনেও নেয়া হয়, তবে ঘটনার বাস্তবতা কেবল এতটুকু হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা এক বর্ষার মওসুমে, যখন ইয়ামানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, পানির বাঁধে অসংখ্য বড় বড় ইঁদুর সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ইঁদুরেরা স্বাভাবিকভাবে কয়েকদিনের ভেতরেই বাঁধের ভিত্তিমূল ফাঁকা করে ফেলেছিলো। আর পানির স্রোতের বেগ মুহূর্তের মধ্যে বাঁধটিকে ভেঙে

ফেলে ভীষণ বন্যা ঘটিয়ে দিয়েছিলো। সাবা সম্প্রদায় এই অবস্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে গেলো এবং অকস্মাৎ ঘটনাটি তাঁদের ধন-সম্পদ ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। যদিও কোনো সহিহ রেওয়ায়েতে এই বিবরণের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও অন্য জীবনচরিত রচয়িতাগণ এ-বিষয়ে যেসব রেওয়ায়েত ও কাহিনি বর্ণনা করেছেন, কুরআন মাজিদের পারিপার্শ্বিক বিবরণ ও তার বর্ণনাশৈলী সেগুলোকে অস্বীকার করছে। তাঁরা বর্ণনা করেছেন, আনসার ও ইয়ামানের অন্য কয়েকটি গোত্রের কয়েকজন বুযর্গ ব্যক্তি প্রাচীন কিতাবসমূহ বা গণকদের মাধ্যমে সাইলুল আরিম বা বাঁধ-ভাঙা বন্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছিলেন। তাঁরা ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটার আগেই বিভিন্ন কৌশল ও অজুহাতে ইয়ামান (মাআরিব) ত্যাগ করে ইয়াসরিব, শাম ও ইরাকের মতো জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও অন্যদের বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলোর সারমর্ম এই—

"আমর বিন আমির লাহমি ও অন্য কয়েকটি গোত্রের প্রধান প্রাচীন গ্রন্থ ও গণকদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, মাআরিবের বাঁধ ভেঙে গিয়ে মাআরিবের ওপর ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন। বাঁধটি ভেঙে পড়ার সময় হওয়ার আগেই তার ভিত্তিমূলে অসংখ্য ইঁদুরের সৃষ্টি হবে। ইঁদুরেরা বাঁধের ভিত্তিমূল ফাঁকা করে দেবে। ফলে বাঁধটি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বর্ষার মওসুমে তা ভেঙে গিয়ে শত শত মাইল প্লাবিত করে ফেলবে। মাআরিব ও তার দুই পাশে বহু মাইল পর্যন্ত রাজ্যে এক বিশাল অংশ বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"

বস্তুত আমর বিন আমির লাহমিই প্রথম দেখতে পেলো যে, ইঁদুরেরা বাঁধের ভিত্তিমূল ফাঁকা করে দিচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মাআরিবের ধ্বংসকাল অত্যাসন্ন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললেন যে, তাঁর সম্প্রদায়কে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়ে কোনো কৌশল করে দেশ ত্যাগ করবেন এবং অন্যকোথাও গিয়ে বসবাস করবেন। যাতে তিনি আসন্ন বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, আমরের স্ত্রীও গণক ছিলেন এবং এই ঘটনার সংবাদ আগেই তিনি তাঁর স্বামীকে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁর নিজের দেশ ত্যাগ করে অন্যকোথাও চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু

তাঁকে এমনভাবে যেতে হবে যাতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনোভাবেই তাঁর দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। জেনে গেলে তাঁর কাজে অসুবিধা ঘটবে। ফলে তিনি তাঁর ছোট পুত্রকে নির্জনে ডেকে বুঝালেন যে, আমি বিশেষ প্রয়োজনে এটা কামনা করি যে, আগামী মজলিসে যখন কোনো কাজের ব্যাপারে তোমাকে নির্দেশ দেবো, তুমি তা করতে অস্বীকৃতি জানাবে। তাতে আমি কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে তোমার মুখের ওপর চড় মারবো। তখন তোমারও উচিত হবে আদব ও সম্মানের প্রতি লক্ষ না করে আমার মুখের ওপর প্রতিশোধমূলক একটি চড় বসিয়ে দেয়া। এরপর আমি যা করতে চাচ্ছি তা করতে পারবো।

পুত্র তার পিতার এই অদ্ভুত পরামর্শ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। সে এ-ধরনের বেয়াদবিমূলক কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু তার পিতার অবিরাম পীড়াপীড়ির পর শেষ পর্যন্ত সে ওই কাজ করতে রাজি হলো। পরের দিন জনাকীর্ণ মজলিসে সেই ঘটনাই ঘটলো যা পিতা ও পুত্রের মধ্যে পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়েছিলো।

আমর পুত্রের হাতে চড় খেয়ে অত্যন্ত ক্ষেপে গেলেন। তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, তাঁর বেয়াদপ পুত্রকে হত্যা না করে তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হবেন না। মজলিসে উপস্থিত লোকেরা তার ক্রোধ থামানোর জন্য বেশ চেষ্টা করলো; কিন্তু তিনি তাঁদের কথা শুনলেন না। অবশেষে ছেলের মামা এসে হস্তক্ষেপ করলো এবং আমরকে খুব শাসালো। সে জানিয়ে দিলো যে, তুমি যদি তোমার পুত্রকে (আমার ভাগ্নেকে) হত্যা করো তবে আমরাও তোমাকে হত্যা না করে ছাড়বো না। আমর তাঁর ছেলের মামার কথা শুনে ক্রোধ ও বিরক্তির সঙ্গে মজলিসের লোকদেরকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, 'যে-দেশে একজন পিতার পক্ষে তার পুত্রের কঠিন বেয়াদবির শাস্তি প্রদান সম্ভব হয় না, এমন দেশে আমি থাকতে চাই না। আমি আমার সব ভূসম্পত্তি ও উত্তম বাগানগুলো সস্তামূল্যে বিক্রি করে দিতে চাই, যাতে আমি এই দেশ থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বসবাস করতে পারি।' আমরের কথা শুনে লোকেরা তাঁর যাবতীয় জমি-জমা সস্তমূল্যে কিনে নিলো। আমর তাঁর পরিবারসহ দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন। এভাবে আরো কিছু মাআরিবের বাঁধ ভেঙে পড়ার আগেই ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলো।

এই রেওয়ায়েতগুলোর বর্ণনাপদ্ধতিই বলে দিচ্ছে যে, এগুলো কল্পিত কাহিনি; রূপকথা বর্ণনা করার মতো এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। তা ছাড়া নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এসব ঘটনার সমর্থন করে না। উল্লিখিত কাহিনিমূলক রেওয়ায়েতগুলো নির্ভর-অযোগ্য হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, কুরআন মাজিদের ভাষ্য এসব রেওয়ায়েতের বিরুদ্ধে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছে যে, সাবার গোত্র ও বংশগুলোর বিচ্ছিন্ন হওয়া ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো 'সাইলুল আরিম' বা বাঁধ-ভাঙা বন্যা হওয়ার পর, তার আগে নয়।

সুতরাং, মাওলানা হাবিবুর রহমান (মারহুম ও মাগফুর)-এর মতো দূরদর্শী আলেমের জন্য আমাদের বিস্ময়বোধ হয় এ-কারণে যে, তিনি 'ইশাআতে ইসলাম' কিতাবে 'সাবা ও সাইলুল আরিম' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ওইসব কাহিনিকে কোনো বাছ-বিচার না করেই গুরুত্বপূর্ণ রেওয়ায়েতের মতো বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, এই রেওয়ায়েতগুলো সত্য হোক আর মিথ্যা হোক—একটি কথা স্পষ্ট যে, সাবা জাতি তাদের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য, ভোগ ও বিলাস, আলস্য ও গাফলতি, কুফর ও শিরকের ওপর গোঁ ধরে থাকার ফলে এবং নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণের কারণে 'সাইলুল আরিম' বা বাঁধ-ভাঙা বন্যা দ্বারা কঠিনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। তখন তাদের স্থাপত্যকলা, দৃঢ় ও শক্তিশালী অট্টালিকা ও ইমারত নির্মাণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিষ্ফল হয়ে পড়েছিলে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার এই শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারলো না এবং আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ই পূর্ণ হলো।

দ্বিতীয় শাস্তি

মাআরিবের পানির বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে মাআরিব শহর ও তার দুই পাশের এলাকা শস্য-শ্যামল ভূমি, সুগন্ধি দ্রব্যের গাছপালা, উৎকৃষ্ট ফলমূল ও ফলের সজীব বাগান থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো। ওইসব এলাকার লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। কিছু কিছু মানুষ শাম, ইরাক ও হিজাযের দিকে চলে গেলো আর কিছু কিছু মানুষ ইয়ামানের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার শাস্তি পূর্ণ হতে তখনো বাকি ছিলো।

সাবা জাতি কেবল অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য এবং শিরক ও কুফরির মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে অস্বীকার ও অপমান করে নি; বরং ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত আরামদায়ক আবাসস্থল ও বিশ্রামাগার থাকার ফলে ওইসব সফরও তাদের পছন্দনীয় ছিলো না যেসব সফরে তারা যাতায়াতের কষ্ট, পানির কষ্ট ও পানাহারের কষ্ট তারা অনুভব করতো না এবং কদমে কদমে অনেক মাইল পর্যন্ত পথের দুই পাশে সুগন্ধি দ্রব ও ফলমূলের সজীব বাগান থাকার ফলে গ্রীষ্ম ও সূর্যতাপের সঙ্গে তাদের পরিচয় হতো না।

এ-সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে বনি ইসরাইলের মতো নাক কুঁচকে বলতে শুরু করলো, এটা একটা কেমন জীবন যে, মানুষ সফর করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলে এটাও বুঝতে পারে না যে, সে কি সফরে আছে না নিজের বাড়িতেই আছে। ওইসব লোক কত ভাগ্যবান, যারা পুরুষোচিত সংকল্প ও সাহসের সঙ্গে সফরের সব ধরনের কষ্ট বরদাশ্ত করে, পানাহারের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং আরাম ও শান্তি উপকরণ তাদের অধিকারে না থাকার ফলে সফরের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করে। আহ, কতই না ভালো হতো যদি আমাদের সফরও এমন হয়ে যেতো! আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারতাম যে, আমরা নিজেদের বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে কোনো দূর-দূরান্তে সফরে বের হয়েছি এবং আমরা যদি মঞ্জিলের দূরত্বে নানাবিধ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে স্থায়ী বসতবাড়ির সুখ ও সফরের কষ্টের মধ্যে পার্থক্য অনুভূব করতে পারতাম!

কৃতঘ্ন ও হতভাগ্য লোকদের এভাবেই আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছিলো; তারা কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে আল্লাহ তাআলার আযাবকে ডেকে আনছিলো; তারা তার নিকৃষ্ট পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিলো।

এইভাবে সাবা জাতি যখন আল্লাহর তাআলার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার চরম সীমায় পৌঁছে গেলো, আল্লাহ তাদেরকে দ্বিতীয় শাস্তি দিলেন : ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত গোটা জনবসতি বিরানভূমিতে পরিণত করে দিলেন। এখানে ছিলো ছোট ছোট শহর, সবুজ গ্রাম, আনন্দময় সরাইখানা, ব্যবসায়িক বাজার-আকৃতির বসতি, ছিলো তাদের

আরাম ও সুখের সব ধরনের উপকরণ; তারা সফরের সব ধরনের কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে রক্ষিত থাকতো।

সমস্ত এলাকায় ধুলোবালি উড়তে শুরু করলো। ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত আবাদ জনবসতির সারিগুলো বিরানভূমিতে পরিণত হলো।

কুরআন মাজিদের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে উল্লিখিত ঘটনার বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে—

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ () فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

(سورة سبأ)

"তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওইসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং (তাদেরকে বলেছিলাম,) 'তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিবস ও রজনীতে।'[৮২] কিন্তু তারা বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সফরের মনজিলের ব্যবধান বাড়িয়ে দাও।' তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।[৮৩] ফলে আমি তাদেরকে কাহিনির বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সুরা সাবা : আয়াত ১৮-১৯]

ইতিহাসবিদগণ বলেন, সাবা জাতির মোকাবিলায় রোমানদেরও দীর্ঘদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, তারাও হিন্দুস্তান ও আফ্রিকার সঙ্গে আরবদের মতো সরাসরি বাণিজ্য করবে। সবদিক থেকে লাভবান হবে। কিন্তু আরবরা কোনোভাবেই তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছিলো না। তারা সব

---

[৮২] সাবার অধিবাসীরা শাম (বর্তমান সিরিয়া) দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতো। এই দুই দেশের মধ্যবর্তী এলাকায় অনেক জনপদ ছিলো। সাবার বাণিজ্য কাফেলা নির্বিঘ্নে এইসব এলাকায় যাতায়াত করতো।

[৮৩] তারা তাদের ব্যবসা-সংক্রান্ত ভ্রমণ আরো দীর্ঘ করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলো, যাতে তারা আরো অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। তাদের কর্তব্য ছিলো আল্লাহপাক তাদের যা-কিছু দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

বাণিজ্যিক বন্দর ও সড়কগুলো দখল করে রেখেছিলো। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমানরা যথাক্রমে মিসর ও শাম দখল করে নেয়। তখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার সুযোগ পেলো। কিন্তু বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছার জন্য আরবরা যে-মহাসড়ক (إمام مبين) নির্মাণ করে রেখেছিলো তা ছিলো স্থলপথ। ভ্রমণকারীদেরকে এই পথে চলাচলের জন্য আরবদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। আর রোমানরা এসব পার্বত্য পথ অতিক্রম করতে এমনিতেই জটিলতাবোধ করতো। এ-কারণে তারা আরবদের ভয় থেকে নিরাপদ থাকার জন্য হিন্দুস্তান ও আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যের স্থলপথ ত্যাগ করে সামুদ্রিক পথে যাতায়াত শুরু করলো। তারা যাবতীয় বাণিজ্যিক পণ্য নৌযানের সাহায্যে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে মিসর ও আফ্রিকার বন্দরে নামাতে শুরু করলো। পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, বাণিজ্যের এই নতুন পথ ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত সাবার পুরো সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিলো। কিছুদিনের মধ্যে ওখানে ধুলো উড়তে শুরু করলো। সাবার গোত্র ও সম্প্রদায়গুলো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। কেউ কেউ শামের পথ ধরলো, আম্মানের পথ ধরলো কেউ কেউ, কেউ কেউ ইরাকের পথে গমন করলো, কিছু মানুষ যাত্রা করলো হিজাযের পথে এবং নজদে গিয়ে পৌঁছালো কিছু মানুষ। এভাবে সাবা রাজ্যের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হলে পড়লো এবং সাবা একটি কাহিনিতে পরিণত হলো। কুরআন মাজিদের فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ 'ফলে আমি তাদেরকে কাহিনির বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম' বাক্যে তার যথার্থ চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

আপনি যদি ইতিহাসের পাতায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন, তবে একটি বিষয় সত্য হয়ে আপনার সামনে চলে আসবে। তা হলো, সাইলুল আরিম বা বাঁধ-ভাঙা বন্যা এবং বাণিজ্যিক পথের পরিবর্তনের এমন অবস্থা—যার ফলে ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত সাবার গোটা সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়ে পড়েছিলো—যুগের বিবেচনায় শাস্তি দুটির একটি অপরটি থেকে বেশি দূরে নয় এবং উভয় প্রকারের শাস্তির একটির সঙ্গে অপরটি সম্পর্কযুক্ত।

কুরআন মাজিদ যখন আরবের অধিবাসীদের 'সাবা' ও 'সাইলুল আরিম'-এর ঘটনা শুনালো, ইয়ামানের প্রতিটি ব্যক্তি এই সত্য চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করছিলো। আর সাবার যেসব সম্প্রদায় বাঁধ-ভাঙা বন্যার ফলে হিজায, শাম, ওমান, বাহরাইন ও নজদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তারাও তাদের পূর্বপুরুষদের ওই কেন্দ্রের দুরবস্থা দেখছিলো ও শুনছিলো। এমনকি হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর্যটক ও ইতিহাসবিদ হামদানি রহ. তাঁর রচিত ইকলিল (الإكليل) গ্রন্থে ইয়ামানের এই অংশ সম্পর্কে নিজের চাক্ষুষ প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, কুরআন মাজিদ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ বলে সাবার ডানের ও বামের যে-দুটি বাগানের কথা উল্লেখ করেছে, নিঃসন্দেহে আজ ওই এলাকাতেই বাগানের স্থলে বিপুল পরিমাণে পিলু (বাবলা) গাছ জন্মেছে। এত বেশি বাবলা গাছ আর কোথাও নেই। পিলু গাছের সঙ্গে ঝাউ গাছ এবং কোনো কোনো স্থানে জংলি বরই গাছও দেখা যায়। তত্ত্বদর্শী চোখ ও সত্য শ্রবণকারী কানকে সাবার শিক্ষামূলক কাহিনি শুনাচ্ছে এই বলে—

دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو

میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو

"দেখো, আমাকে দেখো, যদি শিক্ষা গ্রহণকারী চোখ থাকে; শোনো, আমার কাহিনি শোনো, যদি উপদেশ শ্রবণকারী কান থাকে।"

মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি 'আরদুল কুরআন'-এ আবরাহার যুগের আরিমের শিলালিপির উদ্ধৃতি দিয়ে কতই না সুন্দর বলেছেন—

"এই ঐতিহাসিক যুগে, যখন প্রতিটি অসমসাময়িক রেওয়ায়েত সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়, কুরআনুল কারিম তার অলৌকিক কালামের সত্যতার পক্ষে নতুন উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। অর্থাৎ, এই (মাআরিবের) বাঁধের বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বন্যার বিস্তারিত বর্ণনার শিলালিপি—যা জনৈক খ্রিস্টান ইয়ামান-বিজয়ী কর্তৃক লিখিত—পাওয়া গেছে। এই খ্রিস্টান বিজয়ী হলো ওই ব্যক্তি যে হস্তিবাহিনী নিয়ে কা'বাগৃহ ধ্বংস করতে বের হয়েছিলো। কিন্তু আজ কা'বাগৃহের শত্রুর

প্রস্তরের হাত সম্মানিত কা'বার পবিত্র কিতাবের সত্যতা স্বীকারের জন্য উঁচু হয়েছে।"[৮৪]

সাবার যুগে সাইলুল আরিম বা বাঁধ ভেঙে বন্যা হওয়ার ফলে যেসব ঘটনা ঘটেছিলো, এই শিলালিপিতে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

মোটকথা, সাবার এই জাতি, যারা রাজ্যের বিস্তৃতির বিবেচনায় ইয়ামান (দক্ষিণ আরব), শাম ও হিজাযের নতুন বসতিগুলো (উত্তর আরব) এবং হাবশা (আফ্রিকা), ১১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে-পরে শাসন-ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলো এবং গোটা সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। সাবার আকসুমি বংশ হাবশায়, ইসমাইলি আরবেরা উত্তর আরবে এবং সাবার হিমইয়ারি বংশ খোদ ইয়ামানে তাদের তাদের প্রতিষ্ঠিত করলো।[৮৫]

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক যে, সমগ্র ইয়ামানে বাঁধ-ভাঙা বন্যার ঘটনা ঘটে নি; বরং ইয়ামানের রাজধানী মাআরিব এবং তার দুই পাশের শত শত মাইল পর্যন্ত বন্যা ও তার ধ্বংসাত্মক পরিণতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন এ-এলাকায় যেসব গোত্র বসবাস করতো তারাই কেবল দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো। দেশের অবশিষ্ট অংশে কোনো ক্ষতি হয় নি এবং তার অধিবাসীরা ইয়ামানেই বসবাস করছিলো। অবশ্য দ্বিতীয় শাস্তি যখন পূর্ণরূপ পেলো, তার ক্ষতিকর প্রভাব গোটা ইয়ামানকে গ্রাস করলো। ফলে সাবার অবশিষ্ট গোত্রগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে বাধ্য হলো। এভাবে সাবা গোষ্ঠীর শাসনক্ষমতা চিরতরে বিলীন হয়ে গেলো।

ইয়ামানের সব গোত্রের ওপর সাইলুল আরিমের দুর্ঘটনার প্রভাব পড়ে নি এই কথাটি আরব ও অনারব সকল ইতিহাসবিদই স্বীকার করেছেন। যেমন, আল্লামা ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

"সাইলুল আরিমের ঘটনা ঘটলে সাবা জাতির সবগুলো গোত্র ইয়ামান থেকে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে নি; বরং কেবল ওই গোত্রগুলোই ছড়িয়ে পড়েছিলো যারা রাজধানী মাআরিবে বসবাস করতো এবং যাদের

---

[৮৪] আরদুল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮।
[৮৫] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা [সাবা]।

শহরে মাআরিবের প্রসিদ্ধ বাঁধটি ছিলো। আর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর সূত্রে যে-হাদিসটি ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যও এই যে, তাদের মধ্য থেকে চারটি গোত্র শাম দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলো এবং ছয়টি গোত্র ইয়ামানেই থেকে গিয়েছিলো। ইয়ামানে থেকে-যাওয়া গোত্রগুলো ছিলো মায্হাজ, কিন্দাহ, আন্মার ও আশ্আর। আন্মার গোত্রের ছিলো তিনটি শাখা : খাস্আম, বুজাইলাহ ও হিমইয়ার। সাবার এই গোত্রগুলোর মধ্য থেকে সাবা-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ এবং তাদের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর ইয়ামানের শাসকগোষ্ঠী মুলুক ও তুব্বাদের উদ্ভব ঘটে। অবশেষে আবিসিনিয়ার বাদশাহ তাঁদের থেকে ইয়ামান কেড়ে নেন। তারপর হিমইয়ারি বাদশাহ সাইফ বিন যু-ইয়াযান ইয়ামানকে হাবশার বাদশাহর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন। পৃথিবীর বুকে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের কিছুকাল আগে এই ঘটনা ঘটেছিলো। যথাস্থানে আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা করবো।"[৮৬]

আর সাবার যেসব গোত্র ও বংশ ইয়ামান থেকে বের হয়ে এদিক সেদিক গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলো তাদের বিবরণ প্রদান করে আল্লামা ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

"সাবার গোত্রগুলোর মধ্য থেকে গাস্সানি গোত্রের একটি শাখা বস্রায় (শাম) চলে গেলো। আর-একটি শাখা খুযাআ ইয়াসরিবে (মদিনায়) যাওয়ার পথে বাতনে মার্রা (তিহামা)-কে শস্য-শ্যামল দেখে ওখানেই অবস্থান করলো। আর আওস ও খাযরাজ শাখাগোত্র (আনসার) ইয়াসরিবে (মদিনায়) গিয়ে ওখানে বসবাস করতে শুরু করলো। আর বনি আয্দের একটি অংশ আম্মানে গিয়ে এবং অপর অংশ সুরাত উপত্যকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। এভাবে সাবার এই গোত্রগুলো আরবের বিভিন্ন ভূখণ্ড ও শহরে বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো।"

অন্য জায়গায় ইবনে কাসির রহ. লিখেছেন—

"শা'বি বলেন, গাস্সান গোত্র শাম ও ইরাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিলো। আর আনসার (আওস ও খাযরাজ) ইয়াসবির (মদিনায়)

---

[৮৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৫; তারিখে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১।

গিয়ে বসতি স্থাপন করে। খুযাআ গোত্র তিহামায় (মক্কায়) এবং আয্দ গোত্র আম্মানে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করতে লাগলো।"[৮৭]

ইবনে কাসির আরো বলেন—

"আরবে সাবা জাতি ও গোত্রগুলোর এই বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা এতটাই প্রসিদ্ধ এবং শিক্ষামূলক মনে করা হয় যে, যখন আরবের অধিবাসীরা কোনো সম্প্রদায় বা বংশের বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততার আলোচনা করে তখন তারা বলে تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ. 'তাদের অবস্থা সাবার মতো হয়ে গেছে; তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।'"[৮৮]

কয়েকটি ঐতিহাসিক আলোচনা

এক.

জীবনচরিত ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাবা বিন ইয়ারাব মাআরিবের বাঁধটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নির্মাণকাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি; তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিমইয়ার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন।[৮৯]কেউ কেউ বলেন, বাঁধটি নির্মাণ করেছিলেন সাবার রানি বিলকিস।

কিন্তু এই দুটি বক্তব্য বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে; নিছক ধারণা অনুমান থেকে উৎসারিত। কারণ, প্রত্নতত্ত্ববিশেষজ্ঞগণ মাআরিবের বাঁধের ভগ্নাবশেষ থেকে সন্ধান পেয়েছেন যে, এই পানির বাঁধের নির্মাণকারীদের নাম শিলালিপিতে খোদিত আছে এবং শিলালিপিটি বাঁধেরই ভগ্ন প্রাচীরের ওপর সংযুক্ত আছে। এই শিলালিপি প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ সালে প্রথম সি' আমরাবিন বিন সামআহলি নিউফ (মাকারিবে সাবা) মাআরিবের বাঁধটি নির্মাণ করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর শাসনামলে বাঁধটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় নি। তাঁর পরবর্তী বাদশাহগণ নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। এই শিলালিপিতে সি' আমরাবিনের নামা ছাড়া আর যেসব নামের পাঠোদ্ধার করা গেছে তা এই : সামআহলি নিউফ

---

[৮৭] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৯।
[৮৮] তারিখে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭।
[৮৯] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৪।

বিন যামারআলি (মাকারিবে সাবা), কারবআহলেবিন বিন সি' আমর (মাকারিবে সাবা), যামারআলি দারূহ (মুলকে সাবা), ইয়াদাইলওয়াতার। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাঁধটির নির্মাণকাজ মাকারিবে সাবার যুগ থেকে শুরু হয়ে সাবার বাদশাহগণের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে।[৯০]

দুই.

সুনাতুত তিরমিযিতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়েতে একটি হাদিস আছে—

قال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أو امرأة ؟ قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومذحج وأنمار وكندة فقال رجل يا رسول الله وما أنمار ؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة.

“এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসুল, সাবা কী—কোনো এলাকার নাম না-কি কোনো স্ত্রীলোকের নাম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তা কোনো এলাকারও নাম নয়, কোনো স্ত্রীলোকেরও নাম নয়। তার ঔরসে আরবের দশজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে। তাদের ছয়জন ইয়ামানে (ডানদিকে) আর চারজন সিরিয়ায় (বামদিকে) বসতি স্থাপন করে। বামদিকে ব্যক্তিদের নাম হলো লাখাম, জুযাম, গাস্‌সান ও আমিলা (গোত্র)। আর ডানদিকে বসতি স্থাপন করা ব্যক্তিদের (গোত্রগুলোর) নাম হলো আয্‌দ, আশআরি, হিমইয়ার, মাযহিজ, আনমার, কিন্দাহ।’ এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসুল, আনমার সম্প্রদায়ের লোক কারা? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘খাসআম ও বাজিলা গোত্রের লোকেরা তাদের অন্তর্ভুক্ত।’”[৯১]

---

[৯০] আরদুল কুরআন; আযমাও, ফ্রেঞ্চ এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৮৭৪-এর নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

[৯১] সুনানুত তিরমিযি : হাদিস ৩২২২; তাফসিরে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড।

ইমাম তিরমিযি এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, هذا حديث حسن غريب 'এটা হাসান গরিব (দুর্বল) হাদিস।'
আল্লামা ইবনে কাসির হাদিসটির বিভিন্ন সনদ বর্ণনা করে কোনো কোনো সনদকে হাসান কৃবি (শক্তিশালী) বলেছেন।[৯২]
আর ইবনে আবদুল বার আরব জাতির বংশপরিচয় আলোচনা করতে গিয়ে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করার পর একটি মীমাংসা টেনেছেন। তিনি বলেছেন—

هذا أولى ما قيل به في ذلك، والله أعلم.

"এই রেওয়ায়েতটি ওইসব বক্তব্য থেকে উত্তম যেগুলোকে এ-ব্যাপারে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে।"[৯৩]
উল্লিখিত হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আলোচিত গোত্রগুলো কাহতান বংশীয়। তবে প্রকাশ থাকে যে, এদের মধ্যে অনেক গোত্রের ব্যাপারে বংশবিদ্যাজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে তারা আদনানি না-কি কাহতানি। তারপরও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনসার (সাহায্যকারিগণ) আওস ও খাযরাজ—যারা সন্দেহাতীতভাবে বনি আয্দ—সম্পর্কে বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত যে, তাঁরা নিঃসন্দেহে কাহতান বংশীয়।[৯৪]
আর আরদুল কুরআনের রচয়িতা (সাইয়িদ সুলাইমান নদবি) সহিহুল বুখারির যে-হাদিস দ্বারা আনসার (আওস ও খাযরাজ)-কে আদনান বংশীয় প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, ইবনে হাজার আসকালানির অভিমতে হাদিসটি কিছুতেই তার প্রমাণ হতে পারে না। ইতোপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি। তা ছাড়া আমরা (আওস ও খাযরাজ গোত্রের) কোনো আনসারি বংশপরিচয়-বিশেষজ্ঞ থেকে এমনকোনো বক্তব্য পাই নি যাতে তিনি নিজেকে কাহতান বংশোদ্ভূত বলে স্বীকার করেন নি। অবশ্য এটা সম্ভব যে, যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[৯২] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ১০৪।
[৯৩] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ১০৬।
[৯৪] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

আদনানি ইসমাইলি বংশোদ্ভূত, তাই কোনো কোনো আনসার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রেরণায় নিজেকে মায়ের দিক থেকে আদনানি ইসমাইলি বলে থাকতে পারেন।

এটা নিঃসন্দেহে সঠিক যে, কোনো কোনো আদনানি গোত্র ইয়ামানে বসতি স্থাপন করেছিলো। ফলে কাহতানি ও আদনানি গোত্রগুলোর বংশপরিচয়জ্ঞানী আলেমগণের কারো কারো মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। আর খোযাআ গোত্রের কাহতানি থেকে আদনানি হয়ে যাওয়ার বিচিত্র কাহিনি তো ইবনে আবদুল বার এবং স্বয়ং আরবের কবিগণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কেমন করে তারা তাদের ভাগ্নে খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মুআবিয়ার ওই বিতর্কে—যা তার ও বনি উমাইয়ার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো—খালিদের কথায় প্রথমে নিজেদের ইয়ামানি গোত্রের মিত্র বানিয়েছিলো, তারপর ইয়ামানি বংশোদ্ভূত (কাহতানি বংশোদ্ভূত হওয়ার) দাবি করে বসলো।[১৫]

তিন.

কুরআন মাজিদের সুরা সাবায় সাবার ধর্মীয় ব্যাপারে যেভাবে আলোকপাত করা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, সাবার প্রথম স্তরেরাখা দুটির ধর্ম ছিলো হয়তো সূর্যপূজা (নক্ষত্রপূজা) অথবা সত্য ইহুদি ধর্ম (হযরত মুসা আ.-এর দীন)। আর দ্বিতীয় স্তরের শাখা দুটির মধ্যে মূর্তিপূজা ছিলো জাতীয় ধর্ম, আবার কখনো কখনো তাদের মধ্যে ইসায়ি (ইহুদি) ধর্মও দেখা যেতো। কুরআন মাজিদ আসহাবুল উখদুদের যে-ঘটনা বর্ণনা করেছে তা থেকেও এটা বুঝা যায়। কারণ, যুনাওয়াস হিমইয়ারি ইয়ামানেরই বাদশাহ ছিলেন।

চার.

আরবের অধিবাসীদের মত এই যে, আরবের যাবতীয় গোত্র মাত্র দুই ব্যক্তির বংশধর—আদনান ও কাহতান। কিন্তু তা সত্য নয়। কেননা, তাওরাত এবং ইতিহাস এই দুটি বংশ ছাড়া অন্য বংশের কথাও বর্ণনা

---

[১৫] الإنباه على قبائل الرواة, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ২০-৫৯।

করেছে। কোনো কোনো সহিহ রেওয়ায়েতে বনি জুরহামের উল্লেখ রয়েছে। আর বনি জুরহাম কাহতানি ও আদনানি বংশ থেকে ভিন্ন তৃতীয় একটি বংশ। তা হলে, বংশবিদ্যাজ্ঞানীরা যে দাবি করছেন আরবে এই দুটি বংশ ছাড়া অন্য সব বংশ বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে এবং আরবের যাবতীয় বংশ এই দুটি বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, এ-ব্যাপারে তাঁদের কাছে কী প্রমাণ আছে?

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি দুর্বল রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা., আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., আমর বিন মাইমুন রা. এবং মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরাযি রা. থেকে শক্তিশালী রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ 'তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসে নি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নুহের সম্প্রদায়ের, আদের ও সামুদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না'[৯৬] আয়াতটি পাঠ করতেন, বলতেন, كذب النسابون 'বংশপরিচয় বর্ণনাকারীরা মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ তারা মধ্যস্থলে অনেকগুলো মিথ্যা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে আবদুল বার বংশপরিচয়বিদ্যাকে কল্যাণকর জ্ঞান সাব্যস্ত করেছেন। এই রেওয়ায়েতটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, হতে পারে যে, তাঁদের এই বক্তব্য কুরাইশের বংশপরিচয়ের ব্যাপারে নির্দিষ্ট এবং সম্ভবত তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, আদনান থেকে হযরত ইসমাইল আ. পর্যন্ত কুরাইশের যে-বংশপরম্পরা রয়েছে তা সঠিক নয় এবং তাতে বংশপরিচয়জ্ঞানীদের মিথ্যা মিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে উল্লিখিত বাক্যটি যথার্থ উদ্দেশ্য এই যে, বংশপরিচয়জ্ঞানীদের এই দাবি—'আমরা বনি আদমের বংশপরম্পরা সম্পর্কে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ এবং কোনো বংশধারাই আামদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি বাইরে নয়'—সত্য নয়; এই

দাবিতে তারা মিথ্যাবাদী। لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ-ই এমন দাবি করতে পারেন না।[৯৭]

আমরা ইবনে আবদুল বারের এই ব্যাখ্যাকে অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করি এবং বলি, আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে এমন বংশধারা আছে যা আদনানি ও কাহতানি বংশধারা থেকে পৃথক এবং অধিকাংশ বংশপরিচয়জ্ঞানীই তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অপারগ থেকেছেন। আল্লামা ইবনে কাসিরের বরাত দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্যকে প্রমাণিত করেছি।

কয়েকটি তাফসিরি আলোচনা

এক.

কুরআন মাজিদে সাইলুল আরিম (سيل العرم) কথাটি বলা হয়েছে। মুফাস্‌সিরগণ আরিম শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং শব্দটির কয়েকটি অর্থ বলেছেন : গভীর পানি, উপত্যকা, মহাপ্লাবন, ও পানির বাঁধ। হযরত শাহ আবদুল কাদির (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) সাইলুল আরিম বলতে মহাপ্লাবন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তারপর আমি পাঠালাম তাদের ওপর মহাপ্লাবন।' আর 'আরদুল কুরআন' রচয়িতা বলেন, হিজাযের আরবগণ যেটাকে 'সাদ্দ' (প্রাচীর) বলেন, ইয়ামানের আরবগণ সেটাকেই 'আরিম' বলেন। আমাদের মতে এই অর্থটি অধিক বিশুদ্ধ ও স্থানোচিত। আর আরবি অভিধানে 'আরিমাহ' (عرمة) শব্দের অর্থ পানির বাঁধও হয়। সুতরাং, অন্যান্য অর্থের প্রতি মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। অভিধানে আছে, العرمة سد يتعرض به الوادى 'উপত্যকার মুখের বাঁধ হলো আরিমাহ'। এই অর্থটি মনমতো ও অবস্থার অনুরূপ হওয়ার কারণ এই যে, এই অর্থ গ্রহণ করলে কুরআন মাজিদে পানির বাঁধটির উল্লেখ প্রমাণিত হয়। আর অন্যান্য অর্থ গ্রহণ করলে তাদের থেকে কেবল এতটুকু বুঝা যায় যে, প্লাবন এসে কোনো একটি পানির বাঁধকে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। পরিষ্কারভাবে সাবার পানির বাঁধটির কথা প্রমাণিত হয় না।

---

[৯৭] القصد و الأمم, ইবনে আবদুল বার, পৃষ্ঠা ১৯।

দুই.

কোনো ভূখণ্ডে ফলমূলের বাগানের আধিক্য ওই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সুখী ও আনন্দময় জীবনের প্রমাণ। কিন্তু পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, ইয়ামানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলি, পানির বাঁধের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর নির্মাণকলা, মাআরিবের ডানে ও বামে শত শত মাইলজুড়ে নানা জাতীয় ফলমূল ও ফুলের অসংখ্য বাগান যে-অলৌকিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো, তার ব্যাপারে অমুসলিম ইতিহাসবিদদের সাক্ষ্য-প্রমাণও বলছে যে, মাআরিব ও ইয়ামানের এই অঞ্চলটি পৃথিবীতে স্বর্গের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলো। তাদের দেশের এই অলৌকিক অবস্থা আল্লাহ তাআলারই বিশেষ দান; এ-কারণে কুরআন মাজিদ এটিকে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন বলেছে—

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

"সাবার অধিবাসীদের জন্য তো তাদের বাসভূমিতে ছিলো নিদর্শন : দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বামদিকে।"

তিন.

এই আয়াতগুলোতে আছে بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 'উত্তম শহর ও মার্জনাকারী প্রতিপালক' এবং তারপর আছে فَأَعْرَضُوا 'তারা আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে'।

এই দুটি বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, সাবা জাতি প্রথমে মুসলমান ছিলো। তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধের অনুগত ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা অবাধ্যাচরণ এবং কুফর ও শিরকে ডুবে গেলো। তা ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا 'তাদের কুফরির কারণে আমি তাদেরকে এমন প্রতিদান (শাস্তি) দিয়েছিলাম' আয়াত থেকেও প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাদের মধ্যে ইসলাম ও কুফরের দুটি কাল কখন অতিবাহিত হয়েছিলো? তা হলে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোকে এই আয়াতগুলোর তাফসির করা যেতে পারে।

প্রশ্নটির জবাব এই যে, কুরআন মাজিদ সুরা সাবার পূর্বে সুরা নামলে সাবার রানি বিলকিস ও হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘটনাবলিতে বর্ণনা

করেছে যে, সাবার রানি ও তাঁর সম্প্রদায় শুরুতে সূর্যপূজারী ও মুশরিক ছিলো। পরে সুলাইমান আ.-এর দাওয়াত ও সত্যপথ-প্রদর্শনের ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের পরও রানি বিলকিস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং গোটা সম্প্রদায় তাঁর অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিলো। যে-সকল মনীষী ওই যুগের জাতি ও সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন তাঁরা জানেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর রানি বিলকিসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা এ-বিষয়ের উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দলিল যে, রানির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ও ঈমান গ্রহণ করেছিলো।

আপনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র চিঠিগুলো পাঠ করুন। তিনি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিশ্বের সম্রাট ও বাদশাহদের নামে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলেন।

রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো চিঠি—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُولِه إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ.

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নামে। তার ওপর শান্তি নেমে আসুক যে সত্যের অনুসারী। পর সমাচার, আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই। ইসলাম গ্রহণ করো, (সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে) নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাকে সমগ্র প্রজার পাপ বহন করতে হবে।

কিবতের (মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার) বাদশাহর নামে পাঠানো চিঠি—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ مُحَمَّدٍ عبدِ اللّٰهِ ورسُولِه، إلى المُقَوقِسِ عظِيمِ القِبْطِ، سَلَامٌ على من اتَّبَعَ الهُدى، أما بَعْدُ: فإنّي أدْعُوكَ بدِعَايَةِ الإسْلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فإنْ تَوَلَّيْتَ، فإنَّ عَلَيْكَ إثْمَ القِبْطِ.

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে কিবতের (মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার) বাদশাহর নামে। সালাম তার প্রতি যে সত্যের অনুসারী। পর সমাচার, আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই। ইসলাম গ্রহণ করো, (সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে) নিরাপদ থাকবে। তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাকে সমগ্র কিবতের পাপ বহন করতে হবে।

পারস্য-সম্রাট কিসরার (খসরু পারভেজের) কাছে প্রেরিত চিঠি—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ مُحمَّد رَسُول الله، إلى كِسْرَى عَظِيم فَارِسٍ، سَلامٌ عَلَى مَن اتَّبعَ الهُدَى وآمَنَ بالله وَرَسُوله، وشَهِدَ أنْ لاَ إله إلاَّ الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُولُهُ، أدْعُوكَ بِدعَايَة الله، فإنِّي أنا رَسُولُ الله إلى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً ويَحِقَّ القَوْلُ عَلى الكَافِرِينَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إثْمُ المَجُوسِ.

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে প্রারস্য সম্রাট কিসরার (খসরু পারভেজের) নামে। সালাম তার ওপর যে সত্যের অনুসারী; এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও আল্লাহর রাসুল। আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাই। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রাসুল, যারা জীবিত আছে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য। কাফেরদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করো, (সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে) নিরাপদ থাকবে। আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাকে অগ্নিপূজক জাতির পাপ বহন করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কথা কেনো বলেছেন? বলেছেন এ-কারণে যে, প্রাচীন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক রাজ্যশাসনের ইতিহাস

বলছে যে, তাঁদের জাতীয় রাজ্যে বাদশাহর ধর্ম যা হতো, সেটাই হতো গোটা জাতির ধর্ম। কোনো কোনো সম্প্রদায়ে বাদশাহকে আল্লাহর অবতার বা প্রকাশস্থল মনে করা হতো। তাই বাদশাহ কর্তৃক কোনো বিষয়কে গ্রহণ করা যেনো প্রজাসাধারণের জন্য আল্লাহর নির্দেশের সমান ছিলো।

যাইহোক। খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০ সালে সাবা জাতি হযরত সুলাইমান আ.-এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তারা আল্লাহর এই আমানতকে বুকে আগলে রেখেছিলো। কিন্তু অতীতের জাতিগুলোর মতো ধীরে ধীরে তারা ওই আমানত থেকে বিমুখ হতে শুরু করলো। তারা সত্যধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় শিরক ও কুফরে ফিরে গেলো। তখন আল্লাহপাকের নবী ও রাসুলগণ তাঁদের নির্ধারিত সময়ে এসে তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন ও সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন। খুব সম্ভব এঁরা হলেন বনি ইসরাইলের নবী। তাঁরা নিজেরা বা তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে সাবা জাতিকে সত্যের পথে আহ্বান জানাতে লাগলেন। কিন্তু সাবা জাতি ভোগ-বিলাস, সম্পদ ও ঐশ্বর্য এবং রাজ্য ও প্রতাপের মোহে মত্ত থেকে নবীদের আহ্বানের কোনো পরোয়াই করলো না। বনি ইসরাইলের মতো তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অবমাননা করতে শুরু করলো। ফলে হযরত ইসা আ.-এর জন্মের এক শতাব্দী পূর্বে সাইলুল আরিম বা বাঁধভাঙা বন্যা এবং বসতিগুলোকে ধ্বংস করার আযাব এলো এবং তা সাবা জাতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলো।

গ্রিক ইতিহাসবিদ থিউফরিসতিসনাস হযরত ইসা আ.-এর জন্মের তিনশো বারো বছর পূর্বে সাবা জাতির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

"এই বক্তব্য সাবা রাজ্য-সম্পর্কিত : সুগন্ধি দ্রব্যকে তারা ভালোভাবে সংরক্ষণ করে থাকে। তারা সূর্যের উপাসনালয়ে সুগন্ধি দ্রব্যের স্তূপ এনে জমা করে। সূর্যের উপসনালয়কে এই রাজ্যে খুব পবিত্র মনে করা হয়।"[৯৮]

---

[৯৮] আরদুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩, হিরানের হিনারিক্যাল রিসার্চ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩ থেকে উদ্ধৃত।

প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ কয়েকজন মুসলিম মনীষী দ্বিতীয় বা তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে ইয়ামানের একটি শিলালিপিতে পাঠ করেছিলেন—

هذا ما بنى شمر يرعش سيدة الشمس.

"এটি বাদশাহ শামার ইয়ারআশ সূর্যদেবীর উদ্দেশে নির্মাণ করেছিলেন।"

চার.

সুরা সাবার এই আয়াতগুলোর মধ্যেই আছে—

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً

"তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম।" [আয়াত ১৮]

মুফাস্‌সিরিনে কেরাম এই বরকতময় জনপদগুলোর ব্যাখ্যা ও নির্ধারণে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো এই : বরকতময় জনপদ বলে শামে (সিরিয়ার) জনপদগুলো উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, কুরআন এ-ব্যাপারে যা-কিছু বলেছে তার শামের জনপদগুলোর ব্যাপারেই প্রযোজ্য হয়। এই জনপদগুলো ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত বাণিজ্য-সড়কের দুই পাশে অবস্থিত ছিলো। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা, সাঈদ বিন জুবায়ের, ইবনে যায়দ (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ এই তাফসিরই করেছেন—

يعني: قرى الشام. يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة.

"বরকতপূর্ণ জনপদ বলতে শামের জনপদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ইয়ামানের অধিবাসীরা ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত এসব উন্মুক্ত ও পাশাপাশি অবস্থিত জনপদের মধ্য দিয়ে (নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে) যাতায়াত করতো। (যাতে তারে সফর সহজ ও আনন্দময় হয়।)"[৯৯]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. قرى ظاهرة শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন—

أي: بينة واضحة، يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة، ويبيتون في أخرى.

[৯৯] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা সাবা।

"অর্থাৎ, জনপদগুলো ছিলো উন্মুক্ত ও প্রকাশ্য। মুসাফির ও অভিযাত্রীরা জনপদগুলোকে ভালোভাবেই চিনতেন। তাঁরা একটি জনপদে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করতেন এবং অপর একটি জনপদে গিয়ে রাত্রি যাপন করতেন। (জনপদগুলো ছিলো কাছাকাছি, যেনো সেগুলো মুসাফির, বণিক ও পর্যটকদের জন্যই নির্মিত হয়েছিলো।)"[১০০]

পাঁচ.

মুফাস্সিরিনে কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) সুরা সাবার এই আয়াতগুলোর তাফসির করতে গিয়ে সাইলুল আরিম (বাঁধ-ভাঙা বন্যা) এবং قرى ظاهرة অর্থাৎ, ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত বিস্তৃত সাবার জনপদগুলোর বিনাশ— দুটি বিষয়েরই উল্লেখ করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁদের দৃষ্টি ইতিহাসের অন্য একটি বিষয়ে নিবদ্ধ হয় নি। অর্থাৎ, রোমানদের বাণিজ্যিক পথ পরিবর্তন করে ফেলার ফলে সাবা দুরবস্থায় পতিত হয় এবং স্বয়ং সাবা জাতির প্রার্থনা رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সফরের মনজিলের ব্যবধান বাড়িয়ে দাও'-এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন, যেনো তারা আরবের অন্যান্য গোত্রের মতো জীবিকা অন্বেষণের জন্য সফরের সব ধরনের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। এই প্রার্থনার কারণে আল্লাহ তাদেরকে শিক্ষামূলক কাহিনিতে পরিণত করলেন এবং তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

আমরা ইতোপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, বাণিজ্যিক স্থলপথকে জলপথে রূপান্তরিত করার ফলে সাবার সাম্রাজ্য খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো এবং সাবার এই রাজবংশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়েছিলো। সাইলুল আরিম বা বাঁধ-ভাঙা বন্যার সময়ই এই ব্যাপারগুলো ঘটেছিলো। হয়তো তার অনেক আগেই রোমানদের হাতে বাণিজ্যিক পথ পরিবর্তনের পরিকল্পনা সূচিত হয়েছিলো।

সুতরাং, মুফাস্সিরগণ যদিও قرى ظاهرة বা ইয়ামান থেকে শাম (সিরিয়া)-অভিমুখী বাণিজ্যিক সড়কটির দুইপাশে জনপদগুলোর ধ্বংসের

---

[১০০] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা সাবা।

কার্যকারণ হিসেবে বাণিজ্যিক পথ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন না, তবে তারা স্বীকার করেন যে, সাইলুল আরিম বা বাঁধ-ভাঙা বন্যা এবং ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত সাবা সাম্রাজ্যের বিনাশ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ, ব্যাপারটি এমন নয় যে, পানির বাঁধ ভেঙে যাওয়া ফলে সাবা সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটেছে। ইতোপূর্বে আমরা আল্লামা ইবনে কাসির রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছি যে, সাইলুল আরিমের পরও মাআরিব (শহর) ছাড়া ইয়ামানের অন্যান্য অঞ্চলে ইয়ামানি সম্প্রদায়গুলো বসবাস করতো। সুতরাং, কুরআন মাজিদের ফয়সালা মুফাস্‌সিরগণের বিরক্তির কারণ নয়, যেমন আরদুল কুরআনের রচয়িতা মনে করেছেন।

উপদেশ ও শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে উপদেশ ও নসিহতের চারটি পন্থা বর্ণনা করেছেন :

১। আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব নেয়ামত সহজলভ্য করে দিয়েছেন সেগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম পালনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। সুরা আ'রাফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"সুতরাং, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ (নেয়ামতসমূহ) স্মরণ করো, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।" [আয়াত ৬৯]

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"সুতরাং, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ (নেয়ামতসমূহ) স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।" [আয়াত ৭৪]

২। আল্লাহ তাআলার দিনসমূহকে (উত্থান-পতনময় অতীতদিনগুলো) স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেশ প্রদান করা। অর্থাৎ, অতীকালের ওইসব জাতির অবস্থাবলি বর্ণনা করে নসিহত ও উপদেশ প্রদান করা যারা আল্লাহ তাআলার দাসত্ব ও আনুগত্য করে সফলতা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করেছে অথবা আল্লাহর অবাধ্যাচরণ ও

বিদ্রোহের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে আবশ্যকভাবে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়েছে এবং ধ্বংস ও বিনাশের শিকারে পরিণত হয়েছে। অন্য কথায়, অতীতের জাতিগুলোর উত্থান-পতনের কাহিনি বর্ণনা করে নসিহত ও শিক্ষার উপকরণ পেশ করা। সুরা ইবরাহিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

"এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলোর[১০১] দ্বারা উপদেশ দাও। তাতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" [আয়াত ৫]

৩। আল্লাহ তাআলা নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করা। অর্থাৎ, (আল্লাহ তাআলার) কুদরতের প্রকাশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বিশ্বনিখিলের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করা এবং সত্যের সত্যায়নের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ (মুজিযা ও কুরআন মাজিদের আয়াত) দ্বারা তাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দেয়া। আল্লাহ তাআলা সুরা ইউসুফে বলেছেন—

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এসব প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন।" [আয়াত ১০৫]

৪। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, অর্থাৎ, আলমে বারযাখ ও কিয়ামতের অবস্থাবলি শুনিয়ে উপদেশ প্রদান করা। আল্লাহ তাআলা সুরা কাফে বলেছন—

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

---

[১০১] أيام বহুবচন, একবচন يوم, অর্থ দিবস। أيام বলতে যুদ্ধবিগ্রহ-সম্বলিত অতীত ইতিহাসকেও বুঝায়। এখানে ওইসব দিবস যাতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিলো অথবা ওই দিনগুলো যখন ইসরাইলিরা মিসরে বন্দি অবস্থায় ভীষণ বিপদে দিনতিপাত করছিলো এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন।

"সুতরাং, যে আমার শাস্তিকে (মৃত্যু-পরবর্তী আযাবকে) ভয় করে তাকে উপদেশ দান করো কুরআনের সাহায্যে।" [সুরা কাফ : আয়াত ৪৫]

অতএব, সাবা জাতির কাহিনি تذكير بأيام الله বা 'আল্লাহ তাআলার দিনসমূকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেশ প্রদান করা'-এর অন্তর্ভুক্ত। তা আমাদের এই শিক্ষা প্রদান করছে যে, যখন কোনো জাতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস, ধন-ঐশ্বর্য ও শক্তিমত্তার দম্ভে স্ফীত হয়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণ করতে শুরু করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রথমে অবকাশ প্রদান করেন এবং তাদেরকে সরল পথে আনার জন্য তাঁর প্রমাণকে নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করেন। তারপরও যদি তারা সত্যের শত্রুই থেকে যায় এবং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়ে আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত ও তাঁর প্রদত্ত সুখ ও ঐশ্বর্য অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে এবং তারা সেগুলোর অবমাননা করতে শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলার পাকড়াও করার বিধান তার লৌহ-পাঞ্জা সামনে বাড়িয়ে দেয় এবং এমন দুর্ভাগা জাতিকে ছিঁড়ে-ফেড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশের ঘূর্ণিপাকে ছুঁড়ে ফেলে, ফলে তাদের যাবতীয় প্রতাপ ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সামনে কেবল একটি কাহিনি হয়ে বিরাজ করে—

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

"বলো, 'পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছে!'" [সুরা নাম্‌ল : আয়াত ৬৯]

أعاذنا الله من ذالك

"আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন।"

আসহাবুল উখদুদ বা কওমে তুব্বা

[৫২৫ খ্রিস্টাব্দ]

উখদুদ

খাদ বা উখদুদ শব্দের অর্থ গর্ত বা পরিখা। শব্দটি একবচন; এর বহুবচন হলো أخاديد (আখাদিদ)। আলোচ্য ঘটনায় কাফের বাদশাহ, তার আমিরেরা এবং বাদশাহর পারিষদবর্গ গর্ত খনন করে তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় মুমিনদেরকে তাতে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলো। এ-কারণে ওই কাফেরদেরকে আসহাবুল উখদুদ বা অগ্নিকুণ্ডঅলা বলা হয়।

আসহাবুল উখদুদ ও কুরআন মাজিদ

আসহাবুল উখদুদের আলোচনা করা হয়েছে কুরআন মাজিদের সুরা বুরুজে। সংক্ষিপ্ত বিবরণে কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত দেয়া হয়েছে যে, তারা সত্যগ্রহণ ও হেদায়েত লাভের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের উপকরণ। কুরআন মাজিদ বলে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে এক এলাকায় হক ও বাতিল (সত্য ও মিথ্যা)-এর মধ্যে সংগ্রাম বাঁধে। একদিকে ছিলেন আল্লাহর মুমিন বান্দাগণ। তাঁদের কাছে বস্তুগত শক্তি ও ক্ষমতা ছিলো না; এদিক থেকে তাঁরা শক্তিহীন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঈমান, সত্য ও সততার শক্তিতে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান কুরবান করার সামর্থ্যে বলীয়ান ছিলেন। অপর পক্ষ ছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সত্যগ্রহণ থেকে বঞ্চিত; কিন্তু বস্তুগত প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এবং উৎপীড়ন শক্তির প্রাচুর্য ছিলো। এ-অবস্থায় কাফের ও মুশরিক শক্তি মুমিনদের ঈমানি শক্তিকে ও সত্যগ্রহণের ক্ষমতাকে সংগ্রামে মুখোমুখি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলো : হয়তো তাঁরা ঈমান বিল্লাহ (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস) পরিত্যাগ করে শিরক ও কুফরের পথে ফিরে আসবেন অথবা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ কাফেরদের এই আহ্বান ও চ্যালেঞ্জকে ঈমানি শক্তি ও সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং 'ঈমান বিল্লাহ'র আলো থেকে বের হয়ে শিরক ও কুফরের অন্ধকারে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

মুমিনদের এই অবস্থা দেখে কাফের দলের পক্ষ থেকে রাজ্যশক্তি ও উৎপীড়নমূলক প্রতাপের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন অংশে গর্ত খনন করা

হচ্ছিলো; গর্তগুলোতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হচ্ছিলো; লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করছিলো। শহরের বেশির ভাগ অংশকেই অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করা হয়েছিলো। তারপর মুমিন দলের আত্মমর্যাদাবান ও আল্লাহর রাহে আত্মোৎসর্গী সদস্যদের টেনে-হিঁচড়ে আনা হচ্ছিলো এবং অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় দাঁড় করানো হচ্ছিলো। শির্‌ক ও কুফর তার বস্তুগত শক্তির বলে বলছিলো, হয় আমাকে গ্রহণ করো, অন্যথায় তোমরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও দাউ দাউ শিখার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। এই কথা শুনে মুমিনগণ বলছিলেন, "জাহান্নামের আগুনের মোকাবিলায় তোমাদের আগুনের এই শাস্তি একটি খেলামাত্র।" ঈমান বিল্লাহ জাহান্নামের আগুনের মোকাবিলায় আনন্দের সঙ্গে তাদের অগ্নিকুণ্ডকে গ্রহণ করে নেয়; কিন্তু শির্‌ক ও কুফরকে এক মুহূর্তের জন্য বরদাশ্‌ত করতে পারে না। কুফর ও শির্‌কের শক্তি মুমিনদের কথা শুনে নিরুত্তর হয়ে পড়ে। তারা অসম্ভব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাওহিদের জন্য আত্মোৎসর্গকারী মানুষদের জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এভাবে সত্য সফলকাম ও বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাজিত ও ব্যর্থ হয়। কেননা, বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে যাঁদেরকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছে তারা আসলে পোড়েন নি এবং মরেন নি; তাঁরা বরং চিরঞ্জীব হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। আর যারা অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যে স্ফীত হয়ে মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষদের ওপর অস্থায়ী আগুন জ্বালিয়েছিলো তারা চিরস্থায়ী ও অনন্ত আগুনের, অর্থাৎ জাহান্নামের উপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে। যারা দুনিয়ার বুকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করেছে এবং সত্যিকার মুমিনদের তার ইন্ধন বানিয়েছে, আল্লাহপাক তাদের জন্য পরকালে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড (জাহান্নাম) প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছেন। তার ইন্ধন হবে কাফের ও মুশরিক এবং অত্যাচারী ও উৎপীড়ক। এরা যে-অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করেছিলো তা তাড়াতাড়ি হোক বা বিলম্বে হোক একদিন নিভে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড অনন্ত ও অবিনশ্বর, কোনোকালেও তা নিভবে না এবং তার সমাপ্তিও ঘটবে না। কুফর ও শির্‌ক পার্থিব ক্ষমতার জন্য গর্বিত ও উদ্ধত হয়েছে; কিন্তু তাদের পরিণাম হলো আযাবু জাহান্নাম (জাহান্নামের শাস্তি) ও আযাবুল হারিক (দহন যন্ত্রণা)। আর 'ঈমান বিল্লাহ' বা মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার ওপর ভরসা করেছেন, তার পরিণতিতে তাঁরা লাভ করেছেন

الْفَوْزُ الْكَبِيرُ 'বিরাট সাফল্য' এবং جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 'জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।'

মোটকথা, সুরা বুরুজে এই ঘটনা অলৌকিক বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে বিবৃত হয়েছে—

سورة البروج

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ () وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ () وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ () قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ () النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ () إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ () وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ () وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ () الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ () إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ () إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (سورة البروج)

"শপথ বুরুজ[১০২]বিশিষ্ট আকাশের এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—[১০৩] ধ্বংস হয়েছিলো কুণ্ডের অধিপতিরা—ইন্ধনপূর্ণ যে-কুণ্ডে ছিলো অগ্নি, যখন তারা তার পাশে উপবিষ্ট ছিলো; এবং তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করছিলো তা প্রত্যক্ষ করছিলো। তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। যারা বিশ্বাসী নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করে নি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।" [সুরা বুরুজ : আয়াত ১-১১]

---

[১০২] برج-এর বহুবচন بروج। অর্থ : গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ, গ্রহ-নক্ষত্র।

[১০৩] شاهد দ্বারা আল্লাহকে বোঝায়। তিনি সব জানেন ও দেখেন। مشهود দ্বারা মানুষকে বোঝায়। আল্লাহ সবসময় তাদের দেখছেন। হাদিস অনুসারে شاهد জুমআর দিবস আর مشهود আরাফাতের দিবস।

ঘটনার বিবরণ

মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতগুলোর তাফসিরে নানাবিধ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে দুটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। একটি ঘটনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদে, ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহে এবং ইমাম তিরমিযি ও নাসায়ি তাঁদের সুনানে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই : হযরত সুহাইব রুমি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অতীতকালে একজন বাদশাহ ছিলো। তার দরবারে একজন জাদুকর ছিলো। জাদুকরটি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। বাদশাহকে একদিন বললো, আমি তো এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি; আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার অভিপ্রায় হলো, আপনি একটি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বালককে আমার হাতে তুলে দিন। আমি তাকে আমার জাদুবিদ্যা শিখিয়ে আমার জীবদ্দশাতেই এই বিদ্যায় তাকে পারদর্শী করে তুলবো। এই কথা শুনে বাদশাহ একটি বালক এনে জাদুকরের হাতে তুলে দিলো। বালকটি তার কাছে জাদুবিদ্যা শিখতে শুরু করলো। বাদশাহর রাজমহল ও জাদুকরটির বাড়ির মাঝখানে একজন রাহেবের (সত্যনিষ্ঠ খ্রিস্টান ধার্মিক) কুঠি ছিলো। একবার বালকটি এই রাহেবের কাছে চলে এলো। সে রাহেবের কথা-বার্তা শুনে ও কাজকর্ম দেখে অত্যন্ত খুশি হলো। ফলে সে নিয়মিতভাবে রাহেবের কাছে যাতায়াত করতে শুরু করলো। জাদুকরের কাছে আসতে তার বিলম্ব হতে লাগলো। জাদুকর ও বাদশাহ বালকটির নির্ধারিত সময়ে আসা-যাওয়ায় বিলম্ব হতে দেখে তার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। বালকটি এ-ব্যাপারে রাহেবের কাছে অভিযোগ করলো। রাহেব বললেন, ব্যাপারটি গোপন রাখার একটিমাত্র উপায় আছে : বাদশাহ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে, জাদুকরের ওখানে দেরি হয়ে গিয়েছিলো আর জাদুকর বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে, বাদশাহর ওখানে দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

দীর্ঘদিন এভাবে চললো। একদিন বালকটি দেখতে পেলো, পথিমধ্যে একটি ভয়ঙ্কর ও বিরাটাকার হিংস্র জন্তু পথচারীদের পথ রোধ করে রয়েছে। কেউ-ই জন্তুটির সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করতে সাহস পাচ্ছে না। বালকটি ভাবলো, এটা একটি উত্তম সুযোগ। আমি যাচাই করে দেখবো রাহেবের ধর্ম সঠিক না-কি জাদুকরের ধর্ম সঠিক। এমন

ভাবনায় সে একটি পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিলো এবং বললো, হে আল্লাহ, যদি আপনার কাছে জাদুকরের ধর্মের তুলনায় রাহেবের ধর্মই সঠিক ও সত্য হয়ে থাকে তবে আপনি আমার এই পাথরের টুকরোর আঘাতে জন্তুটিকে ধ্বংস করে দিন। এই কথা বলে সে পাথরের টুকরোটি জন্তুর গায়ে ছুঁড়ে মারলো। পাথরের টুকরোটি গায়ে লাগা মাত্রই জানোয়ারটি ওই জায়গাতেই মরে পড়ে রইলো।

বালকটি রাহেবের কাছে চলে এলো এবং পুরো ঘটনা তাঁকে শুনালো। রাহেব তাঁকে বললেন, তুমি আমার থেকেও বেশি পূর্ণতা ও ফযিলত লাভ করেছো। আমার আশঙ্কা, তুমি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হবে। দেখো, এমন সময় এলে আমার কথা উল্লেখ করো না।

লোকেরা বালকটির এমন সাহস দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, বালকটি বিস্ময়কর ও অভিনব বিদ্যার অধিকারী। লোকদের কথা শুনে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীরা বালকটি কাছে আসতে শুরু করলো। তারা বালকটিকে বলতে লাগলো, তোমার ইলমের ক্ষমতায় আমাদের সুস্থ করে দাও। এভাবে যারা আসতো বালকটি তাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সুস্থ করে তুলতো।

বাদশাহর দরবারের একজন সভাসদ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বালকটির কথা সে লোকমুখে শুনতে পেলো এবং অনেক উপহার-উপঢৌকনের অনেক সামগ্রী নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলো। উপহার পেশ করে প্রার্থনা করলো, তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। বালকটি জবাব দিলো, আমি কিছুই নই এবং আমার মধ্যে এ-ধরনের শক্তিও নেই। বরং আরোগ্য দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। তুমি যদি ঈমান আনো এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা না করো, তবে আমি অবশ্যই তোমার জন্য সুপারিশ করে দোয়া করবো। সভাসদ এ-কথা শুনে এক ও একক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো। আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। সভাসদ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো।

পরের দিন সে রাজদরবারে উপস্থিত হলো। বাদশাহ অন্ধ সভাসদকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন দেখতে পেলো। তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ঘটনা বলো। সভাসদ বললো, আমার প্রতিপালক আমাকে আরোগ্যদান করেছেন। বাদশাহ বললো, তোমার

প্রতিপালক তো আমি। আমি কি তোমাকে আরোগ্য দান করেছি? সভাসদ বললো, আমার ও তোমার এবং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক আমাকে আরোগ্যদান করেছেন। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো, আমি ছাড়াও কি তোমার কোনো প্রতিপালক আছে? সভাসদ বললো, হ্যাঁ আছে। আল্লাহ তাআলা আমার ও তোমার প্রতিপালক। এই কথা শুনে বাদশাহ সভাসদকে নানাভাবে নানা ধরনের শাস্তি দিলো। শেষে সভাসদ বাদশাহকে বালকটির ঘটনা জানালো।

বাদশাহ বালকটিকে ডেকে আনিয়ে বললো, বাবা, আমি শুনতে পেলাম তুমি তোমার জাদুবিদ্যা বলে অন্ধকে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলছো। বালকটি বললো, আমার মধ্যে সে-ক্ষমতা কোথায়? তারা তো আল্লাহ তাআলার আরোগ্যদানের ফলে আরোগ্য লাভ করে। বাদশাহ বললো, আমি ছাড়াও কি তোমার কোনো প্রতিপালক আছে? বালক বললো, সেই প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয়; তিনি তোমার ও আমার এবং সবারই প্রতিপালক। বাদশাহ এসব কথা শুনে বালককে শাস্তি দিতে শুরু করলো। অবশেষে বালকটি রাহেবের ব্যাপারে সব ঘটনা বাদশাহকে জানালো।

বাদশাহ রাহেবকে ডেকে পাঠালো। তাঁর ওপর শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলো সত্যধর্ম ত্যাগ করার জন্য। কিন্তু রাহেব কোনোভাবেই বাদশাহর কথা মেনে নিলো না। বাদশাহ রাহেবের মাথার ওপর করাত চালিয়ে তাঁকে শহীদ করে ফেললো। তারপর বালককে বললো, তুমি রাহেবের ধর্ম পরিত্যাগ করো। বালক স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানালো। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দেশ দিলো, একে পাহাড়ের চূড়ার ওপর তুলে তার থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যাতে সে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সরকারি লোকেরা বালকটিকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলো। বালক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করলো, হে আল্লাহ, এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে আপনি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি হলো এবং সরকারি কর্মচারীরা পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

বালকটি সুস্থ ও অক্ষত বেঁচে গিয়ে বাদশাহর সামনে এসে উপস্থিত হলো। বাদশাহ তাকে দেখে বললো, তোমার সঙ্গীরা কোথায়? বালক বললো, আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন।

বাদশাহ ক্রোধে অস্থির হয়ে নির্দেশ দিলো, তোমরা একে নিয়ে। নদীতে নিয়ে গিয়ে পানিতে ডুবিয়ে দাও। সরকারি লোকেরা বালকটিকে নদীর মাঝখানে নিয়ে গেলো। বালকটি পুনরায় সেই প্রার্থনাই করলো : হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করুন। সঙ্গে সঙ্গে নদীর পানি স্ফীত হয়ে উঠলো। বালকটি ছাড়া বাকি সবার সলিলসমাধি ঘটলো।

বালকটি বেঁচে গিয়ে সুস্থ ও সবল অবস্থায় বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলো। বদশাহ জিজ্ঞেস করলো, তোমার সঙ্গে যারা ছিলো তারা কোথায়? বালকটি বললো, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। সে আরো বললো, বাদশাহ, এভাবে তুমি কিছুতেই সফল হতে পারবে না। (আমাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবে না।) তবে আমি তোমাকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি। তুমি যদি এই উপায় অবলম্বন করো তবে নিঃসন্দেহে আমাকে হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ বালকটিকে জিজ্ঞেস করলো সেই উপায়টা কী। বালক বললো, তুমি শহরের সব মানুষকে একটি উঁচু স্থানে একত্র করো। সবাই সমবেত হলে আমাকে শূলিকাঠে চড়াও। তারপর আমার তূণীর থেকে একটি তীর নিয়ে بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ 'এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে' বলে তীরটি আমার বুকে নিক্ষেপ করো। তখন আমি মরতে পারি।

বাদশাহ বালকের কথা অনুসারে কাজ করলো। শহরের সব লোক এসে একটি উঁচু স্থানে একত্র হলো। বালকটিকে শূলে চড়ানো হলো। বাদশাহ উল্লিখিত বাক্যটি পাঠ করে তার তূণীর থেকে একটি তীর নিয়ে বালকটি বুকে নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে বালকটি শহীদ হয়ে গেলো। উপস্থিত জনতা এই ঘটনা দেখে সবাই একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলো آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ 'আমরা সবাই বালকের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম', 'আমরা সবাই বালকের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম'। এই কথা বলে সবাই মুসলমান হয়ে গেলো।

সভাসদেরা বাদশাহকে বললো, আপনি সে-ব্যাপারে আশঙ্কা করতেন শেষ পর্যন্ত সেটাই ঘটলো। এখানে উপস্থিত সব প্রজাই মুসলমান হয়ে গেলো। বাদশাহ এই কাণ্ড দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো। সে নির্দেশ দিলো, শহরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে গর্ত খনন করো। সেগুলোতে

প্রচণ্ড আগুন প্রজ্জ্বলিত করো। তারপর মহল্লার সব লোককে গর্তগুলোর পাশে একত্র করো। তাদেরকে বলো, তারা যেনো ইসায়ি ধর্ম থেকে ফিরে আসে। যে ওই ধর্ম থেকে ফিরে আসবে তাকে ছেড়ে দাও। আর যারা তোমাদের কথা অমান্য করবে তাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো।

লোকেরা দলে দলে এসে সমবেত হতে লাগলো। তারা সত্যধর্ম ত্যাগ করবে না বলে অঙ্গীকার করলো এবং স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে লাগলো। বাদশাহ ও তার সহচরবৃন্দ আনন্দের সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখছিলো। ইতোমধ্যে একটি মুমিন স্ত্রীলোককে নিয়ে আসা হলো। তার কোলে ছিলো একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু। স্ত্রীলোকটি শিশুপুত্রের প্রতি ভালোবাসা একটু ইতস্তত করছিলো। তৎক্ষণাৎ শিশুটি বলে উঠলো, মা, তুমি ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ো। নিঃসন্দেহে তুমি সত্যপথে রয়েছে। আর এই বাদশাহ অত্যাচারী ও পথভ্রষ্ট।[১০৪]

দ্বিতীয় ঘটনাটি জীবনচরিতকার মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. মুহাম্মদ বিন কা'ব-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই : শাম ও হিজাযের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত নাজরান জনপদের অধিবাসীর পৌত্তলিক মুশরিক ছিলো। তাদের কাছাকাছি বসতিতে একজন জাদুকর বসবাস করতো। সে নাজরানের বালকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতো। কিছুদিন পর নাজরান ও জাদুকরের বসতির মাঝখানে একজন রাহেব তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করতে শুরু করলেন। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, এই রাহেবের নাম ছিলো ফাইমুন। নাজরানের যেসব বালক জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখতো তাদের মধ্যে একটি বালকের নাম ছিলো আবদুল্লাহ বিন তামির। একদিন আবদুল্লাহ রাহেবের তাঁবুর মধ্যে গেলো। রাহেব তখন নামাযে মশগুল ছিলেন। আবদুল্লাহ রাহেবের নামায ও ইবাদতের পদ্ধতি অত্যন্ত পছন্দ করলো। সে তাঁবুতে যাতায়াত করতে শুরু করলো এবং রাহেবের কাছে তাঁর ধর্ম শিক্ষা করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহ ঈমান আনলো। রাহেবের কাছে সত্যিকারের ইসায়ি ধর্ম শিক্ষা করতে করতে একদিন সে বড় ধর্মজ্ঞানী হয়ে উঠলো।

---

[১০৪] সহিহু মুসলিম, সুনানুত তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ ও সুনানুন নাসায়ি।

একদিন আবদুল্লাহ রাহেবের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বললো, আপনি আমাকে 'ইসমে আজম' সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিন। কিন্তু রাহেব এই বলে সময়ক্ষেপণ করতে লাগলেন যে, ভাতিজা, আমার আশঙ্কা হয় তুমি তা বরদাশত করতে পারবে না। কারণ, আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি।' আবদুল্লাহ নীরব হয়ে গেলো। এদিকে এ-ধরনের কর্মকাণ্ড চলছিলো আর ওদিকে আবদুল্লাহর বাবা তামির মনে করছিলো, আমার ছেলে জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখছে।

কিছুদিন নীরব থাকার পর আবদুল্লাহ আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলো যে, রাহেব তার সঙ্গে কৃপণতা করছেন এব ইসমে আজম শিখাতে চাচ্ছেন না। এই চিন্তা থেকে সে এক মুঠ তীর নিলো এবং প্রত্যেকটি তীরে আল্লাহ তাআলার এক-একটি নাম লিখলো। তারপর আগুন জ্বালালো এবং একটির পর একটি তীর আগুনে নিক্ষেপ করলো। তীরগুলো ধীরে ধীরে আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হতে লাগলো। কিন্তু একটি তীর আগুনে ছোঁড়ামাত্র লাফিয়ে আগুন থেকে দূরে গিয়ে পড়লো। আবদুল্লাহ বুঝতে পারলো, এই তীরটির ওপরই মহান সত্তার নাম 'আল্লাহ' লেখা আছে। এবং এটি ইসমে আজম। তারপর বিস্তারিত ঘটনা রাহেবকে শুনালো। রাহেব আবদুল্লাহকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি তীরটি যত্নের সঙ্গে তোমার কাছে রেখে দাও।

আবদুল্লাহ তীরটিকে সত্যধর্ম প্রচারের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করলো। সে যখন কোনো রোগী ব্যক্তিকে দেখতো তাকে বলতো, তুমি যদি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং মুমিন হও, তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবো, যেনো তিনি তোমাকে আরোগ্যদান করবেন। রোগী ব্যক্তি সত্য অন্তরে ঈমান আনতো। আবদুল্লাহ তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতো। ফলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠতো। ধীরে ধীরে এই সংবাদ নাজরানের বাদশাহর কাছে পৌঁছলো। সে আবদুল্লাহকে ডেকে পাঠালো এবং বললো, তুমি আমার রাজ্যে গণ্ডগোল ও অশান্তি সৃষ্টি করছো এবং আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করছো। সুতরাং, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তোমাকে হত্যা করা হবে।

আবদুল্লাহ বললো, বাদশাহ, আমাকে হত্যা করা তোমার সাধ্যের বাইরে। বাদশাহ ক্রোধে জ্বলে ওঠে নির্দেশ দিলো, একে পাহাড়ের চূড়া

থেকে নিক্ষেপ করো। সরকারি লোকেরা আবদুল্লাহকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা তাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখলো। আবদুল্লাহ বাদশাহর দরবারে ফিরে এলো। তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলো, একে নদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দাও। কিন্তু তাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হলেও সে ডুবলো না এবং তার কোনো ক্ষতিই হলো না। আবদুল্লাহ তখন বাদশাহকে বললো, সত্যিই যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তবে তার একটিমাত্র উপায় আছে। তা এই যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর নাম নিয়ে তুমি আমার আক্রমণ করো। তা হলে আমি মরতে পারি। বাদশাহ এক আল্লাহর নাম নিয়ে আবদুল্লাহর ওপর আক্রমণ করলো। ফলে আবদুল্লাহ শহীদ হয়ে গেলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার আযাব এসে বাদশাহকে ওখানেই ধ্বংস করে দিলো।

নাজরানের অধিবাসীরা আবদুল্লাহ ও বাদশাহর মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধের দৃশ্য দেখলো। তারা সবাই খাঁটি অন্তঃকরণে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো। তারা একনিষ্ঠতার সঙ্গে হযরত ইসা আ.-এর প্রবর্তিত ও ইঞ্জিলের বিধি-বিধানের অনুসরণ করাকে তাদের ধর্ম বানিয়ে নিলো। ফলে এই ঘটনার মাধ্যমেই নাজরানে প্রকৃত ইসায়ি ও সত্যধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

নাজরানে ইসায়ি ধর্মের প্রচার-প্রসার এবং বালক আবদুল্লাহ ও রাহেবের কাহিনি ইয়ামানের ইহুদি ধর্মাবলম্বী বাদশাহ যু-নাওয়াস পর্যন্ত পৌছলো। সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো এবং বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে নাজরানে উপস্থিত হলো। সে ঘোষণা করলো, নাজরানের কোনো লোকই ইসায়ি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। হয়তো তারা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করবো, অন্যথায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। নাজরানের অধিবাসীদের হৃদয়ে ইসায়ি ধর্মের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিলো। তারা মৃত্যুই বরণ করলো; কিন্তু ইসায়ি ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো না। যু-নাওয়াস তাদের অবস্থা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং নির্দেশ দিলো, শহরের প্রতিটি গলিতে ও প্রধান সড়কগুলোতে গর্ত ও পরিখা খনন করা হোক এবং সেগুলোতে আগুন জ্বালানো হোক। সেনাবাহিনী যু-নাওয়াসের নির্দেশ পালন করলো। তখন সে শহরবাসীদের একত্র করে নির্দেশ দিলো, কেউ যদি ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, সে পুরুষ

হোক, নারী হোক বা শিশু হোক—তাকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তার এই নির্দেশ অনুসারে শহরের প্রায় বিশ হাজার নিরীহ মানুষকে শাহাদাতের সুধা পান করতে হলো।

এটাই ওই ঘটনা যা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন—

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ () النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ

"ধ্বংস হয়েছিলো কুণ্ডের অধিপতিরা—ইন্ধনপূর্ণ যে-কুণ্ডে ছিলো অগ্নি।"

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, যু-নাওয়াস ইয়ামানের বিখ্যাত বাদশাহ। আর প্রকৃত নাম ছিলো যারআহ। কিন্তু রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করার পর সে ইউসুফ যু-নাওয়াস নামে বিখ্যাত হয়ে গেলো। তার পিতার নাম ছিলো তুব্বান আসআদ এবং তার ডাকনাম ছিলো আবু কারব। ইয়ামানের তখনকার যুগের বাদশাহগণের উপাধি ছিলো তুব্বা। এইজন্য ইতিহাসে এই রাজবংশকে বলা হতো 'তাবাবিআয়ে[১০৫] ইয়ামান'। আবু কারব এই বংশের প্রথম তুব্বা ছিলো। সে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। সে মদিনায় (ইয়াসরিব) আক্রমণ করে তা দখল করে নিয়েছিলো। কিন্তু বনু কুরাইযার দুইজন সত্যিকার ইহুদি আলেমের পরামর্শে মুসা আ.-এর প্রকৃত ধর্ম গ্রহণ করে মদিনা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। তারপর মক্কা মুআয্‌যামায় পৌঁছে কা'বাগৃহের ওপর আবরণ টানিয়েছিলো এবং দুই ইহুদি আলেমকে সঙ্গে করে ইয়ামানে নিয়ে গিয়েছিলো। তারা ইয়ামানে ইহুদি ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছিলেন। ফলে ইয়ামানের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে প্রকৃত ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিলো।

মোটকথা, যু-নাওয়াস একদিনে নাজরানের বিশ হাজার সত্যনিষ্ঠ মানুষকে হত্যা করে। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি—দাওস যু-সা'লাবান কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায় এবং শামে অবস্থানরত রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়। যু-সা'লাবান সম্রাটকে নাজরানের হৃদয়বিদারক কাহিনি বর্ণনা করে শোনায় এবং

---

[১০৫] তুব্বার বহুবচন তাবাবিআ।

বিচার দাবি করে। কায়সার সঙ্গে সঙ্গে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশিকে লেখেন, তুমি ইয়ামানে আক্রমণ করো এবং যু-নাওয়াস থেকে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করো। নাজ্জাশি ইয়ামান আক্রমণ করার কয়েকদিনের মধ্যেই যু-নাওয়াসকে পরাজিত করলো এবং সমগ্র ইয়ামানে আধিপত্য বিস্তার করলো। যু-নাওয়াস নদীপথে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু তার সলিলসমাধি ঘটে।

যু-নাওয়াসের মৃত্যুর পর প্রায় সত্তর বছর ইয়ামান খ্রিস্টানদের অধিকারে ছিলো। তারপর হিমইয়ারি রাজবংশের এক সরদার—সাইফ বিন যি-ইয়াযান তার বংশের শাসনাধীন রাজ্য পুনরুদ্ধানের চেষ্টা করে। এ-ব্যাপারে সে পারস্য সম্রাট কিসরার সাহায্য প্রার্থনা করে। কিসরা নির্দেশ দেন, পারস্য সাম্রাজ্যে যত কয়েদি আছে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হোক এবং তাদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে সাইফ বিন যি-ইয়াযানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হোক। সাইফ সাত হাজার পারস্য সৈন্য এবং নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামান আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের হাত থেকে ইয়ামানকে মুক্ত ও পুনরুদ্ধার করে।[১০৬]

এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নাজরানের বাদশাহ মূর্তিপূজক ছিলো। সুতরাং, ইয়াসি ধর্মের রাহেবের মাধ্যমে যদি নাজরানে ইসায়ি ধর্ম বিস্তার লাভ করে থাকে তবে ইহুদি ধর্মাবলম্বী বাদশাহ যু-নাওয়াসের এতটা উত্তেজিত হওয়ার কারণ কী হতে পারে? ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন এভাবে : তখনকার সময়ে যে-রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিলো তাতে রোমানরা (ইসায়িরা) ও হাবশিরা এক দলভুক্ত ছিলো। অন্যদিকে হিমইয়ারি ইহুদি ও ইরানিরা (অগ্নিপূজক) এক দলভুক্ত ছিলো। এই দুই দলের মধ্যে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতা বিরাজমান ছিলো। এর ফলে যু-নাওয়াস নাজরানে ইসায়ি ধর্মের প্রচার-প্রসারকে বরদাশত করতে পারে নি।

আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে আরো কিছু কথা যুক্ত করতে চাই : ইতিহাস আরো একটি বিষয় প্রমাণ করছে যে, ইহুদিরা হযরত ইসা আলাইহিস

[১০৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৪-৪৯৫ এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০-১৩১।

সালামকে শূলে চড়িয়েছিলো। এ-ব্যাপারে খ্রিস্টান ও ইহুদি সবাই একমত। এর ফলে ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, উভয় দল মূর্তিপূজকদের উন্নতি মেনে নিতে পারলেও নিজেদের মধ্যে একদল অন্য দলের ধর্মীয় বিকাশ ও উৎকর্ষ কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না। তাদের মধ্যে এই শত্রুতাভাব এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছিলো যে, ইহুদিরা যখনই সুযোগ পেতো, তারা নিছক ধর্মের নামে নাসারাদের ওপর কঠোর থেকে কঠোরতর অত্যাচারকে বৈধ মনে করতো এবং শাসনক্ষমতার চাপ প্রয়োগ করে জোরপূর্বক তাদেরকে ইহুদি বানানোর চেষ্টা করতো। আর নাসারারাও যখন সুযোগ পেতো, ইহুদিদের ওপর এ-ধরনের অত্যাচার করতে ত্রুটি করতো না।

নাজরানের ঘটনাটি যে-সময় ঘটেছিলো তখন উপরিউক্ত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতার পরিবেশ বিরাজমান ছিলো। রোমান বণিকেরা ইয়ামানের বন্দরগুলোতে আসতো এবং ব্যবসায়িক পণ্য আমদানি-রপ্তানির পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্মেরও প্রচার চালাতো। নাজরান ইয়ামানের বন্দর এলাকায় অবস্থিত ছিলো। ধীরে ধীরে তা রোমান বণিকদের বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হয়ে উঠলো। হিমইয়ারি বাদশাহ রোমান বণিকদের কর্মকাণ্ড লক্ষ করতো এবং ভেতরে ভেতরে খুব চটতো; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাদের শাস্তি দেয়ার কোনো অজুহাত তার হাতে আসতো না। ঘটনাক্রমে এই সময়েই রাহেব ও বালক আবদুল্লাহর ঘটনাটি ঘটলো। যু-নাওয়াস দেখতে পেলো যে, ব্যাপার তো রাজনীতি ও ব্যবসাকে অতিক্রম করে ধর্ম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তখন ইহুদিদের চিরাচরিত ধর্মবিদ্বেষ তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন করে তুললো। তারপর যা ঘটলো তার বিবরণ আপনারা আগের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠ করেছেন।

এই দুটি ঘটনা ছাড়াও বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবি হাতেম থেকে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। ঘটনাটি এই : হযরত আনাস রা.-এর পুত্র রবি বলেন, আসহাবুল উখদুদ সম্পর্কে আমি একটি ঘটনা শুনেছি। 'ফাত্রাত'-এর যুগে (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত ইসা আ.-এর মধ্যবর্তী যুগ) আল্লাহ তাআলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের একটি জামাত দেখলেন যে, সময় খুব খারাপ হতে চলছে। ফেতনা ও অশান্তি এবং নৈরাজ্য ও কলহ খুব বেশি বেড়ে চলছে।

সত্যধর্ম দলাদলির শিকারে পরিণত হয়েছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতের অধীন হয়ে পড়েছে। তাঁরা তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সাধারণ জনবসতিগুলো থেকে দূরে একটি ক্ষুদ্র বসতি আবাদ করলেন। তাতে তাঁরা সত্যিকার ইসায়ি ধর্ম অনুযায়ী ইবাদত ও সততার জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের এই ব্যাপারটা গোপনীয় থাকতে পারে নি। ধীরে ধীরে তা ওই যুগের মূর্তিপূজক বাদশাহর কানে গিয়ে পৌঁছলো। সে তার বাহিনী নিয়ে এসে বসতিটি ঘিরে ফেললো এবং তাঁদেরকে আল্লাহর একত্বের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজা করার জন্য বলপ্রয়োগ করতে লাগলো। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ইবাদতশারীরা বাদশাহর পীড়াপীড়ি ও বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখালেন না। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় শিরক ও মূর্তিপূজা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। বাদশাহ ক্রোধে জ্বলে উঠে গর্ত খনন করতে এবং তাতে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দিলো। তারপর যে-ব্যক্তি মূর্তিপূজা করতে অস্বীকৃতি জানাতো তাঁকেই আগুনে নিক্ষেপ করা হতো। সত্যের পূজারী মহাপুরুষগণ পতঙ্গের মতো অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাঁরা তাদের শিশু ও যুবকদের সান্ত্বনা দিতেন যে, আজ তো ভীত হওয়ার দিন নয়। আমাদের জন্য এই আগুন জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার প্রথম স্তর। এইভাবে সত্যের পূজারী মহান ব্যক্তিগণ সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়াকেই নিজেদের জন্য বরণ করে নিলেন; কিন্তু তারা কিছুতেই শিরক ও মূর্তিপূজা করতে প্রস্তুত হলেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি পৃথিবীতে এই অনুগ্রহ করলেন যে, যখন তাঁদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হতো, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে তার যন্ত্রণা সহ্য করার পূর্বেই জান কবয করে নেয়া হতো। কিন্তু গর্ত ও পরিখাগুলোর আগুন এতটাই ভয়ঙ্করভাবে জ্বলছিলো যে, সৎ লোকদের খেয়ে ফেলার পরও তা নেভে নি। তা নিয়ন্ত্রণহীন ছড়িয়ে গেলো এবং মূর্তিপূজক অত্যাচারী বাদশাহ তার লোকবলসহ আগুনের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে পড়লো। এভাবে তারা জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলো। কুরআন মাজিদের قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ○ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ

"ধ্বংস হয়েছিলো কুণ্ডের অধিপতিরা—ইন্ধনপূর্ণ যে-কুণ্ডে ছিলো অগ্নি" আয়াতটি এই ঘটনারই আলোচনা করছে।[১০৭]

হযরত আলি রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই ঘটনা ঘটেছিলো পারস্যে। পারস্যের বাদশাহ সত্যধর্ম ত্যাগ করে বাতিল ও মিথ্যার পূজা অবলম্বন করেছিলো এবং মুহরিম নারীদের (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, যেমন, মা, বোন, কন্যা, খালা, ফুফু ইত্যাদি) বিয়ে করা বৈধ সাব্যস্ত করেছিলো। তাদের আলেমগণের মধ্যে যাঁরা তখনও সত্যধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা বাদশাহকে এ-ধরনের কুকাণ্ড করতে নিষেধ করলেন। বাদশাহ সত্যের সামনে তার মস্তক অবনত করলো না; বরং সে ক্রোধমাতাল হয়ে নির্দেশ দিলো, গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালাও এবং যারা মা-বোন-কন্যা ইত্যাদি মুহরিম নারীকে বিয়ে করা অবৈধ বলে তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত জ্বালিয়ে দাও। ফলে সত্যনিষ্ঠ জামাতকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো। অগ্নিপূজক পারসিকদের মধ্যে আজ পর্যন্ত মুহরিম নারীদের বিয়ে করা বৈধ মনে করা হয়ে থাকে।[১০৮]

সমালোচনা

উল্লিখিত রেওয়ায়েতগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এবং বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলে সবগুলো ঘটনার একই সারমর্ম বের হয়। তা এই যে, অতীতকালের মুশরিক বা ইহুদি বাদশাহ সত্যনিষ্ঠ ও আল্লাহ তাআলার তাওহিদে পাগল একটি জামাতকে মূর্তিপূজা বা বাতিলপূজার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেছিলো। কিন্তু তাঁরা বাদশাহর এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সত্যের আনুগত্য ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ফলে অত্যাচারী বাদশাহ তাঁদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছিলো। কিন্তু পরিণতিতে সত্যনিষ্ঠ দলের ভাগ্যে এলো চিরস্থায়ী সফলতা ও অনন্ত কল্যাণ। আর অত্যাচারী ও

---

[১০৭] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩।

[১০৮] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩।

মিথ্যাপূজারী দল পৃথিবীতেও ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং আখেরাতেও তাদের ভাগ্যে জুটলো চিরকালীন জাহান্নাম।

তা ছাড়া যদি আরেকটি বিষয় প্রণিধান করা হয় যে, আয়াত ও সুরাগুলোর নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে আসল ব্যাপার হলো তাদের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য। আর শানে নুযুল হলো গৌণ ও ঐতিহাসিকভাবে বিবেচ্য বিষয়। যেমন, হাকিমুল উম্মাত হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) তাঁর 'আল-ফাউযুল কাবির' কিতাবে স্পষ্টভাবে এ-কথা বলেছেন। তা হলে সহজেই এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন যুগে এই নীলাকাশের নিচে এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, উপরিউক্ত রেওয়ায়েতগুলোতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহে এবং ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে যে-ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন তা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। আবার মুহাম্মদ বিন ইসহাক তাঁর জীবনচরিতমূলক গ্রন্থে যে-ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তাও একটি ভিন্ন ঘটনা। আল্লামা ইবেন কাসির হযরত আলি (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)-এর সূত্রে যে-ঘটনা উল্লেখ করেছে সেটিও একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। ইবনে কাসির একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে প্রমাণ করেছেন যে, নিঃসন্দেহে এই জাতীয় ঘটনা অনেক ঘটে গেছে। তিনি লিখেছেন—

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا، كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع، وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد، فاتخذوا أتونا، وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل بختنصر، الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحباه: عزريا وميشائيل، فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار، ثم ألقاهما فيه، فجعلها الله عليهما بردا وسلاما، وأنقذهما منها، وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط، فأكلتهم النار.

"আর সম্ভবনা আছে যে, এই জাতীয় ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটেছে। যেমন, ইবনে আবি হাতেম বলেন, আমার পিতা আবুল ইয়ামান থেকে,

তিনি সাফওয়ান থেকে, তিনি আবদুর রহমান বিন জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উখদুদের একটি ঘটনা ইয়ামানে তুব্বাদের শাসনামলে ঘটেছিলো; আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো কন্‌স্টান্‌টিনোপলে সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের যুগে—যখন নাসারারা ইসা মাসিহ আ.-এর ধর্ম ও তাওহিদের বিশ্বাস থেকে তাদের কেবলাকে পরিবর্তন করেছিলো (ধর্মান্তরিত হয়েছিলো)। তখন তারা চুল্লি নির্মাণ করেছিলো এবং যে-সকল নাসারা ইসা মাসিহ আ.-এর ধর্ম ও তাওহিদের বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদের ওই চুল্লিতে নিক্ষেপ করেছিলো। উখদুদের আরেকটি (তৃতীয়) ঘটনা ঘটেছিলো ইরাকের বাবেলের ভূমিতে বাদশাহ বুখতেনাস্‌সারের যুগে। বুখতেনাস্‌সার প্রতিমা নির্মাণ করেছিলো এবং লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলো প্রতিমার পূজা করতে; কিন্তু দানিয়াল আ. এবং তাঁর দুই সঙ্গী উযাইরিয়া ও মিশাইল তার বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে বুখতেনাস্‌সার চুল্লি নির্মাণ করেছিলো এবং তাতে কাঠ ও আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলো। উযাইরিয়া ও মিশাইলকে চুল্লিতে নিক্ষেপ করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আগুনকে শীতল ও নিরাপদ করেছিলেন এবং তাঁদেরকে আগুন থেকে উদ্ধার করেছিলেন। যারা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো তাদেরকে তিনি আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন; তারা ছিলো নয় জন। আগুন তাদেরকে খেয়ে ফেলেছিলো।"[১০৯]

আল্লামা ইবনে কাসির আরো লিখেছেন—

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحدة بنجران باليمن، والأخرى بالشام، والأخرى بفارس، أما التي بالشام فهو أنطانوس الرومي، وأما التي بفارس فهو بختنصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم يترل الله فيهم قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران.

"মুকাতিল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, উখদুদের ঘটনা তিনটি : একটি ঘটনা ঘটেছিলো ইয়ামানের নাজরানে; আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো শামে এবং তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিলো পারস্যে। শামের ঘটনার কুশীলব ছিলো আন্‌তানানুস আর-রুমি আর পারস্যের ঘটনার কুশীলব ছিলো

---

[১০৯] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, সুরা বুরুজ।

বুখতেনাস্‌সার আর আরবভূমির (ইয়ামানের) ঘটনাটি ঘটিয়েছিলো ইউসুফ যু-নাওয়াস। পারস্য ও শামের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা কুরআনে কিছু নাযিল করেন নি (এই দুটি ঘটনার বর্ণনা কুরআনে নেই); নাজরানের ঘটনায় তিনি সুরা নাযিল করেছেন (সুরা বুরুজে এই ঘটনার বর্ণনা আছে)।"[১১০]

যাইহোক। উল্লিখিত রেওয়ায়েতগুলো ছাড়াও এ-জাতীয় অন্য যেসব ঘটনা আছে মর্মার্থ ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তার সবগুলোই সুরা বুরুজের প্রয়োগক্ষেত্র হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিবেচনায় যদি এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কুরআন মাজিদ নির্দিষ্ট করে বিশেষভাবে কোন্ ঘটনাটির উল্লেখ করেছে, তবে বিখ্যাত তাবিয়ি মুকাতিলের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কুরআনে যে-ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নাজরান ও যু-নাওয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই বক্তব্যই সঠিক। কেননা, সহিহ্ মুসলিম ও মুসনাদের কোনো একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা সুরা বুরুজের

---

[১১০] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, সুরা বুরুজ।

শাম ও পারস্যের ঘটনা দুটির মধ্যে শামের ঘটনা বলতে খুব সম্ভব সম্রাট কনস্টানটাইনের দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি উদ্দেশ্য। ঘটনা এই যে, কন্‌স্টান্‌টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কন্‌স্টানটাইন যখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো, তিনি হযরত ইসা আ.-এর সত্যধর্মের পরিবর্তে প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্মকে নিজের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিলো। একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদকে তার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল স্থির করে নিয়েছিলো। সে সাখরায়ে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মুখ ফিরিয়ে পূর্বদিকে কেবলা সাব্যস্ত করেছিলো। সে সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলো যে, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের পরিবর্তে প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করো। আর যেসব ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাজার হাজার মানুষকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।

আর পারস্যের ঘটনা সম্পর্কে ইবনে কাসির একটি ইসরাইলি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তা নবী দানিয়াল আ.-এর সহিফাতেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইরাকের বাবেলে বুখতেনাস্‌সার একটি স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করিয়ে প্রজাসাধারণকে তার সামনে সেজদা করতে বাধ্য করেছিলো এবং সেজদাও করছিলো। কিন্তু নবী দানিয়াল আ. ও তাঁর সঙ্গীরা স্বর্ণমূর্তির সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বুখতেনাস্‌সার তখন বিরাট চুল্লি বানিয়ে তাকে আগুন জ্বালালো এবং তাদের সবাইকে চুল্লিতে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু আগ্নিকুণ্ড তাদের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে গেলো। তাদের কারো শরীরে বিন্দুমাত্র উত্তাপও লাগে নি। আর যে-নয়জন কাফের তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো তারা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো।

আয়াতগুলোর তাফসির প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এ-কারণেই ইমাম মুসলিম এই হাদিসটিকে কিতাবুত তাফসির বা তাফসির অধ্যায়ে বর্ণনা করেন নি। অবশ্য ইমাম তিরমিযি একটি 'হাসান গরিব' হাদিসে এই ঘটনাকে অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যেনো এটি সুরা বুরুজের আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসির। কিন্তু ইবনে কাসির বলেন, ইমাম তিরমিযির বর্ণিত হাদিস থেকে তো এটাও প্রমাণিত হয় না যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বরং প্রবল সম্ভাবনা এই যে, এই ঘটনা হাদিসের রাবি (বর্ণনাকারী) হযরত সুহাইব বিন সিনান আর-রুমি রা.-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত। কেননা, তিনি আহলে কিতাবের কাহিনি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে অনেক বড় আলেম ছিলেন। সুনানুত তিরমিযিতে বর্ণিত হাদিসটি নিম্নরূপ—

عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء ؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختار النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا.

"হযরত সুহাইব আর-রুমি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায আদায় করার পর নিঃশব্দে কিছু পড়তেন। কারো কারো মতে 'হামস' শব্দের অর্থ এমনভাবে ঠোঁট নাড়ানো, যেনো কথা বলছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আসরের নামায পড়ার পর ঠোঁট নেড়ে থাকেন (নিঃশব্দে কিছু পড়ে থাকেন)।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কোনো একজন নবী তাঁর উম্মতের (সংখ্যাধিক্যের) জন্য বিস্ময়বোধ করেছিলেন এবং মনে মনে (গর্বের সঙ্গে) বলেছিলেন, তাদের সঙ্গে আর কারা প্রতিযোগিতা করতে পারবে? (সংখ্যায় কারা তাদের সমান হবে?) (নবী এই ভাব আল্লাহ তাআলার পছন্দ হয় নি) তাই তিনি ওহি নাযিল করলেন, তাদের জন্য দুটি বিষয়ের কোনো একটি গ্রহণের অধিকার আছে : হয় আমি তাদেরকে ধ্বংস

করবো অথবা তাদের ওপর শত্রুবাহিনিকে আধিপত্য দান করবো। তারা ধ্বংস হওয়াকে গ্রহণ করলো। তখন আল্লাহ তাদের ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দিলেন। ফলে একদিনেই তাদের সত্তর হাজার লোক মৃত্যুবরণ করলো।"[১১১]

হাদিসটিতে এর পরের শব্দগুলো এই— وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر 'আর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা বর্ণনা করতেন, তিনি এর সঙ্গে অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন। (এই অন্য ঘটনাটি সেটাই যা সহিহু মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।)

এই হাদিস বর্ণনা করার পর ইবনে কাসির বলেন—

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى، والله أعلم.

"হাদিসের এই বর্ণনাপদ্ধতি থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না যে, এই ঘটনার অপর অংশ (দ্বিতীয় ঘটনাটি) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্য। আমার উস্তাদ হাফেয হাজ্জাজ আল-মুযযি বলেন, সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি (সুনানুত তিরমিযিতে উদ্ধৃত এই ঘটনা) হযরত সুহাইব আর-রুমির বক্তব্য। কারণ, নাসারাদের ঘটনা ও কাহিনি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিলো।"[১১২]

তাফসির ও জীবনচরিতের গ্রন্থগুলোতে হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 'আসহাবুল উখদুদ' সম্পর্কে তিনটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। একটি রেওয়ায়েত উপরে বর্ণিত হয়েছে; দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে যে, এই ঘটনা ঘটেছিলো ইয়ামানে; আর তৃতীয় রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে এটি ছিলো হাবশার ঘটনা। কিন্তু এই তিনটি রেওয়ায়েত থেকে কোনো একটি রেওয়ায়েত সম্পর্কেও আলি রা. থেকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, তিনি এগুলোর মধ্যে কোন্ ঘটনাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুরা বুরুজের আলোচ্য আয়াতগুলোর তাফসির মনে করেন।

---

[১১১] সুনানুত তিরমিযি, হাদিস ৩২৭৭, সুরা বুরুজ।

[১১২] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৪।

যখন মুসলিমের রেওয়ায়েত এ-ব্যাপারে নীরব, তিরমিযির রেওয়ায়েত থেকেও এর সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোনো বিষয় প্রমাণিত হয় না এবং হযরত আলি রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো তার ব্যাপকতা, মর্মার্থ ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবেচনায় শানে নুযুল বুঝাচ্ছে না, সুতরাং, এ-অবস্থায় হযরত মুকাতিল রহ. স্পষ্ট বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচ্য। বিশেষজ্ঞদের ঝোঁকও এদিকেই রয়েছে যে, কুরআন মাজিদে বর্ণিত ঘটনাটি ইউসুফ যু-নাওয়াসের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

আল্লামা ইবনে কাসির বলেন—

وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد، عليهما من الله السلام، وهو أشبه، والله أعلم.

"মুহাম্মদ বিন ইসহাক যে-ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, (আসহাবুল উখদুদের) এই ঘটনা হযরত ইসা আ. ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যবর্তী 'ফাতরাত' বা নবীর আগমন বন্ধ থাকার সময়ে ঘটেছিলো। এবং এটাই যুক্তিসম্মত।"[১১৩]

قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس –وكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا –هو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من عشرين ألفا.

"আসহাবুল উখদুদের ঘটনায় ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, যু-নাওয়াসই—সে ছিলো সর্বশেষ হিমইয়ারি বাদশাহ, এবং মুশরিক ছিলো—আসহাবুল উখদুদদের (সত্যধর্মাবলম্বী মানুষদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে) হত্যা করেছিলো। তারা ছিলো নাসারা। তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় বিশ হাজার।"[১১৪]

আর শাহ আবদুল কাদির (নাওওরাল্লাহু মারকাদাহু)-ও এই বক্তব্যকেই প্রণিধান করেন। এই দুই মনীষী (আল্লামা ইবনে কাসির ও শাহ আবদুল

---

[১১৩] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৫।
[১১৪] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৯।

কাদির) যু-নাওয়াসকে মুশরিক বলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, যু-নাওয়ার তাঁর পিতৃপুরুষের ইহুদি ধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

তা ছাড়া যুক্তিও এটাই বলে যে, কুরআন মাজিদে বর্ণিত কাহিনি নাজরান ও যু-নাওয়াসের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। কারণ, এ-প্রসঙ্গে বর্ণিত ঘটনাবলির মধ্যে নাজরানের ঘটনাটিই সময়ের বিবেচনায় খুব নিকটবর্তী এবং অঞ্চলের বিচারেও একেবারে আরবের ভেতরের ঘটনা। সুতরাং, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবের অধিবাসীরা অবশ্যই এই ঘটনা সম্পর্কে জেনে থাকবে। সত্য ও মিথ্যার বিভিন্ন লড়াইয়ের মধ্য থেকে তাদের উপদেশ ও নসিহত প্রদানের জন্য কুরআন মাজিদ এ-ঘটনাটিই বর্ণনা করেছে। এটি ছাড়া আর যেসব ঘটনা আছে সেগুলো অতি প্রাচীনকালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা আরবের বাইরের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, (নাজরানের) এই ঘটনাটির জায়গায় অন্য ঘটনাগুলো প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না।[১১৫]

---

[১১৫] যুগের তত্ত্বজ্ঞানী উস্তাদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) কখনো এমন হয় যে, কোনো একটি আয়াতের শানে নুযুল ঐতিহাসিক বিবেচনায় নির্ধারিত হয়। তারপরও আয়াতের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তাতে এতটা ব্যাপকতা থাকে যে, স্বয়ং শরিয়ত-প্রবর্তক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই জাতীয় অন্যান্য ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে নুযুল বলে দিতেন। তার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হলো সুরা তওবার এই আয়াত— لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ " যে-মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, তা-ই তোমার নামাযের জন্য অধিক যোগ্য।" [সুরা তওবা : আয়াত ১০৮]

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে আয়াতটি কুবার মসজিদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। কিন্তু একবার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, مسجدى هذا। অর্থৎ, আমার এই মসজিদটি (মসজিদে নববি) এই আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্র।

মুহাদ্দিসগণের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই কথার অর্থ এই যে, এ-আয়াতে যেসব বিশেষণের উল্লেখ রয়েছে তা মসজিদে কুবার চেয়ে মসজিদে নববিতেই বেশি পাওয়া যায়। সুতরাং, মসজিদে নববিকেই আয়াতের শানে নুযুল সাব্যস্ত

তুব্বা

সাইলুল আরিমের ঘটনায় 'সাবার' বর্ণনা প্রসঙ্গে তুব্বা ও তাবাবিআর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তারপরও এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, তুব্বা ইয়ামানের হিমইয়ারি বাদশাহদের মধ্যে ওই-সকল বাদশাহর উপাধি ছিলো যারা আড়াইশো বছর ইয়ামানের পশ্চিমাংশে রাজধানী স্থাপন করে আরব, শাম ও ইরাক এবং আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজত্ব করেছিলো। আধুনিক বিশেষণপদ্ধতি অনুসারে হিমইয়ার শব্দটি হুমরাহ (حمرة অর্থাৎ, লালিমা) থেকে নির্গত হয়েছে। তার বিপরীতে সুদানি শব্দটি সাওয়াদ (سواد অর্থাৎ, কালিমা বা কালোত্ব) থেকে গৃহীত হয়েছে। আহলে আরব অর্থাৎ হিমইয়ারিরা হাবশিদের কালো বর্ণের হওয়ার কারণে সুদানি বলতো। এর জবাবে হাবশিরা হিমইয়ারিদের আহমার (লাল) বলতো। এই আহমার শব্দটিই পরবর্তীকালে হিমইয়ার রূপ নিয়েছে। আর তুব্বা (تبع) মূলত হাবশি শব্দ না-কি মূল সামি (সেমিটিক) শব্দ—এ-ব্যাপারে আরব ইতিহাসবিদগণের মত এই যে, এটি আরবি (সামি) শব্দ এবং তুব্বা থেকে মাতবু বা সরদার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ভাষাজ্ঞানীরা বলেন, তুব্বা শব্দটি মূলত হাবশি এবং এর অর্থ হলো প্রতাপশালী, বিজয়ী। আরবি ভাষার সুলতান (سلطان) আর হাবশি ভাষার তুব্বা (تبع) সমার্থবোধক শব্দ।

কুরআন মাজিদ দু-জায়গায় তুব্বা শব্দটির উল্লেখ করেছে : সুরা কাফে এবং সুরা দুখানে। সুরা দুখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুব্বা সম্প্রদায়ের বস্তুগত

কিন্তু রাসুলের বাণীর উদ্দেশ্য বা অর্থ এই নয় যে, ঐতিহাসিক বিবেচনায় এই আয়াতের শানে নুযুল মসজিদে কুবার সঙ্গে কোনো সংশ্লিষ্টতা রাখে না; বরং তা কেবল মসজিদে নববির সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে।

অতএব, আলোচ্য বিষয়টিতে যদি মেনে নেয়া হয় যে, তিরমিযির রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঘটনাকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সুরা বুরুজের আয়াতগুলোর শানে নুযুল বলেছেন, তবে যুক্তি ও বর্ণিত বক্তব্যসমূহের ইঙ্গিত ও সাক্ষ্য এ-বিষয়টিকে স্পষ্ট করছে যে, রাসুলের এই বাণী উদ্দেশ্যের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ রেখে বলা হয়েছে। এই বিবেচনায় নয় যে, ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সুনাতুত তিরমিযিতে বর্ণিত ঘটনাটি সুরা বুরুজের আয়াতগুলোর শানে নুযুল।

শক্তি ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যখন তারা আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণ শুরু করলো তখন আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে নি। তাহলে কুরাইশ—যারা শক্তির বিচারে কিছুতেই তুব্বার সমকক্ষ নয়—কী করে অবাধ্যাচরণ ও বিদ্রোহের পর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে? আর সুরা কাফে অপরাধী সম্প্রদায়গুলোর তালিকায় কেবল তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (سورة الدخان)

"শ্রেষ্ঠ কি তারা না তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদের ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই ওরা ছিলো অপরাধী।" [সুরা দুখান : আয়াত ৩৭]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ () وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ () وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (سورة ق)

"তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো নুহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও সামুদ সম্প্রদায়, আদ, ফেরআউন ও লুত সম্প্রদায় এবং আইকাহর অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সবাই রাসুলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো, ফলে তাদের ওপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে।" [সুরা কাফ : আয়াত ১২-১৪]

আরবের দুটি কাহিনি

আল্লামা ইবনে কাসির বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু বকর বিন আবিদ্‌দুনইয়ার মধ্যস্থতায় মুহাম্মদ বিন জাফর বিন আবু তালিবের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই : তিনি একজন আলেম ব্যক্তি থেকে শুনেছেন, হযরত আবু মুসা আশআরি ইস্পাহান জয় করলেন এবং বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করলেন। তিনি শহররক্ষা প্রাচীরটি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন একদিকে দেয়ালটি একটু ভাঙা। তিনি দেয়াল এই ভাঙা অংশটি মেরামত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মেরামত করে দেয়ার পর দেয়ালটি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, হঠাৎ পড়ে গেলো। পুনরায় মেরামত করা হলো; কিন্তু আবারো ভেঙে পড়ে গেলো। তখন কেউ কেউ বললেন, এখানে কোনো সৎ ব্যক্তির কবর আছে বলে মনে

হচ্ছে। এ-কথা ভেবে দেয়ালের ভিত খোদা হলো। দেখা গেলো, এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাহিত রয়েছে এবং তাঁর হাতে একটি তরবারি রয়েছে। তরবারিটির গায়ে কিছু বাক্য খোদিত আছে। বাক্যগুলোর অর্থ এই : 'আমি হারিস বিন মাদাদ। আমি আসহাবুল উখদুদ (যারা সত্যধর্মাবলম্বীদের পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো) থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি।' আবু মুসা আশাআরি মৃতদেহটিকে বের করে এনে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি দেয়ালটি মেরামত করিয়ে দিলেন এবং দেয়ালটি ঠিক ও অক্ষুণ্ন থাকলো।[১১৬]

হারিস বিন মাদাদ আরবের জুরহাম বংশের একজন বাদশাহ ছিলেন। তিনি নাবিত বিন ইসমাইল আ.-এর বংশধর থেকে মক্কার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়টা হযরত ইসমাইল আ.-এর প্রায় পাঁচশো বছর পরের যুগ। এই হিসেবে আসহাবুল উখদুদের ঘটনা অনেক প্রাচীনকালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। অবশ্য এই রেওয়াতেরটি জীবনচরিতের রেওয়ায়েতের অন্তগর্ত এবং এর সনদ বিচ্ছিন্ন (সনদের মধ্যস্থলে কয়েকজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই)। সুতরাং, এই রেওয়ায়েতের মর্যাদা গল্প-কাহিনির চেয়ে বেশি কিছু নয়। তারপরও যদি এই ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয়, তবে হতে পারে, এটি ওইসব ঘটনার একটি ঘটনা যার উল্লেখ কুরআন মাজিদে নেই, কিন্তু তা সুরা বুরুজের আয়াতগুলোর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

এই জাতীয় অন্য একটি ঘটনা বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন হাযাম সনদহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যুগে নাজরানের এক ব্যক্তি ভূমি খনন করছিলো। সে ওখানে একটি কবর দেখতে পেলো। লোকটি কবরের ভেতরে উঁকি দিয়ে একটি লাশকে বসা অবস্থায় দেখতে পেলো। লাশটি তার মস্তককে দুই হাতে ধরে রয়েছে। লোকেরা হাত দুটি মস্তক থেকে সরিয়ে দিলে তা থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। আবার হাত দুটি যথাস্থানে রাখামাত্র রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো। লাশটির হাতে একটি আংটি ছিলো। তাতে খোদিত ছিলো ربى الله 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ'। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে এই ঘটনার সংবাদ জানানো হলো। তিনি জবাবে

[১১৬] তাফসিরে ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড।

লিখলেন, লোকটিকে তার পূর্বাবস্থায় রেখে দেয়া হোক এবং ওই স্থানেই দাফন করে দেয়া হোক। সুতরাং, তা-ই করা হলো। তখনকার লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি ছিলো যে, এই লাশটি ছিলো আবদুল্লাহ বিন তামিরের। রাহেব ও আবদুল্লাহ বিন তামিরের ঘটনাটি ঘটেছিলো নাজরানে। সুতরাং, বিচিত্র নয় যে, এ-ধরনের ঘটনা ওখানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। খ্রিস্টানরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই জাতীয় ঘটনা খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রচার করছে।

তাফসিরের কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয়

এক.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ () وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ () وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (سورة البروج)

"শপথ বুরুজবিশিষ্ট আকাশের এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—"

কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলোতে কসমের অর্থবোধক واو রয়েছে। এই আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআন মাজিদের বিভিন্ন সুরায় বিভিন্ন বস্তুর কসমের উল্লেখ রয়েছে। সাধারণভাবে এ-ধরনের স্থানে তাফসিরের ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, যেভাবে আমরা পরস্পরের মধ্যে শপথ করে থাকি বা কসম খেয়ে থাকি বা এমন বিষয়ের কসম খেয়ে থাকি যা আমাদের জন্য অনেক বেশি সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত, যেমন, পিতা, উস্তাদ, পির, নবী বা আল্লাহর নামে কসম, অথবা, এমন বিষয়ের কসম খেয়ে থাকি যা আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রিয়, যেমন, সন্তানের কসম বা প্রিয়জনের কসম—এইভাবে আল্লাহ তাআলাও কুরআন মাজিদে অনেক কসম খেয়েছেন বা শপথ করেছেন। এটা বুঝার পর আবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার কসম খাওয়ার প্রয়োজন কী? কসম তো কেবল এইজন্য খাওয়া হয় যে, আমাদের কথার প্রতি শ্রোতার মনে যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তবে আমরা যে-বস্তুকে সম্মান করি বা যে-বস্তু আমাদের কাছে খুব প্রিয়, তার মর্যাদা বা ভালোবাসাকে মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করে নিজেদের সত্যতাকে দৃঢ় ও সংশয়মুক্ত প্রমাণ

করি। আর আল্লাহ তাআলার সত্তার চেয়ে কেউ বা কিছু শ্রেষ্ঠ নয় এবং তিনি তাঁর সত্যতাকে দৃঢ় প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রিয় বা প্রিয়তম বস্তুর মুখাপেক্ষীও নন। সুতরাং, কুরআন মাজিদের এসব কসমের অর্থ কী?

তা ছাড়া যে-ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখে সে তো এই মত পোষণ করে যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই— وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا 'ভাষণে আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে?' নাউযুবিল্লাহ, যে-ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তার জন্য এসব কসম তো নিষ্ফল (কারণ, সে তো বিশ্বাসই করে না)। সুতরাং, কুরআন মাজিদে উল্লেখিত কসমসমূহের অর্থ কী?

প্রকৃত সত্য এই যে, কুরআন মাজিদের এসব স্থানে কসমের واو বা কসমের অন্য শব্দ দ্বারা কসমের অর্থ বুঝা (সাধারণ কসম খাওয়ার অর্থ গ্রহণ করা) এবং কসমের واو বা কসমের অন্য শব্দের পর যেসব বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো থেকে—সাধারণত যেভাবে আমরা পিতা বা পুত্র বা নিজের চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল বা প্রিয় বস্তুর কসম খেয়ে থাকি, একইভাবে আল্লাহ তাআলাও কসম খেয়েছেন—এই উদ্দেশ্য নির্ণয় করা একইবারেই ভুল ও ভ্রান্তিমূলক এবং আরবি ভাষায় কথোপকথন সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ। কেননা, আরবি ভাষায় কথোপকথনে যেখানে কোনো বস্তুকে কথার দৃঢ়তাস্বরূপ বা সাক্ষ্যস্বরূপ বা প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়, এসব স্থানেও কসমের واو ব্যবহৃত হয়। এমন ক্ষেত্রে কসমের واو টি দৃঢ়তাব্যঞ্জক واو হয়। কখনো বক্তার পক্ষ থেকে এমন কথা বলা

হয় যা বুঝা শ্রোতার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত মুশকিল যতক্ষণ না ওই কথা প্রসঙ্গে সাক্ষ্য পেশ করা হয় যা ওই কথাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। এসব ক্ষেত্রেও কসমের واو-এর সঙ্গে এমনসব বিষয় বর্ণনা করা হয় যেগুলো বক্তা শ্রোতার সঙ্গে যে-বিষয়ে আলোচনা করছে তাকে শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে দিতে সাহায্য করে। এ-ধরনের ব্যবহারে واو কসমের টি সাক্ষ্যবোধক واو হয়। সুতরাং, যেসব জায়গায় কসমের واو-কে (বা

কসমের অন্যকোনো শব্দকে) বাক্যের দৃঢ়তাকরণ বা সাক্ষ্যের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এসব জায়গায় কসমের واو বা কসমের অন্যকোনো শব্দের পরে যেসব বস্তুর উল্লেখ করা হয় তার জন্য জরুরি নয় যে, তা বক্তার কাছে সম্মানিত ও মর্যাদাবান বা প্রিয় হবে; বরং দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত যে-বস্তু বক্তার উদ্দেশ্য—বিষয়বস্তুর দৃঢ়তাকরণ ও সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য ফলপ্রসূ এবং স্থানের অবস্থানুরূপ হয় তা বর্ণিত হওয়াই আবশ্যক।

অতএব, কুরআন মাজিদের যেসব স্থানে কসমের واو বা কসমের অন্য শব্দ দ্বারা বাক্য শুরু করা হয়েছে সেসব স্থানে কসমের সাধারণ অর্থ (শপথ করা) উদ্দেশ্য নেয়া সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রষ্টতামূলক। আরবি ভাষায় কথোপকথনের রীতি অনুসারে তাদের অধিকাংশ স্থানে কসমের واو সাক্ষ্যের অর্থে এবং কোনো কোনো স্থানে দৃঢ়তাকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন, সুরা আত-তীনে এ-কথা বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বের জগতে মানবজাতিকে সর্বোত্তম সৃষ্টি বানিয়েছেন। মানবজাতি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং সৎ কাজের মাধ্যমে তার মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখে। কিন্তু যেসব মানুষ বুদ্ধি-বিবেক ও উপলব্ধির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করেছে তারা লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এই দুটি বিষয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে হৃদয়াঙ্গম হচ্ছিলো না। কেননা, বিশ্বজগতে মানবজাতির চেয়ে শক্তিশালী, বলবান, বিশালদেহ, প্রশস্ত ও বিস্তৃত অনেক সৃষ্টি রয়েছে। যেমন, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী ইত্যাদি। তা ছাড়া মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী; কিন্তু জগতের কোনো বস্তু বা প্রাণী মানুষের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং, এটা কী করে বিশ্বাস করা যায় যে, একটি দুর্বল-দেহ এবং প্রতিটি বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী সৃষ্টি তার গঠনের দিক থেকে জগতের সবকিছু থেকে উত্তম হবে? আর এটা যদি মেনেও নেয়া হয়, তবে সুন্দরতম গঠনের সম্মানে সম্মানিত হওয়ার পর অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অর্থ কী? এই সূক্ষ্মতম বিষয়বস্তুকে বুঝানোর ও

বোধগম্য করার জন্য কুরআন মাজিদ প্রথম তিনটি ঘটনাকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করেছে। তারপর মূল বিষয়বস্তুকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে।

কুরআন বলেছে—

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ () وَطُورِ سِينِينَ () وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (سورة التين)

"শপথ তীন[১১৭] ও যাইতুন-এর, শপথ সিনাই পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর.... ।"

কোনো বস্তুর أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ বা সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি হওয়ার মানদণ্ড তার দৈহিক শক্তি বা বিশালত্ব এবং প্রয়োজন থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া নয়; বরং জ্ঞান-বুদ্ধি, অনুভূতি, বোধশক্তি, কর্মস্পৃহার বিদ্যমানতাই উত্তম হওয়ার জন্য সঠিক মানদণ্ড। সে এসব গুণের মাধ্যমে তার মধ্যে অর্পিত বিপরীতমুখী শক্তিগুলোর ভারসাম্য ঠিক রাখার ফলে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি থেকে পৃথক ও সম্মানিত হয়। এসব গুণ কেবল মানুষের মধ্যেই অর্পণ করা হয়েছে; বিশ্বজগতের অন্যান্য সৃষ্টি এসব গুণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ-গুণাবলির কল্যাণে মানুষ খারাপ কাজ ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষিত থাকে এবং সততা ও হেদায়েতের পথে চলে তার স্রষ্টার পরিচয় লাভ করে এবং চিরকালীন ও অনন্ত মুক্তি ও সাফল্য লাভ করে। পৃথিবীতে সত্যপথ প্রদর্শন এবং আল্লাহর সৃষ্টিজগতে তাঁর সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর যে-বিরাট ও বিপুল সম্মান সেটাও মানুষের জন্যই নির্দিষ্ট।

আপনি যদি অতীতকালের ইতিহাস পাঠ করেন তবে আপনি সহজেই এই সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। যেমন, শাম (বাইতুল মুকাদ্দাস)-এর যে-স্থানে প্রচুর পরিমাণে আঞ্জির ও যাইতুন বৃক্ষ ও বাগান পাওয়া যায় তা এ-কথার সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, এই স্থানে আল্লাহ তাআলার সত্যিকার পথপ্রদর্শক জন্ম নিয়েছে। তাঁর নাম ইসা তনয় মারইয়াম। তিনি পবিত্রতার সঙ্গে মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং সত্যের শিক্ষা প্রদান করেছেন।

আপনি তার চেয়েও অতীতকালের ইতিহাস পাঠ করুন—তুরে সাইনা বা সাইনা পর্বত এ-কথার সাক্ষ্য দেবে যে, মুসা আ. তাঁর ওপর কতবার আল্লাহ তাআলার বাণী শ্রবণ করেছেন এবং ওখান থেকে নবুওতের

---

[১১৭] এক জাতীয় বৃক্ষ ও তার ফল উভয়কেই তীন বলা হয়।

সম্মান লাভ করে বনি ইসরাইলকে ফেরআউনের দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি শিক্ষা প্রদান করেছেন যে, মানবজাতির মধ্যে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, সবাই সমান।

এতদূর যাওয়ার দরকার কী! আপনি বালাদে আমিন বা নিরাপদ নগরী মক্কা শরিফকে জিজ্ঞেস করুন, সেই সাক্ষ্য দেবে যে, তার কোলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ট নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আরবের তৃণলতাহীন মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বাবাসীকে সত্য ও সততা এবং ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের শিক্ষা শুনিয়েছিলেন এবং আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন।

কী, এই তিনজন পবিত্র ব্যক্তিত্ব কি মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিলেন? আর বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শনের তাঁরা যে-কর্ম সম্পাদন করেছেন তা চাঁদ, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী, এমনকি জিন ও ফেরেশতাও সম্পন্ন করতে পারতো কি? না, কখনো না। সুতরাং, অতীতকালের এসব সাক্ষ্য যদি সঠিক ও সত্য হয়, তবে এ-কথা স্বীকার করতে ইতস্ততবোধ হবে কেনো যে, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'নিশ্চয় আমি মানুষকে (দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে) সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।'[১১৮] আর বিষয়টি যখন এ-রকমই তখন এটাও মেনে নিতে হবে যে, যখন মানুষ এ-সকল পবিত্র আত্মার প্রদর্শিত কর্মপন্থা মেনে চলে না এবং তাঁদের হেদায়েতের পথ থেকে বিমুখ হয়ে খারাপ কাজ ও পথভ্রষ্টতাকে তাদের জীবনাচরণ বানিয়ে নেয়, তখন নিশ্চিতভাবে তারা মনুষ্যত্বের মানদণ্ড থেকে নিচে পতিত হয়। পরিণামে তারা লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

"তারপর আমি তাদেরকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি (তারা তাদের কর্মদোষে অবনতির নিম্নস্তরে পৌছে)।"[১১৯]

---

[১১৮] সুরা আত-তীন, আয়াত ৪।
[১১৯] সুরা আত-তীন, আয়াত ৫।

তবে হ্যাঁ, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সৎ কাজ করে—ইসলামকে আপন কর্মপন্থা বানিয়ে নিয়ে তার মনুষ্যত্বের সম্মান ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অগুনতি প্রতিদান, বিনিময়, সওয়াব ও কর্মফলের সফলতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন

“কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।”[১২০]

এই হলো কুরআন মাজিদে বর্ণিত কসমের অর্থ; উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে তা প্রকাশ পাচ্ছে। কুরআন মাজিদে বিবৃত অন্য কসমগুলোও একইভাবে সংশ্লিষ্ট সুরায় বর্ণিত বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য অবস্থা অনুযায়ী সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোনো কোনো স্থানে মূল বিষয়কে দৃঢ়করণের কাজ সম্পন্ন করছে।

উল্লিখিত বিবরণের পর সুরা বুরুজের কসমগুলোর তাফসির অতি সহজেই বুঝে আসতে পারে। সুরা বুরুজে কয়েকটি বস্তুকে কসমের واو-এর সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে : ১. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ—বুরুজবিশিষ্ট আকাশমণ্ডলী; ২. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ—প্রতিশ্রুত দিবস (কিয়ামতের দিন); ৩. وَشَاهِدٍ—জুমার দিন বা ওইসব ব্যক্তি যারা উপস্থিত ও বিদ্যমান; ৪. وَمَشْهُودٍ—আরাফাতের দিন বা প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যারা এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই কয়েকটি বস্তুর উল্লেখের পর বলা হয়েছে—

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ () النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ () إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (سورة البروج)

“ধ্বংস হয়েছিলো কুণ্ডের অধিপতিরা—ইন্ধনপূর্ণ যে-কুণ্ডে ছিলো অগ্নি, যখন তারা তার পাশে উপবিষ্ট ছিলো।”

অর্থাৎ, বাতিলের যেসব অনুসারী পরিখা ও গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়েছিলো এবং মুমিনদেরকে আল্লাহর ইবাদত করার কারণে ওই আগুনে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলো। তারা তখন অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে এই পৈশাচিক কর্মের তামাশা দেখছিলো। তারা তাদের এই হীন

---

[১২০] সুরা আত-তীন, আয়াত ৬।

কুকর্মের জন্য বেশি দিন গর্ববোধ করতে পারে নি। পরিণামে, এই জালিম অত্যাচারীদের ভাগেই এসেছিলো ধ্বংস ও লাঞ্ছনা; আর মজলুম ও অত্যাচারিতরাই লাভ করেছিলো অনন্ত আনন্দ ও সাফল্য।

উল্লিখিত ঘটনাটিকে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তার একটি এই, পৃথিবীর বুকে কোনো এক স্থানে এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে। দ্বিতীয় বিষয়টি এই, পরিণামে জালিমেরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মজলুমেরা সফলতা ও কামিয়াবি লাভ করেছে। প্রথম বিষয়টি ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর দ্বিতীয় বিষয়টি হয়তো অতীতকালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা ভবিষ্যৎকালের সঙ্গে। সুতরাং, শ্রোতার মনে এ-কথাটি বদ্ধমূল করে দেয়ার দরকার ছিলো যে, এমন ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে। আর যখন এমনটা ঘটেছে তখন তার পরিণাম জালিমদের জন্য ক্ষতিকরই হয়েছে। মূলত এই উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্য কসমের واو দ্বারা বাক্য শুরু করা হয়েছে—'কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশমণ্ডলী এ-বিষয়ের সাক্ষী যে, এই নীলবর্ণ আকাশের নিচে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে। আর কিয়ামত দিবসও যখন প্রতিটি সত্য ও মিথ্যার যথাযথ মীমাংসা হবে এ-বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হৃদয়বিদারক ঘটনার পরিণাম জালিমের জন্য খুব খারাপই হয়েছে। যেসব লোক ঘটনার সময় ওখানে উপস্থিত ছিলো তারা এবং এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জালিম ও মজলুমেরাও এ-ব্যাপারে সাক্ষী যে, পরিখা খনন করে আগুনে পুড়িয়ে যারা মানুষ মেরেছিলো, নিঃসন্দেহে তারা পরিণাম হয়েছে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা।'

অথবা বলা যেতে পারে—কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশ, যা তার বিস্ময়কর সৃষ্টিনৈপুণ্য এবং গ্রহরাশি ও নক্ষত্ররাজির দ্বারা সুশোভিত হয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্বের অঙ্গীকার করছে; আর কিয়ামত দিবস, যে-দিবসে এক আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা ও শক্তি থাকবে না এবং যেখানে ঘোষণা করা হবে— لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই, যিনি এক, পরাক্রমশালী"[১২১]; আর জুমআর দিন, যেদিন প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদাবনত হয়ে তাঁর একত্বের ঘোষণা করে; আর আরাফাতের দিন,

---

[১২১] সুরা মুমিন : আয়াত ১৬।

যেদিন প্রতিবছর একবার পৃথিবীর সব মুসলমান এক আল্লাহর ইবাদত করে—এসব বিষয় এ-কথার সাক্ষী ও প্রমাণ যে, আসহাবুল উখদুদ তাদের জুলুমের পরিণামে বিফল হয়েছে এবং ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। কেবল তারাই নয়, প্রত্যেক জালিমের পরিণামই জাহান্নাম এবং লাঞ্ছনা ও অপমান। আর মজলুমের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই সফলতা ও কল্যাণ রয়েছে। এ-কথাটিকে প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনারও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমরা সামুদ ও ফেরআউনের ঘটনা ও পরিণামে চিন্তা-ভাবনা করো এবং অতীতকালের ইতিহাসে সংরক্ষিত তাদের শিক্ষামূলক কাহিনি পাঠ করো, যাতে তোমাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সুরা বুরুজে যে-বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে তার প্রতিটি সঠিক ও সত্য।

আসহাবুল উখদুদের কি ফেরআউন ও সামুদ সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি শক্তি ও ক্ষমতা ছিলো? যখন আসহাবুল উখদুদ আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে অবাধ্যাচরণ ও বিদ্রোহ করে মজলুম ঈমানদারদের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছিলো এবং তার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলার কঠিন পাকড়াও তাদেরকে অসহায়ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলো, তখন পৃথিবীর কোনো শক্তি বা স্বয়ং তাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি কি তাদের কোনো কাজে এসেছিলো এবং তাদেরকে কি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পেরেছে? যেমন, কুরআন মাজিদ বলছে—

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ () فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ () بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ

(سورة البروج)

"তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত ফেরআউন ও সামুদের? তবু কাফেররা মিথ্যা আরোপ করায় রত; এবং আল্লাহ তাদের অলক্ষে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সুরা বুরুজ : আয়াত ১৭-১৯]

দুই.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ-এর برج[১২২] শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ তিনটি অর্থ বলেছেন : ১. এখানে বড় বড় গ্রহ ও নক্ষত্র উদ্দেশ্য; ২. কক্ষপথ তা

সংখ্যায় বারেটি। প্রাচীন ইলমুল হাইয়াতের হিসেবে সূর্য প্রতিটি কক্ষপথ পূর্ণ একমাসে প্রদক্ষিণ করে এবং চাঁদ পূর্ণ দুই দিন ও একদিনের একতৃতীয়াংশে ঘুরে আসে এবং দুই রাত অবগুণ্ঠিত থাকে; এবং সূর্য ও চাঁদ বছর ও মাস রচনা করে। ৩. بروج বলতে আকাশের ওপর প্রহরী ফেরেশতাদের জন্য যেসব দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে তা উদ্দেশ্য।

আমাদের মতে এই তিনটি অর্থের দ্বিতীয়টি কুরআন মাজিদের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। কারণ, ইলমুল হাইয়াতের হিসাব সঠিক হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, আজকের উৎকর্ষমণ্ডিত ইলমুল হাইয়াত প্রাচীন গ্রিক ইলমুল হাইয়াতকে অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ দর্শনের সীমা পর্যন্ত পুরাতন পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। আর বাতলিমুসের প্রদত্ত কক্ষপথ-সম্পর্কিত শৃঙ্খলার ধারণা কাহিনিতে পরিণত হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় অর্থ দুটির মধ্যে প্রথম অর্থটিকে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, বড় বড় গ্রহ ও নক্ষত্র প্রহরী ফেরেশতাদের বাসস্থান, তবে প্রথম ও তৃতীয় অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

তিন.

وَشَاهِد وَمَشْهُوْد-এর তাফসিরে উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবা ও তাবেঈন থেকে বিভিন্ন বক্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে : ১. شَاهِد (দর্শক) বলতে জুমআর দিবস, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মানুষ অথবা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য; ২. مَشْهُوْد (দৃষ্ট) দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফাত, কিয়ামত বা জুমআ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রণিধানযোগ্য মত হলো, شَاهِد (দর্শক)-এর অর্থ জুমআ এবং مَشْهُوْد (দৃষ্ট)-এর অর্থ আরাফাত। কেননা, প্রতি সপ্তাহে জুমআর দিন আসে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়।

ইবনে জারির তাবারি রহ. এমন একটি রেওয়ায়েত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তা এই যে—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم الموعود يوم القيامة و أن الشاهد يوم الجمعة و أن المشهود يوم العرفة.

“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اليوم الموعود অর্থাৎ প্রতিশ্রুত দিবস কিয়ামতের দিন এবং الشاهد (দর্শক) জুমআর দিন আর المشهود (দৃষ্ট) আরাফাতের দিন।”

চার.

কিয়ামতের দিন আসহাবুল উখদুদের যে-শাস্তি হবে তার ব্যাপারে কুরআন মাজিদ জাহান্নামের আযাবের সঙ্গে عَذَابُ الْحَرِيقِ বা দহন যন্ত্রণাময় শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছে। এর দ্বারা জাহান্নামের আযাবই উদ্দেশ্য। তবে ‘যে-জাতীয় পাপ সেই জাতীয় শাস্তি’র নিয়ম অনুসারে এটিকে অগ্নিময় বা দহনযুক্ত শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অথবা জাহান্নামের মধ্যে বিশেষ দহনযুক্ত শাস্তি উদ্দেশ্য। এটাই হাফেয ইবনে কাসির রহ.-এর মত। আর হযরত শাহ আবদুল কাদির (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) এর অর্থ বলেছেন, আখেরাতে জাহান্নামের আযাব এবং দুনিয়াতে আগুনে পোড়ার আযাব। খুব সম্ভব, এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ওই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা যা আমরা ইবনে আবি হাতিমের রেওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করেছি।

উপদেশ ও শিক্ষা

এক.

মানুষ যখন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহ তাআলার ভয় থেকে বেপরোয়া যায় এবং ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার মোহ তাকে দম্ভ ও আত্মপ্রবঞ্চনার শিখরে পৌঁছে যে, যার ওপর আরোহণ করে তার দৃষ্টিতে আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টি তুচ্ছ ও হীন মনে হয়, তখন সে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি এবং সৎ প্রেরণা থেকে দূরে সরে যায় এবং নিজের সত্তা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। ফলে অকস্মাৎ আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে, তখন তা ওই ব্যক্তিকে উপর থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেয় এবং হীনতা ও লাঞ্ছনার অন্ধকারাচ্ছন্ন অতল গহ্বর ছাড়া তার জন্য আর কোনো জায়গাই অবশিষ্ট থাকে না। انا ربكم الأعلى ‘আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক’ ঘোষণাকারী প্রকৃত

প্রতিপালক ও রবের এমন পাকড়াও-এর মধ্যে চলে, তখন বিশ্বের কোনোও শক্তি তার কাজে আসে না; পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও প্রতাপ-প্রতিপত্তিও তার কাজে আসে না। ফলে মস্তক অবনত করে এই স্বীকারোক্তি দিতে হয় যে, إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ 'নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড় কঠিন।'[১২৩]

দুই.

মানুষ মানবিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের ফলেই সত্যিকার মানুষ হয়ে থাকে। অন্যথায় সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। আর মানবতার দাবি এই যে, মানুষ যখন সব ধরনের ধন-ঐশ্বর্য ও জীবনোপকরণের অধিকারী হয় এবং ক্ষমতা ও প্রতাপ লাভ করে, তখনো যেনো আল্লাহ ও আল্লাহর ভয় থেকে দূরে সরে না যায়। মরহুম কবি যাফর কত সুন্দরই না বলেছেন—

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خدا نہ رہا

"যাফর, তুমি ওই ব্যক্তিকে মানুষ মনে করো না, যে-ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে না এবং ক্রোধে আল্লাহর ভয়কে মনে স্থান দেয় না"

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الأعراف)

"এবং স্মরণ করো (আল্লাহর এই অনুগ্রহকে যে), আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন (সচ্ছলতা ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন)। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৬৯]

অন্য সুরায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

---

[১২৩] সুরা বুরুজ : আয়াত ১২।

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

'স্মরণ করো, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৭৪]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

"আমি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১০]

তিন.

মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করে এবং ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে, তখন পৃথিবীর বিশাল থেকে বিশালতম শক্তি এবং ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম অত্যাচারও তাকে সত্য ও সততা থেকে পদচ্যুত করতে পারে না। সে দৃঢ়তার পাহাড় হয়ে ওঠে এবং কুরবানি ও আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি প্রমাণিত হয়। আসহাবুল উখদুদের ঘটনা তার জীবন্ত প্রমাণ।

চার.

'যে-জাতীয় কর্ম সেই জাতীয় বিনিময় বা প্রতিদান' আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট বিধান। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, জালিম ও অহঙ্কারী থেকে জুলুম ও অহঙ্কার সংঘটিত হওয়ামাত্রই সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলার দয়াগুণের বিধান অনুযায়ী এখানে অবকাশ প্রদানের নিয়মও সমানভাবে কার্যকর রয়েছে। অবশ্য যখন অকস্মাৎ পাকড়াও করা হয় তখন পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব।

আসহাবুল ফিল

[৫৭১ খ্রিস্টাব্দ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মবছর 'আমুল ফিল']

হাব্‌শ

সাবার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাবা রাজ্যের পরিধি দক্ষিণ আরব থেকে শুরু করে উত্তর আরব ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ইতিহাসবিদগণ বলেন, ইয়ামান ও আফ্রিকার মধ্যস্থলে লোহিত সাগর ও আরব সাগরের যে-বাঁকগুলো অন্তরাল হয়ে আছে তাকে হাব্‌শ সাগর বলা হয়। ইয়ামানের সম্মুখবর্তী হাবশ সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার তীরবর্তী অঞ্চলে যে-জনপদগুলো ছিলো তা মূলত সাবার বাণিজ্যিক উপনিবেশ ছিলো। এই ভূখণ্ডকে আরব ভূগোলবিদরা হাব্‌শ বলে থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগুলোর কাছে তা আবিসিনিয়া, গ্রিকদের কাছে ইথিওপিয়া এবং স্বয়ং হাবশিদের কাছে তা জিয নামে পরিচিত। আরবি অভিধানে হাব্‌শ শব্দের অর্থ সংমিশ্রণ ও মেলামেশা।[১২৪] আরব ইতিহাসবিদদের মতে হিমইয়ার (সাবা) এবং হাবশার মূল অধিবাসীদের সংমিশ্রণে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটেছে। তাই তারা এই সম্প্রদায়ের জন্য এই নাম মনোনীত করেছেন।[১২৫]

বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, হাবশার অধিবাসীরা (আকসুম) ইয়ামান আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়ার পর সাবার গোত্রগুলোতে এই বলে বিবাহ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলো যে, তারা মূলত তাই বিন উদাদ (বনি কাহলান)-এর বংশধর এবং সাবারই একটি শাখাগোত্র।[১২৬]

আর ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের মত এই যে, হাবশার অধিবাসীরা (আকসুম) অবিমিশ্র ও সামের মূল বংশোদ্ভূত নয়; বরং আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র এসে আসল অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে।[১২৭]

যাইহোক। এসব কথার সারমর্ম এই যে, আফ্রিকান গোত্রগুলো (বনি হাম বিন নুহ)-এর সঙ্গে সাবায়ি আরব গোত্রগুলো (বনি সাম বিন নুহ)-এর সংমিশ্রণে হাব্‌শ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে।

---

[১২৪] حبش الشيء : কোনোকিছু জমা করলো, সঞ্চয় করলো। حبش-এর বহুবচন الأحابيش : বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সমবেত দল।

[১২৫] দায়িরাতুল মাআরিফ, পিটার্স বুস্তানি এবং দায়িরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ [হাবশ ও সাবা]

[১২৬] আল-কাসদু ওয়াল উমাম, ইবনে আবদুল বার রহ. পৃষ্ঠা ২৬।

[১২৭] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৬২৮, [সাবা]।

আকসুম শহর ছিলো এই সংমিশ্রিত সাবায়ি জাতির রাজধানী। এটি হাব্‌শ রাজ্যের তাজরিয়ে প্রদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। আজ পর্যন্ত এই শহরটি ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে। হাব্‌শবাসীরা আকসুমকে পবিত্র শহর বলে মনে করে।[১২৮]

বলা হয়ে থাকে যে, যে-যুগে হিমইয়ার রিদানের দুর্গে তাঁর রাজত্বের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন, ওই সময়েই হাব্‌শিরা আকসুমে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। তা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ সাল থেকে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

নাজ্জাশি

আরবেরা হাবশার বাদশাহকে নাজ্জাশি উপাধি দিয়ে থাকে। মূলত এটি হাব্‌শি শব্দ 'নাজুস'-এর আরবিরূপ। হাব্‌শি ভাষায় নাজুস শব্দের অর্থ বাদশাহ। বিখ্যাত নাজ্জাশি আসমাহা বিন আবজার ওইসব সৌভাগ্যবান বাদশাহর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ পেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। নাজ্জাশি আসমাহর যুগেই মুসলমানগণ প্রথম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। কুরাইশের প্রতিনিধি হাবশায় গমন করে আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান মুহাজিরগণকে তাদের হাতে সোপর্দ করে দিতে অনুরোধ জানালে আসমাহা তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত জাফর বিন আবু তালিব রা. ইসলামের সত্যতা ও ইসলামের হাকিকত তুলে ধরে নাজ্জাশির দরবারে হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে প্রভাবিত হয়ে নাজ্জাশি আসমাহা সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই নাজ্জাশির সঙ্গে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিলো এবং এই নাজ্জাশিরই মৃত্যুতে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবানা জানযার নামায পড়েছিলেন। নাজ্জাশি আসমাহার মৃত্যু সম্পর্কে ওহিপ্রাপ্ত হয়ে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

---

[১২৮] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, নবম সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭, [সাবা]।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

হাবশার ধর্ম ও সংস্কৃতি শুরু থেকেই মিসরের (আরবের) ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। এ-কারণে হাবশার সংস্কৃতি প্রায় আরবদেরই সংস্কৃতি। আর ধর্মীয় দিক থেকে এই বংশধরেরা শুরুতে মিসর ও ইয়ামানের গোত্রগুলোর মতো মূর্তিপূজারী ছিলো। কিন্তু রোমান সম্রাটদের প্রভাবে মিসরীয়রা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলো। তার প্রভাব হাবশার ওপরও পড়ে এবং ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে নাজ্জাশি উযনিয়াহ প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

হাব্‌শ ও ইয়ামানের সঙ্কট

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোম ও ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও শত্রুতামূলক সঙ্কট ইয়ামান ও হাবশাকেও প্রভাবিত না করে ছাড়ে নি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুটি রাজ্যের মধ্যেও বিবাদ সৃষ্টি করেছিলো। ফলে ইয়ামান ও ইরানকে একদিকে দেখা যায় আর হাবশা ও রোমকে দেখা যায় অন্যদিকে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, যখন হাবশায় খ্রিস্টধর্ম আত্মপ্রকাশ করলো, তার কাছাকাছি সময়েই ইয়ামানে ইহুদি ধর্ম প্রভাব বিস্তার করলো। সে-যুগে খ্রিস্টধর্মের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে আরববাসীরা খ্রিস্টধর্মকে পছন্দ করতো না। ফলে ইয়ামানিরা যখন ধর্মান্তরিত হলো, তারা ইহুদি ধর্মই গ্রহণ করলো, খ্রিস্টধর্মের প্রতি ঝুঁকলো না। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি উযনিয়াহ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। সে-সময় ইয়ামার ও হাবশার মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা তাদের আরো উত্তেজিত করে তুললো। এই উত্তেজনার ফলেই নাজরানে 'আসহাবুল উখদুদ'-এর হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। ইয়ামানের বাদশাহ যু-নাওয়াসের এই হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থনার জন্য নাজরানের একজন সরদার—দাউস বিন তাগলিয়ান হাবশার নাজ্জাশির মাধ্যমে রোমের কায়সার (সম্রাট) ফরিয়াদ পৌছান। রোম সম্রাট হাবশার নাজ্জাশিকে ইয়ামানে আক্রমণ করে হিমইয়ারিদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে—

"খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে হিমইয়ার (যু-নাওয়াস) ইহুদিদের ভীষণ উৎপীড়ন করেন। তৎকালীন রোম সম্রাট প্রথম জেটিনিন হাবশার নাজ্জাশি কালিব আল-আসবাহ্‌কে লিখলেন, তাদের সাহায্য করো। নাজ্জাশি কালিব হিমইয়ারিদের হাত থেকে ইয়ামান ছিনিয়ে নিলেন।"[১২৯]

আল্লামা ইবনে কাসির বলেন, দাউস সরাসরি রোম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়ে সাহায্যের প্রার্থনা করেছিলেন। রোম সম্রাট একটি নির্দেশপত্র দিয়ে তাঁকে নাজ্জাশির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। দাউস রোম সম্রাটের নির্দেশপত্র নিয়ে নাজ্জাশির কাছে পৌঁছার পর নাজ্জাশি সত্তর হাজার সৈন্যসহ ইয়ামান আক্রমণ করেন। যু-নাওয়াস বিরাট বাহিনি নিয়ে নাজ্জাশির আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এলেও পরাজিত হয়। অবশেষে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহণে থেকেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; কিন্তু নদী পার হতে পারে না, ফলে তার সলিলসমাধি ঘটে।[১৩০]

আরব ইতিহাসবিদগণ বলেন, ইয়ামান বিজয়ীর নাম ছিলো আরবাত আর আবরাহা আল-আশরাম ছিলো তার সহযোগী। কিন্তু গ্রিক ইতিহাসবিদগণ বলেন, তার (ইয়ামান বিজয়ীর) নাম ছিলো আসমিফুস আর তৎকালীন নাজ্জাশির (হাবশার বাদশাহর) নাম ছিলো ইলইয়াবাস (আল-আসবাহ্)।

মোটকথা, আরব ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী (যু-নাওয়াসকে পরাজিত করার পর) আরবাত ইয়ামানের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু আবরাহা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাকে হত্যা করে। এভাবে আবরাহা কারো অংশীদারি ব্যতীত ইয়ামানের একচ্ছত্র দখলদার হয়। নাজ্জাশি আল-আসবাহ্ এই সংবাদ পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি শপথ করেন যে, আবরাহাকে হত্যা করে তার রাজধানীকে পদদলিত করবেন।

আবরাহা এসব কথা শুনে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলো। সে তার দেহ থেকে কিছুটা রক্ত বের করে একটি শিশিতে ছিপিবদ্ধ করলো। আর একটি থলিতে ইয়ামানের মাটি ভরলো। জিনিস দুটি দূতের হাতে দিয়ে

---

[১২৯] প্রথম খণ্ড, বিষয় : আবিসিনিয়া।

[১৩০] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৯।

নাজ্জাশির কাছে প্রেরণ করলো। নাজ্জাশিকে লিখে জানালো যে, আরবাত যেভাবে আপনার আজ্ঞাবহ ছিলো, এই গোলামও সবসময় তার মতো আপনার অনুগত ও আজ্ঞাবহ থাকবে। যখন আমি শুনেছি, হুজুরেওয়ালা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, তখন থেকেই আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। আমি আপনার শপথ পূর্ণ করার জন্য আমার দেহের রক্ত ও ইয়ামানের মাটি পাঠালাম। যেনো আপনি এই রক্তকে ইয়ামানের মাটির ওপর ঢেলে পদদলিত করেন এবং আপনার শপথ পূর্ণ করেন। নাজ্জাশি আবরাহাকে ক্ষমা করে দেয়া সময়োচিত মনে করে তার নিবেদন গ্রহণ করলেন এবং ইয়ামানে আবরাহার শাসনক্ষমতার অনুমোদন দিলেন। এইভাবে আবরাহা ইয়ামানে নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করতে লাগলো।[১৩১]

আবরাহা আল-আশরাম

আবরাহা সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের বর্ণনা এই যে, সে রাজবংশের মানুষ ছিলো। কিন্তু তার নাক কাটা ছিলো বলে আরবরা তাকে 'আল-আশরাম' বা 'নাককাটা' বলতো। তার রাজত্বকাল কারো মতে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং কারো মতে ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়। আরদুল কুরআন রচয়িতার মতে দ্বিতীয় মতটি প্রণিধানযোগ্য।

আবরাহা ইবরাহিম শব্দের হাবশি উচ্চারণ। সে খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে অতি উৎসাহী ছিলো। সে তার গোটা রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের অনেক প্রচারক নিযুক্ত করেছিলো এবং রাজ্যের শহরগুলোতে বড় বড় গির্জা নির্মাণ করিয়েছিলো। এসব গির্জার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ গির্জা নির্মাণ করিয়েছিলো রাজধানী সানআ শহরে। আরবরা একে আল-কুল্লাইস (القُلَّيْس) বলতো। শব্দটি গ্রিক কালিসা শব্দের আরবিরূপ।

আল-কুল্লাইস

ইবনে জারির ও ইবনে কাসির মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, স্থাপত্যশিল্পে আল-কুল্লাইস ছিলো অদ্বিতীয় ও তুলনারহিত। এটির নির্মাণকাজ শেষ হলে আবরাহা নাজ্জাশিকে লিখলো, আমি

[১৩১] তারিখে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড।

আপনার জন্য রাজধানী সানআয় একটি তুলনাহীন গির্জা নির্মাণ করেছি। ইতোপূর্বে ইতিহাস এমন গির্জা আর কখনো দেখে নি। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আশপাশের আরবেরা, যারা কা'বাগৃহের হজের জন্য সমবেত হয়ে থাকে, তাদের সবাইকে এই গির্জার প্রতি আকৃষ্ট করা। সমগ্র আরব জাতির জন্য এটাই যেনো হজের স্থান হয়।' আবরাহার এই ঘোষণা শুনে আরববাসীরা ভীষণ অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হলো।[১৩২]

আবদুর রহমান আস-সুহাইলি বলেন, আবরাহা এই গির্জা নির্মাণ করতে ইয়ামানবাসীর ওপর ভীষণ উৎপীড়ন চালিয়েছিলো। তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলো। গির্জার জন্য সে ইয়ামানের অপরিমিত সম্পদ, মহামূল্যবান মণি-মুক্ত ও হীরা-জহরত ব্যয় করেছিলো। এটি ছিলো মূল্যবান দ্বারা নির্মিত অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ এক অট্টালিকা। অট্টালিকাটি স্বর্ণখচিত বিস্ময়কর চিত্রাবলিতে শোভিত ছিলো এবং রত্নখণ্ডে সজ্জিত ছিলো। হাতির দাঁত ও আবনুস (কালো ও সুগন্ধি শক্ত) কাঠের অত্যন্ত সুন্দর ও সৌকর্যময় কারুকাজখচিত মিম্বর এবং সোনা ও রুপার অসংখ্য ক্রুশ দিয়ে গির্জাটি সাজানো হয়েছিলো।[১৩৩]

আসহাবুল ফিল

আরবের ইতিহাস এ-বিষয়ের সাক্ষী যে, আরবের সমগ্র অধিবাসী, চাই তারা যে কোনো দলের হোক আর যে কোনো ধর্মেরই হোক, কা'বা শরিফের খুব সম্মান করা এবং নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে তার হজ পালন করা পবিত্র কর্তব্য মনে করতো। এ-কারণেই বিশেষ করে কা'বার ভেতরে আরবের বিভিন্ন গোত্রের তিনশো ষাটটি মূর্তি রক্ষিত ছিলো।[১৩৪]

---

[১৩২] আল বিদয়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭০।

[১৩৩] الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, আবুল কাসেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আহমদ আস-সুহাইলি, প্রথম খণ্ড; আল বিদয়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭০।
গির্জাটির ধ্বংসাবশেষ প্রথম আব্বাসি খলিফা সিফাহ-এর যুগ পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো।

[১৩৪] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

এমনকি হযরত ইবরাহিম আ., হযরত ইসমাইল আ., হযরত ইসা আ. ও হযরত মারইয়াম আ.-এর ছবিও কা'বাঘরে রক্ষিত ছিলো। মক্কা-বিজয়ের দিন যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীবেশে কা'বা শরিফে প্রবেশ করলন, তখন তাঁর আদেশে হযরত আলি রা. অন্য কতিপয় সাহাবি রা. মূর্তিগুলোকে কা'বাগৃহ থেকে বের করেন। তখনও এই ছবিগুলো কা'বাগৃহে ছিলো। আর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এই আলোচনা করা হলো যে, আরবেরা হযরত ইসমাইল আ.-এর ছবি বানিয়েছে এভাবে যে, তাঁর হাতে পাশা রয়েছে। তখন রাসুল স্যাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুশরিকরা মিথ্যাবাদী। ইসমাইল আ. এ-ধরনের অহেতুক কাজ থেকে পবিত্র ছিলেন।[১৩৫]

যাইহোক। সানআয় অবস্থানকারী একজন হিজাযি শুনতে পেলো যে, আবরাহা উল্লিখিত উদ্দেশ্যে আল-কুল্লাইস গির্জাটি নির্মাণ করেছে। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। এক রাতে সুযোগ পেয়ে (মলমূত্র ত্যাগ করে) ওই গির্জাকে অপবিত্র করে দিলো। আবরাহা সকালে এই সংবাদ শুনতে পেলো এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারলো যে, এক হিজাযি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। সে ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লো। গির্জাটির অপমান দেখে সে রাগে-অপমানে দাপাদাপি করতে থাকলো। সে শপথ গ্রহণ করলো, 'এখন এর প্রতিশোধে আমি ইবরাহিমের কা'বাকে ধ্বংস না করে শান্ত হয়ে বসে থাকবো না।' এই সংকল্প করে আবরাহা এক বিরাট সেনাবাহিনী এবং বিশাল হস্তীযূথ সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করলো।

এই খবর বাতাসের ওপর সওয়ার হয়ে আরবের সব গোত্রের কাছে পৌঁছে গেলো। এই সংবাদের ফলে সমগ্র আরব জাতির মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। প্রথমে ইয়ামানেরই একজন আমির—যু-নাদার ইয়ামান থেকে বের হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে দূত প্রেরণ করে বললেন, আমি আবরাহার মোকাবিলা করতে চাই। আপনাদের উচিত এই পবিত্র উদ্দেশ্যে আমাকে সহযোগিতা করা। তারপর যু-নাদার অগ্রসর হয়ে আবরাহার মুখোমুখি হলেন এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

---

[১৩৫] সহিহ বুখারি, 'মক্কা বিজয়' অধ্যায়।

কিন্তু তিনি পরাজিত হলেন। আবরাহা যু-নাদারকে বন্দি করলো। তারপর খাসআম গোত্রের সরদার নুফাইল বিন হাবিব আল-খাসআমির সঙ্গে আবরাহার মোকাবিলা হলো। কিন্তু নুফাইলকেও পরাজিত হতে হলো। তিনিও আবরাহার হাতে বন্দি হলেন।

আবরাহা তায়েফে পৌঁছার পর বনু সাকিফ গোত্রের সরদার মাসউদ বিন মুআত্তাব এগিয়ে আবরাহাকে আশ্বাস দিলো যে, 'আপনার সঙ্গে আমার ও আমার গোত্রের কোনো বিরোধ নেই। তা এ-কারণে যে, আমরা বিশ্বাস করি, আপনি বাইতুল্লাতকে (বাইতুল্লাহকে)—যাতে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত মাবুদ লাত রক্ষিত রয়েছে—ধ্বংস করার ইচ্ছা রাখেন না।' আবরাহা তাদেরকে এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে নীরবতার সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেলো। মাসউদ সাকাফি আবরাহাকে মক্কার পথ দেখানোর জন্য আবু রিগাল নামের এক ব্যক্তি পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করলো। কিন্তু আবু রিগাল মুগাম্মিস উপত্যকায় গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। বলা হয়ে থাকে যে, জাহেলি যুগে আবু রিগালের কবরের ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হতো। কেননা, সে কা'বাগৃহকে ধ্বংস করার জন্য আবরাহাকে পথ প্রদর্শন করেছিলো।

আবরাহা মুগাম্মিসে পৌঁছার পর হাবশি সেনাপতি আসওয়াদ বিন মাকসুদকে মক্কায় গিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করার নির্দেশ দিলো। আসওয়াদ মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে দেখতে পেলো কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের উট, মেষ ও বকরির পাল মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। এগুলো সংখ্যায় ছিলো অনেক। আসওয়াদ পশুগুলোকে ধরে তার সেনাবাহিনীর কাছে নিয়ে এলো। এতে আবদুল মুত্তালিবেরই দুইশো উট ছিলো।

এই সময় আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের সরদার ছিলেন। এই অবস্থা দেখে কুরাইশ, কিনানা, হুযাইল ইত্যাদি গোত্র পরস্পর পরামর্শ করলো যে, কীভাবে আবরাহার মোকাবিলা করা যায়। পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্ত হলো, মোকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। সুতরাং আমাদের মক্কা ত্যাগ করে নিকটবর্তী পাহাড়ে চলে যাওয়া উচিত। তারা মক্কায় থাকতেই আবরাহার পক্ষ থেকে জানতাহ আল-হিমইয়ারি এসে পৌঁছালো এবং জিজ্ঞেস করলো, মক্কার সরদার কে? লোকেরা আবদুল মুত্তালিবের প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিলো। জানতাহ বললো, 'আমি আবরাহার পক্ষ থেকে এসেছি। আমাদের বাদশাহর আদেশ আপনাদের কাছে এই

পয়গাম পৌঁছে দেয়া যে, আপনাদের কোনো ধরনের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসি নি। আমরা শুধু এই ঘরটি (বাইতুল্লাহ) ধ্বংস করতে এসেছি। সুতরাং, যদি আমাদের মোকাবিলা করার বা আমাদের বাধা প্রদানের ইচ্ছা থাকে, তবে তা আপনাদের বিবেচনা। আর যদি আপনারা আমাদের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে না যান তবে আমাদের বাদশাহ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী।' আবদুল মুত্তালিব বললেন, তোমাদের বাদশাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার আমাদের কোনোও ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া আমাদের সেই ক্ষমতাও নেই। এটা আল্লাহ তাআলার ঘর এবং তাঁর সম্মানিত নবী হযরত ইবরাহিম আ.-এর স্মৃতি। সুতরাং, একে রক্ষা করার ইচ্ছা যদি আল্লাহ তাআলার না হয়, তবে কিছুতেই আমাদের বাধা প্রদানের সাধ্য নেই।'

এই কথোপকথনের পর আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সেনাশিবিরে পৌঁছলেন। এক সভাসদের সুপারিশ ও পরিচয় প্রদানের পর তাঁকে আবরাহার সামনে উপস্থিত করা হলো। আবদুল মুত্তালিব সুন্দর চেহারার ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আবরাহা তাঁকে দেখে তাঁর সঙ্গে খুব সম্মানজনক আচরণ করলো এবং তার সমান আসনে বসালো।

কথাবার্তা শুরু হলে আবদুল মুত্তালিবের প্রাঞ্জল ভাষা ও বাগ্মিতায় আরো প্রভাবিত হলো। কথা বলতে বলতে যখন আসল ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলো, আবদুল মুত্তালিব অভিযোগ করলেন, 'আপনার এক সেনাপতি আমার উটগুলো ধরে নিয়ে এসেছে। আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি আমার উটগুলো আমাকে দিয়ে দিন।' আবরাহা এই কথা শুনে বললো, আবদুল মুত্তালিব, আমি তো তোমাকে খুব বুদ্ধিমান মনে করতাম। কিন্তু আমি তোমার এই আবেদন শুনে বিস্মিত হয়েছি। তুমি জানো আমি কা'বাগৃহ ধ্বংস করতে এসেছি। আর কা'বাগৃহ তোমার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ও পবিত্র। কিন্তু তুমি তার ব্যাপারে একটি কথাও না বলে এমন একটি তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ করলে!' আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'বাদশাহ, উটগুলো আমার মালিকানাধীন। তাই আমি এ-ব্যাপারে আবেদন করলাম। আর কা'বা আমার ঘর নয়; আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর। তিনিই তার রক্ষক। আল্লাহর দরবারে আমার সত্তার কী মূল্য আছে যে আমি কা'বাগৃহ রক্ষার জন্য সুপারিশ করবো।'

আবরাহা বললো, এখন কেউ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।' আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, 'তা আপনি জানেন আর কা'বাগৃহের যিনি মালিক তিনি জানেন।' এই পর্যন্ত এসে তাঁদের কথোপকথন শেষ হলো। আবরাহা নির্দেশ দিলো, 'আবদুল মুত্তালিবের উটগুলো তাঁকে ফিরিয়ে দাও।'

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, বনু বকরের সরদার ইয়ামার বিন নাফাসাহ ও বনু হুযাইলের সরদার খুওয়াইলিদ বিন ওয়াসিলাহ আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গী ছিলেন। ফিরে আসার আগে তাঁরা আবরাহার জন্য এই প্রস্তাব পেশ করলেন, 'আপনি যদি কা'বাগৃহ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকেন, তবে আমরা তিহামা অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ আপনার খেদমতে উপস্থিত করবো।' কিন্তু আবরাহা তার শক্তি ও প্রতাপের মোহে মত্ত থেকে তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো এবং তার সংকল্পে অটল থাকলো। ফলে তাঁরা বিফল হয়ে ফিরে গেলেন।

আবদুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে এসে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের সমবেত করলেন এবং আবরাহার সঙ্গে তাঁর কী আলোচনা হয়েছে সেটা জানালেন। তিনি তাদের সবাইকে পরামর্শ দিলেন, এখন তোমাদের সবাইকে নিকটবর্তী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। যাতে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য চোখে দেখতে না হয়।

মক্কাবাসীরা পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে কা'বাগৃহের পাশে জড়ো হলেন। কা'বার দরজার শিকল ধরে তাঁরা সবাই আল্লাহ তাআলার দরবারে এই প্রার্থনা করলেন—

"হে আল্লাহ, এ-বিষয়ে আমরা চিন্তিত নই, আমরা যখন আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে পারি, তখন তোমার সম্পদ (কা'বা) অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করতে হবে। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ওপর ক্রুশশক্তি জয়ী হতে পারবে না এবং ক্রুশের পূজারীদেরও কোনো সাধ্য নেই। তবে হ্যাঁ, তুমি নিজেই যদি তাদেরকে তোমার ঘর ধ্বংস করতে দাও, তবে আমরা আর কী। তোমার মন যা চায় তুমি তা-ই করো।"

আবদুল মুত্তালিব তাঁর বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যে-কবিতাগুলো আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করেছিলেন, ইতিহাসবিদগণ সেগুলো উল্লেখ করেছেন—

لاهُمَّ إن العبدَ يمنع رَحْله فامنَعْ حلالَكْ

لا يَغلِبَنّ صليبُهم ومحالهم عَدْوًا محالك

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك

"হে আল্লাহ, একজন দাসও তার দলবলকে রক্ষা করে। সুতরাং তুমি তোমার বিধিসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত সম্পদ ও লোকজনকে রক্ষা করো। ওদের ক্রুশ ও শক্তি যেনো তোরা প্রতাপ ও পরাক্রমের ওপর জয়যুক্ত না হয়। আমাদের কিবলাকে যদি তুমি শত্রুর করুণার ওপর ছেড়ে দিতে চাও, তা হলে যা খুশি করো।"[১৩৬]

সুহাইলি এর পর আরো একটি পঙ্ক্তি বর্ণনা করেছেন—

وانصرْ عَلَى آل الصَّليبِ وعَابديه اليَومَ آلك

"ক্রুশ-পরিবার ও তার পূজারীদের বিরুদ্ধে আজ তোমার পরিবারকে সাহায্য করো।"

আবদুল মুত্তালিব ও কুরাইশ গোত্রের সব লোক মক্কা ত্যাগ করে নিকটস্থ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কী ঘটনা ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আবরাহা পরের দিন সকালে তার সেনাবাহিনীকে সামনের দিকে অগ্রসর করালো। প্রথম সারিগুলোতে ছিলো হস্তীবাহিনী আর তার পেছনে ছিলো বিরাট পদাতিক বাহিনী। আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় পৌঁছার আগেই পথিমধ্যে অকস্মাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে সৈন্যদের মাথার ওপর শূন্যমণ্ডল ছেয়ে ফেললো। পাখিদের ঠোঁট ও পাঞ্জার নিচে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড ছিলো। পাখিরা সেনাবাহিনীর ওপর ওইসব প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে লাগলো। যার গায়েই ওই প্রস্তরখণ্ড লাগলো, দেহ ছিদ্র হয়ে বের হয়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে যেতে শুরু করলো। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত সেনাবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, এই অবস্থায় কিছুসংখ্যক লোক সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন করে ইয়ামানে ও হাবশায় গিয়ে পৌঁছলো। ওখানে তারা আবরাহা ও তার সেনাবাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ঘটনা শুনালো।

---

[১৩৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

বিখ্যায় মুহাদ্দিস ইবনে আবি হাতিম রহ. উবাইদ বিন উমাইরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হলো। বাতাসের সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে এসে সেনাবাহিনীর ওপর ছেয়ে গেলো। মনে হতে লাগলো, শূন্যমণ্ডলে পাখিদের বিরাট সেনাবাহিনী সারির পর সারি বেঁধে আছে। তাদের ঠোঁটে ও দুই পাঞ্জায় প্রস্তরখণ্ড ছিলো। পাখিগুলো প্রথমে শব্দ করলো। তারপর আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বাতাস প্রবাহিত হলো। তা প্রস্তরবর্ষণকে সৈন্যদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ সৃষ্টি করে দিলো। পাখিদের প্রস্তরখণ্ড যে-সৈন্যের ওপরই পতিত হলো, তার শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেলো এবং দেহ পচে-গলে পড়তে লাগলো। এইভাবে পাখিদের প্রস্তরখণ্ড গোটা সেনাবাহিনীকে ঝাঁঝরা করে দিলো।[১৩৭]

---

[১৩৭] কথিত আছে যে, আবরাহা সেনাবাহিনীকে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়ার পর যখন তারা মক্কার কাছে পৌছলো, তখন হাতিদের সারিতে যে-হাতিটির ওপর আবরাহা আরোহী ছিলো, প্রথমই এটি অগ্রসর করে অস্বীকার করলো। মাহুত হাতিটির ওপর যতই অঙ্কুশের পর অঙ্কুশ মারছিলো এবং মুখে ধমকাচ্ছিলো, হাতিটি কিছুতেই অগ্রসর হচ্ছিলো না। কিন্তু যখন হাতিটিকে ইয়ামানের দিকে চালাতে শুরু করলো, সেটি তীব্রবেগে চলতে শুরু করলো। এই অবস্থায় অকস্মাৎ পাখির ঝাঁক এসে তাদের ঘেরাও করে ফেললো।

যেনো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আবরাহার জন্য সর্বশেষ সতর্কীকরণ ছিলো। যাতে সে বুঝতে পারতো যে, তার সংকল্প ছিলো অপবিত্র ও নিষ্ফল। আর প্রকৃতপক্ষে এই দুঃসাহর ছিলো আল্লাহ তাআলার শক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। সুতরাং এই কাজ থেকে তার বিরত হওয়ার উচিত ছিলো। কিন্তু এই হতভাগা কিছুরই পরোয়া করলো না এবং দুষ্কর্মের প্রতিফলই ভুগলো।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটাও আছে যে, পাখিদের প্রস্তরবর্ষণে আবরাহার সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলেও তাদের কেউ কেউ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে ইয়ামানে গিয়ে পৌছলো। তাদের মধ্যে আবরাহাও ছিলো। তার অবস্থা ছিলো এই যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে-গলে পড়ে গিয়েছিলো। তাকে একটি পচা মাংসপিণ্ড বলে মনে হচ্ছিলো।

অর্থাৎ, খোদায়ি শক্তি যেভাবে ফেরআউনকে ডুবিয়ে দেয়ার পর তার লাশকে তীরে নিক্ষেপ করেছিলো যেনো তা মিসরের কিবতিদের জন্য এবং বনি ইসরাইলের জন্য উপদেশ ও জ্ঞান লাভের উপকরণ হয়, একইভাবে ইয়ামান ও হাবশার অধিবাসীদের উপদেশ গ্রহণের জন্য আবরাহাকে এমন অবস্থায় ইয়ামানে পৌছিয়েছিলেন যাতে তারা

কুরআন মাজিদ ও আসহাবুল ফিল

কুরআন মাজিদ সুরা ফিলে অলৌকিক বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে এই ঘটনা বিবৃত করেছে। যেনো তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

سورة الفيل

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ () أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ () وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ () تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ () فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (سورة الفيل)

সুরা ফিল

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে,

"তুমি কি দেখো নি তোমার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন, যারা তাদের ওপর প্রস্তর-কঙ্কর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ-সদৃশ করেন।" [সুরা ফিল : আয়াত ১-৫]

মুহার্‌রম মাসে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মগ্রহণের চল্লিশ দিন বা পঞ্চাশ দিন পূর্বে আসহাবুল ফিলের (হস্তী-বাহিনীর) এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিলো। আরবদের কাছে এই ঘটনা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তারা এ-বছরটির নাম রেখেছিলো আমুল ফিল বা হাতির বছর। তারপর তারা ঐতিহাসিক

চিন্তা করে যে, যে-ব্যক্তি তার বস্তুগত শক্তির মোহে মত্ত হয়ে আল্লাহর শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলো, আল্লাহর শক্তিশালী হাত আজ তার এই অবস্থা করেছে।

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"তবু কি তোমরা বিরত হবে না?"

মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ইকরামার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, এই বছরই আরবে বসন্তরোগ প্রকাশ পায়।

ঘটনাসমূহকে এই বছরটির হিসেবে গণনা করতে শুরু করলো। খ্রিস্টীয় সন হিসেবে এই বছরটি ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ এবং রোমান সন হিসেবে ৮৮৬ সিকান্দারি সন।

আরবদের রেওয়ায়েতসমূহ এবং আরব ইতিহাসবিদদের মধ্যে এই ঘটনা এতটা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলো যে, যখন মক্কায় নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর সুরা ফিল নাযিল হলো, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও এই সুরায় বর্ণিত ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো দিক থেকেই কোনো আওয়াজ ওঠে নি : এই ঘটনা ভুল বা এই ঘটনার প্রকৃত অবস্থা এইরকম নয়, অন্যরকম।

এখানে এ-কথা বলা ঠিক নয় যে, এই ঘটনা শুধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরই মর্যাদা বৃদ্ধি করে নি; বরং সমগ্র আরব বিশেষ করে কুরাইশ সম্প্রদায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করছিলো। তা-ই এই সুরার বিরুদ্ধে কেউ কোনো আওয়াজ তোলে নি এ-কারণে যে, সুরাটি যখন নাযিল হয় তখন আরবে ধর্মীয় দলাদলির প্রেক্ষিতে সাধারণভাবে আরবের বিভিন্ন অংশে আর বিশেষ করে শহরে খ্রিস্টধর্ম মক্কার মুশরিক ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়েরই শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। ফলে খ্রিস্টানরা আরব বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও উপেক্ষা করতে পারতো; কিন্তু খ্রিস্টধর্মের এই অপমানকে—যা তাদের ধারণায় গোটা কুরাইশ সম্প্রদায় ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করছিলো—এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশ্ত করতে পারতো না। নাসারা ও ইহুদি এমন কোনো ঘটনা শোনাও বরদাশ্ত করতো না যার মাধ্যমে তাদের কেবলা 'সাখারায়ে বাইতুল মুকাদ্দাস' ব্যতীত এমন কোনো স্থানের (কা'বার) সহস্র মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, যে-স্থানের কেবলা হওয়াকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে এবং প্রকাশ্যভাবে সেটিকে মিথ্য প্রতিপন্ন করে।

যাইহোক। ইতিহাসের পরিষ্কার ও নিরঙ্কুশ সাক্ষ্য প্রমাণ করছে যে, সমসাময়িক একজন খ্রিস্টানও এই ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস করে নি। আর হিজরতের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে যখন নাজরানের প্রতিনিধি দল আগমন করলো, তারা তাদের ধারণামতে ইসলামের বিরুদ্ধে যত ধরনের সমালোচনা করতে পেরেছে

করেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন মাজিদের মিথ্যা প্রতিপাদনে যত প্রমাণ উপস্থিত করতে পেরেছে করেছে; কিন্তু এই ঘটনার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি। যদি তারা এই সুরার বিরুদ্ধে কিছু বলে থাকতো, তবে যে-ইতিহাস প্রায় সাড়ে তেরোশো বছর থেকে শত্রুদের পক্ষ থেকে রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তার সব সংরক্ষণ করেছে, তা কেমন করে ওই অভিযোগকে ভুলতে পারতো।

সুতরাং, নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিতে এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, সামগ্রিকভাবে এই ঘটনা যেভাবে আরবের কিচ্ছা-কাহিনি এবং আরব ইতিহাসবিদদের কাছে রক্ষিত ও প্রসিদ্ধ আছে, তা সম্পূর্ণ সঠিক। সঠিক না হওয়ার কী কারণই বা থাকতে পারে? কারণ, সুরা ফিল নাযিল হওয়ার সময় এই ঘটনার বয়স হয়েছিলো মাত্র বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর এবং সমগ্র আরবে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং পিতা-মাতা ও দেশীয় বর্ণনা থেকে শ্রবণকারীর সংখ্যা ছিলো লাখ লাখ।

কিন্তু বহু শতাব্দী পর আজ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদেরা বলেন, 'ঘটনা কেবল এতটুকু যে, আবরাহা রোমানদের সাহায্যার্থে বের হয়েছিলো। পথেমধ্যে সেনাবাহিনী বসন্তরোগের মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।' আরো মজার ব্যাপার হলো, এই দাবির পেছনে তাদের কাছে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই এবং ঘটনার সমসাময়িক কোনো সাক্ষ্যও নেই। তারা বরং শুধু আরব ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ.-এর বর্ণনা—সে-বছর আরব দেশে বসন্তের মহামারী প্রকাশ পেয়েছিলো—থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

জানি না, ইতিহাস ও ইতিহাসদর্শনের এটা কোন ধরনের নীতি যে, এই রেওয়ায়েতের সব ঘটনাকে নিজের মতের বিরোধী মনে করে বিনা প্রমাণে অস্বীকার করা হয় এবং সেই ঘটনারই একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করে কোনো সূত্র ছাড়াই নিজের পক্ষ থেকে তাতে মনগড়া কিছু সংযুক্ত করে এক নতুন অর্থের সৃষ্টি করা হয়।

আমরা মেনে নিচ্ছি যে, মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বক্তব্য অনুযায়ী সে-বছরই আরবে বসন্তরোগের মহামারী ঘটেছিলো এবং অনৈসলামিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমরা এটাই নিচ্ছি যে, সে-বছরই ইয়ামান ও

হাবশাতেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো। তারপরও এ থেকে কী করে প্রমাণিক হয় যে, ১. আবরাহা কা'বাগৃহ ধ্বংস করার জন্য ইয়ামান থেকে বের হয় নি; বরং রোমানদের সাহায্যের জন্য বের হয়েছিলো। যেটা ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ বিনা প্রমাণে কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দাবি করছেন। ২. আবরাহার সেনাবাহিনী কা'বাগৃহের প্রতিপালকের আদেশে পাখিদের প্রস্তরবর্ষণে ধ্বংস হয় নি; বরং বসন্ত রোগের মহামারীতে ধ্বংস হয়েছিলো। এর পক্ষে ইতিহাসের কোনো প্রমাণ নেই। কারণ, সমসাময়িক সাক্ষ্যসমূহ এবং মুতাওয়াতির শ্রেণির দেশীয় ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহ প্রস্তরবর্ষণে তারা ধ্বংস হয়েছিলো বলে প্রমাণ বহন করে।

এটা একটি প্রমাণিত সত্য যে, আবরাহা তার আল-কুল্লাইস গির্জার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহ ধ্বংস করার জন্য বের হয়েছিলো। সুতরাং, যদি সমুদ্রের দিক থেকে আগত পাখিদের প্রস্তরবর্ষণ কা'বার মালিকের আদেশে বসন্তরোগের ভয়ানক জীবাণু সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে যে, তা আক্রমণকারীদের নিঃশ্বাস ফেলারও সুযোগ দেয় নি এবং প্রস্তরখণ্ডগুলোর আঘাতের পরই তৎক্ষণাৎ শরীর পচতে ও গলতে শুরু করেছে এবং তাতে গোটা সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে এতে কী বলা উচিত? আর এটা যদি সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে আবরাহা ও তার সেনাবাহিনীর ওপর আযাব না হয় তবে কী ছিলো?

فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রকৃতিপূজারী ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ হয়তো এই ঘটনাকে বিকৃত করতে চাচ্ছেন এই কারণে যে, এই ঘটনার মাধ্যমে কা'বাগৃহের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং কালের পরিক্রমায় স্বরচিত খ্রিস্টধর্মের হীনতা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়। তা ছাড়া, আল্লাহর কুদরতের হাতে সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় ঘোষিত হয়। অথবা তাঁরা নিছক প্রকৃতিবাদিতা ও জড়বাদিতার প্রেরণায় আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতাকে চাক্ষুষ করা থেকে চক্ষু বন্ধ করে নিয়েছের এবং তাঁরা এ-ধরনের ঘটনাবলিকে অসম্ভব বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ এই আকাশেরই নিচে অনেক জাতি ও

সম্প্রদায়ের ইতিহাস বহুবার এমন ঘটনা চাক্ষুষ করেছে এবং ইতিহাস এসব ঘটনাকে তার বুকে ধারণ করে রেখেছে। যখনই কোনো জাতি জুলুম, অহঙ্কার, অবাধ্যাচরণ, নাফরমানি, অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টিতে সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তখনই আল্লাহ তাআলা জমিন ও আসমানের বস্তুরাশি থেকে কখনো বায়ুকে, কখনো বিজলিকে, কখনো বন্যা ও বৃষ্টিকে, কখনো ভয়ঙ্কর নিনাদ এবং কখনো জীব-জন্তুর আক্রমণকে তাদের ওপর এমনভাবে আপতিত করেছেন যে, নিমিষেই তারা ও তাদের প্রতাপশালী সমাজ ও সংস্কৃতি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আদ, সামুদ, নমরুদ, ফেরআউন, আসহাবুল আইকাহ এবং আসহাবুল উখদুদের মতো বড় বড় সম্প্রদায় নিজ নিজ যুগে প্রতাপশালী সমাজ ও রাজত্বের অধিকারী ছিলো। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর জমিনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, দুর্বল লোকদের ওপর অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন চালিয়েছে, শিরক ও কুফরে মত্ত হয়ে আল্লাহর নবী-রাসুলের সঙ্গে নির্মম আচরণ করেছে এবং আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ খোদা হওয়ার দাবি পর্যন্ত করে বসেছে, তখন উল্লিখিত বস্তুসমূহ ও আসমান-জমিনে সৃষ্ট বস্তুসমূহ দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করেছেন যে, ইতিহাসের পাতাসমূহ ছাড়া পৃথিবীতে তাদের নামচিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু মানুষের গাফলতি ও উদাসীনতার ক্ষেত্রে কী করা যাবে? তারা তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির খর্বতা সত্ত্বেও অতীতের ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে যায় এবং নতুন নতুন গায়েবি কারিশমা ও নিদর্শনের প্রার্থী হয়ে ওঠে। অসীম সাহসের সঙ্গে বনি ইসরাইলের মতো বলে ওঠে—

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

“আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করবো না।”[১৩৮]

আর যখন তারাও পূর্ববর্তী লোকদের মতো আল্লাহ তাআলার আযাবের শিকার হয়ে পড়ে তখন অনুতাপ ও আফসোস করে অন্য মানুষের জন্য

---

[১৩৮] সুরা বাকারা : আয়াত ৫৬।

উপদেশ ও জ্ঞান লাভের উপকরণ হয় এবং শেষ সময়ের আক্ষেপ ও অনুতাপ তাদের কোনো কাজে আসে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে সুরা মুমিনে বলেন—

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ () فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (سورة مؤمن)

“এরপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললো, ‘আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদের শরিক করতাম তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম।’ তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে এলো না। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব থেকেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সে-ক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।” [সুরা মুমিন : আয়াত ৮৪-৮৫]

এই অবস্থাই আজ ইউরোপীয় বস্তুবাদী চিন্তাবিদ ও তাদের অনুসারীবৃন্দের। কতই না ভালো হতো যদি তারা প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতো, সত্যকে অস্বীকার না করতো এবং সত্য নিয়ে বিদ্রূপ না করতো। ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত পাঠকে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, লর্ড কিচেজ এই যুগেই মিসরের ওপর উৎপীড়ন করতে করতে প্রচণ্ড অহমিকার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বলেছিলো, ‘আজ আমি মিসরের ফেরআউন।’ তারপর তোমরা দেখেছো যে, আল্লাহর কর্মফল-সংক্রান্ত নীতি তাকে সেই জবাবই প্রদান করেছে, যে-জবাব ফেরআউনে প্রদান করা হয়েছিলো।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

“এরপর (যখন মুসা আ. তাঁর বনি ইসরাইলকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন তখন) ফেরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তারপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলো। (অর্থাৎ তাদের ওপর যা ঘটার ছিলো ঘটে গেলো।)” [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৭৮]

তারপর নদীগর্ভে নিমজ্জিত লর্ড কিচেজের লাশকে ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো কারিশমাই নদীগর্ভ থেকে তীরে আনতে সক্ষম হয় নি।

এই ঘটনা বহু শতাব্দীর পূর্বের ঘটনা নয়; আমাদের ও তোমাদের জীবনেরই ঘটনা। তবে কি আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর অসীম ক্ষমতা অবিশ্বাসকারীরা এই ঘটনা থেকে কোনো শিক্ষা লাভ করেছে? না, বরং তারা এই বলে তাদের বিবেকের তাড়নাকে দমিয়ে দিয়েছে যে, এটা তো অদৃষ্টের ব্যাপার ও আকস্মিক ঘটনাবলির অন্তর্গত একটি ঘটনা। যা হওয়ার ছিলো তা-ই হয়েছে। তারা কেনো এ-রকম বুঝলো? কুরআন মাজিদ বলছে, কেবল এই জন্য যে—

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হলো বক্ষস্থিত হৃদয়।"[১৩৯]

ব্যাপার এই নয় যে, তাদের চোখ অন্ধ; বরং তারা চোখে ভালোই দেখে। কিন্তু তাদের বুকের ভেতর যে-অন্তঃকরণ রয়েছে তা অন্ধ হয়ে পড়েছে। তাই তারা যা-কিছু দেখছে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করছে না। এ-কারণে এমন দলের জন্য এ-কথা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে যে—

فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

"সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।"[১৪০]

সুরা ফিল ও অন্যান্য কয়েকটি ব্যাখ্যা

সুরা ফিলের উল্লিখিত তাফসির প্রাচীন যুগের উলামায়ে কেরামের ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সিরের (রহিমাহুমুল্লাহ) মত অনুসারে করা হয়েছে। এই তাফসিরে প্রকাশ পাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা কা'বা শরিফের হেফাজতের জন্য আবরাহা আল-আশরাম ও তার বিরাট সেনাবাহিনীকে তাঁর 'জাতিসমূহকে শাস্তিপ্রদান-সংক্রান্ত নীতি'র প্রেক্ষিতে অলৌকিকভাবে ছোট ছোট পাখির মাধ্যমে প্রস্তরখণ্ড বর্ষণে ধ্বংস করে দিয়েছে এইজন্য যে, কুরাইশরা বাহ্যিক সরঞ্জামের দ্বারা আবরাহার বিরাট সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলো না, আর সর্বাবস্থায় কা'বাগৃহকে রক্ষা করা কা'বার মালিকের উদ্দেশ্য ছিলো।

এই তাফসির আরবের ভাষা অনুযায়ী প্রাথমিক যুগের উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণনাকৃত রেওয়ায়েতসমূহ এবং ঐতিহাসিক নিরবচ্ছিন্ন বিবরণের প্রতি লক্ষ করে কোনো প্রতিবাদ ও অস্বীকার ব্যতীত সাড়ে তেরোশো বছর ধরে গ্রহণযোগ্য রয়েছে।

কিন্তু এই তাফসির অনুযায়ী এই ঘটনা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক কার্যাবলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে ইউরোপের নাস্তিক্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ প্রাথমিক যুগের উলামায়ে কেরামের বিপরীতে এই চেষ্টা করেছেন যে, প্রকৃত অবস্থা বিলীন হয় হোক, তারপরও যে-কোনো প্রকারে এই ঘটনা থেকে অলৌকিকতা দূর করে দেয়া হোক। ফলে তাঁরা তাদের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য মনগড়া তাফসির থেকে কাজ হাসিল করেছেন। 'মনগড়া তাফসির'-এর অর্থ এই যে, এ-ব্যাপারে কুরআন কী বলে এবং একজন প্রভাবমুক্ত চিন্তার মানুষ এ থেকে কী অর্থ গ্রহণ করে, তার প্রতি লক্ষ না করে নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ধারণা দাঁড় করিয়ে নেয়া এবং তার নিজের ধারণাকে বলবৎ রাখার উদ্দেশ্যে কুরআনের তাফসিরকে ওই ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেয়া হয়।

মনগড়া তাফসিরের রীতি অনুসারে প্রথম তাফসির করা হয়েছে স্যার সৈয়দ আহমদের পক্ষ থেকে 'তাহযিবুল আখলাক' গ্রন্থে। স্যার সৈয়দ আহমদ নিজে আরবি ভাষাজ্ঞান এবং যেসব ইলম কুরআন মাজিদের মর্মার্থ অনুধাবন করার জন্য একান্ত আবশ্যক সেসব ইলমে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁর এই তাফসির সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অর্থহীন ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাফসিরে আহমদির অন্য স্থানগুলোর মতো—যেখানে গ্রন্থকার খোদ কুরআন মাজিদের অন্যান্য আয়াত এবং পবিত্র ও নিষ্পাপ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহের বিপরীতে মনগড়া তাফসির এমনকি অর্থ বিকৃত করার প্রতি ভুল পদক্ষেপ করেছেন—এখানেও কুরআনের দ্বারা এমন কথা বলাতে চেয়েছেন, কুরআন যা বলতে প্রস্তুত নয় এবং কুরআনের মুখে এমন কথা রেখে দিতে চেয়েছেন, কুরআনের মুখ যা কবুল করতে চায় না।

স্যার সৈয়দ আহমদ সুরা ফিলের যে-তাফসির করেছেন তার ভিত্তি এ-কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ আয়াতে طَيْرًا শব্দের উদ্দেশ্য পাখি নয়; বরং এর উদ্দেশ্য অশুভ লক্ষণ। ইঙ্গিতার্থে শব্দটি বিপদ-আপদ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু স্যার সৈয়দ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, আরবি ভাষায় طير শব্দটি কখনো 'অশুভ লক্ষণ' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এর জন্য ব্যবহৃত হয় طائر শব্দটি; এর অর্থ অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গল। ইঙ্গিতার্থে শব্দটি 'বিপদ-আপদ' বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া, আরবি ভাষার এই নিয়মটির ব্যাপারেও তাঁকে বিশেষ অজ্ঞ বলে মনে হয় যে, যদি মেনেও নেয়া হয় طير-এর অর্থ অশুভ লক্ষণ, তারপরও এখানে এই অর্থ এ-কারণে হতে পারে না যে, আরবি ভাষায় طير শব্দটি অশুভ লক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হলে তার সঙ্গে إرسال বা 'প্রেরণ করা' শব্দের সম্পর্ক হতে পারে না। তার জন্য বরং أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ-এর স্থলে أنزل عليهم বা القى عليهم বলা হয়ে থাকে।

কুরআন মাজিদের সত্য ও হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞ কিন্তু ইউরোপের নাস্তিক্যবাদ ও খোদাদ্রোহিতার দ্বারা প্রভাবিত এসব লোক কুরআন মাজিদের তাফসির তো করলেও এ-কথা একদম ভুলে যায় যে, কুরআন মাজিদ আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

"তা আমিই অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় কুরআন।"[১৪১]

আর অন্যসব ভাষার মতো আরবি ভাষার শব্দসমূহ এবং শব্দের সমন্বয়ে বাক্যগঠনের জন্যও নিয়মকানুন ও শর্ত আছে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি এসব নিয়ম ও শর্তের বিপরীতে কুরআনের শব্দ ও বাক্যের অর্থ বর্ণনা করে তবে প্রকৃত পক্ষে সে কুরআনের অর্থ বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী হয়। যাইহোক। স্যার সৈয়দ আহমদের তাফসিরটি এই জাতীয় ভ্রান্তিরাশির সমষ্টি। সুতরাং ইলমি আলোচনায় স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়।

---

[১৪১] সুরা ইউসুফ : আয়াত ২।

প্রাথমিক যুগের উলামায়ে কেরামের (রহিমাহুমুল্লাহ) তাফসিরের বিপরীতে সুরা ফিলের আর একটি তাফসির করেছেন 'নিযামুল কুরআন'-এর রচয়িতা মাওলানা হামিদুদ্দিন ফারাহি রহ.। প্রাথমিক যুগের উলামায়ে কেরাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাস্‌সিরের তাফসিরের প্রতি লক্ষ না করে কেবল আরবি ভাষা ও আরবি কবিতাসমূহের প্রতি লক্ষ করে এই তাফসির করা হয়েছে। মরহুম মাওলানার ইলমি সততা, তাকওয়া, পবিত্রতা ও কুরআনি ইলমের গভীরতার প্রেক্ষিতে তাঁর তাফসির ওইসব লোকের তাফসিরসমূহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় যারা নিছক অলৌকিক ব্যাপারগুলো অবিশ্বাস করার জন্য মনগড়া তাফসির করার অপরাধমূলক দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তারপরও ঘটনার অলৌকিকতাকে দূর করার জন্য মরহুম মাওলার প্রচেষ্টা তাঁর অভ্যন্তরীণ অসুস্থতার পরিচয় বহন করে। এ-কারণে আমরা মরহুম মাওলানার কুরআনের খেদমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর অন্য কয়েকটি তাফসিরি বিষয়ের মতো এখানকার বিষয়টিরও বিরোধিতা না করে পারছি না।

মরহুম মাওলানার তাফসিরের সারমর্ম এই : تَرْمِيهِمْ শব্দে تَرْمِي ক্রিয়ার কর্তা طَيْر নয়; বরং انت (তুমি) সর্বনাম, যা أَلَمْ تَرَ শব্দে تَرَى ক্রিয়াটিরও কর্তা। আর وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন) আয়াতটি একটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। তা হলো, সাধারণভাবে আরবদের ধারণা ছিলো যে, যখন বিরাট সেনাবাহিনী কোনো দিকে যাত্রা করে তখন তাদের মৃতদেহের মাংসভোজী পাখিসমূহ সারি বেঁধে বায়ুমণ্ডলে উড়ে চলে। যেমন, আরবের কবি আবু নাওয়াস বলেন, 'আমার প্রশংসাভাজনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাখিদের ঝাঁক রয়েছে। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আমার প্রশংসাভাজন জয় লাভ করবেই।' অথবা, বসরায় উষ্ট্রযুদ্ধে যে-ঘটনা ঘটেছিলো তার অবস্থা সেদিনই হিজাযবাসী এইজন্য জানতে পেরেছিলো যে, লাশভোজী পাখিরা মানুষের দেহের কর্তিত অংশসমূহ নখরে নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলো।

এই তাফসিরের ভিত্তি সুরা ফিলের আয়াতসমূহের অর্থ হবে এই—

"তুমি কি দেখেছো, তোমার প্রতিপালক হাতিঅলাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন নি? তিনি তাদের ওপর দলে দলে পাখি পাঠালেন। তুমি ওই হাতিঅলাদের ওপর প্রস্তর

নিক্ষেপ করছিলে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির মতো করে দিলেন।"

এই তাফসিরের ওপর নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হয় :

১। تَرْمِي ক্রিয়ার কর্তা যদি أنت (তুমি) সর্বনাম হয়, طَيْر (পাখি) না হয়, তবে تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ বাক্যাংশে سِجِّيل শব্দ যোগ করা নিষ্প্রয়োজন, বরং নিরর্থক।

২। এই অবস্থায় وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার সার্থকতা ও উপকারিতা বর্ণনা থেকে কুরআন নিজেই নীরব। এভাবে সুরার আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না; বরং আয়াতগুলোর শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যে ত্রুটি ঘটে।

৩। আরব কবিদের কবিতায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে পাখিদের উড়ে চলা কবিসুলভ কল্পনামাত্র। এ-কারণে কুরআনের বর্ণিত সত্যের ব্যাখ্যাকে ওই কল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা শুদ্ধ নয়।

৪। ঘটনার সমসাময়িক বা তার কিছুটা পরবর্তীকালের আরব কবিগণ তাঁদের কবিতায় স্বীকার করেছেন যে, تَرْمِي ক্রিয়ার কর্তা طَيْر (পাখি); أَلَمْ تَرَ শব্দে تَرَى ক্রিয়ার কর্তা أنت (তুমি) সর্বনাম (অর্থাৎ কুরাইশ) তার (تَرْمِي-এর) কর্তা নয়। সুতরাং, কেনো এই বিকৃতি এবং কী জন্য?

৫। فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ আয়াতের শুরুতে 'فَ' অক্ষরটি تَرْمِي ক্রিয়ার ফল ও পরিণাম বুঝাচ্ছে। আর جَعَلَ ক্রিয়ার কর্তা رَبّ। সুতরাং, বুঝা গেলো যে, কুরাইশদের প্রস্তরবর্ষণে হাতিঅলাদের বিরাট বাহিনী ভক্ষিত তৃণের মতো হয়ে যাওয়া তখনই শুদ্ধ হতে পারে যখন তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অলৌকিক শক্তির ক্রিয়াও থাকে। অন্যথায়, বস্তুগত কারণের প্রেক্ষিতে এমন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্যতার বাইরে। আর এতে যদি অলৌকিক শক্তির দখল থেকে থাকে, তবে যে-বিস্ময়কর ব্যাপার থেকে বাঁচার জন্য পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কেরামের মতের বিরোধী তাফসিরকে অবলম্বন করা হয়েছে, সেটাই মেনে নেয়া অবধারিত হয়ে পড়ে।

৬। আরবের যুদ্ধগুলোতে 'নিছক যাযাবরসুলভ প্রস্তরনিক্ষেপ' যুদ্ধনীতি ছিলো বলে দাবি করার পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ আবশ্যক। অন্যথায়, বিশেষ করে আসহাবুল ফিলের ঘটনার জন্য যুদ্ধপদ্ধতির এই ব্যাখ্যা প্রমাণবিহীন থেকে যায় এবং তা গ্রহণঅযোগ্য।

এই গেলো মোটামুটি কথা। এবার বিস্তারিতভাবে বলি : অলঙ্কারশাস্ত্রের চাহিদা এই যে, যখন কোনো শব্দের সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কিছু যুক্ত হয় তখন এটা অবধারিত হয় যে, এই সংযোজনের পেছনে কোনো সার্থকতা ও কল্যাণ থাকবে। অর্থাৎ, কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অতিরিক্ত বিষয়কে সংযোজন করা হয়েছে। অন্যথায় এ-ধরনের বাক্য বালাগাতের/অলঙ্কারশাস্ত্রের স্তর থেকে নিচে নেমে যাবে, অলৌকিক বালাগাতের পর্যায়ে পৌঁছা তো দূরের কথা। কেননা, এ-অবস্থায় এই সংযোজন নিরর্থক হয়ে পড়ে। এমনকি কবিতার সঙ্কীর্ণ ময়দানেও অপ্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয় বৃদ্ধি করাকে বৈধ মনে করা হয় না।

দ্বিতীয় বিষয়টিও অনুধাবনযোগ্য। আরবি ভাষায় কঙ্করকে বলা হয় سِجِّيل। অর্থাৎ, মাটিকে আগুনে পুড়ালে পাকা হয়ে যাওয়ার পর তাতে পাথরের মতো কাঠিন্যের সৃষ্টি হয়। এমন পাকা মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে আরবি ভাষায় سِجِّيل (সিজ্জিল) বলা হয়। আর ফারসি ভাষায় বলা হয় 'সাঙ্গেগিল', অর্থাৎ, মাটির পাথর। কোনো কোনো ভাষাবিশারদ আলেম বলেন, সিজ্জিল শব্দটি ফারসি ভাষার সাঙ্গেগিল শব্দের আরবিরূপ। অর্থাৎ, মাটি থেকে নির্মিত পাথর। আর এটা জানা কথা যে, মক্কার পাহাড়সমূহে ছোট-ছোট ও বড়-বড় খণ্ডের পাথর প্রচুর পাওয়া যায়; কিন্তু সেখানে সিজ্জিল (কঙ্কর) প্রচুর পরিমাণে থাকার কোনো অর্থ নেই।

সুতরাং, যদি মেনে নেয়া হয় যে, تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ আয়াতে কুরাইশের যাযাবরসুলভ প্রস্তরবর্ষণ উদ্দেশ্য, তবে এ-অবস্থায় بِحِجَارَةٍ বলাই যথেষ্ট ছিলো। কারণ, حِجَارَةٍ শব্দের অর্থ প্রস্তর। আর حِجَارَةٍ (প্রস্তর) শব্দকে سِجِّيل (পাকা মাটির কঙ্কর)শব্দের সঙ্গে বিশিষ্ট করে দেয়াটা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত এবং তা একটি ভ্রান্ত বিষয়ের প্রকাশকে আবশ্যক করে।

জবাবে হয়তো কেউ কেউ বলতে পারেন, এখানে سجّيل বলতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডই উদ্দেশ্য। কিন্তু তা এ-কারণে শুদ্ধ হবে না যে, আরবি ভাষায় পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে الحصاة 'আল-হাসাতু' বলা হয়। এই পার্থক্য বিভিন্ন অভিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : الحصى صغار الحجارة و الحصى— হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর এবং তার একবচন الواحدة حصاة। আর سجّيل-এর অর্থ বলা হয়েছে سجيل الحجارة من الطين اليابس : শুকনো মাটির পাথরের মতো খণ্ডকে سجيل (সিজ্জিল) বলা হয়। ভাষাবিশারদ আলেমগণ এই পার্থক্যকে আরো স্পষ্ট করেছেন এবং বলেছেন, মাটির পাত্র ভেঙে ফেললে যেসব টুকরো তৈরি হয়, যদিও সেগুলোকে سجيل বলা যায়, তারপরও সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু প্রকাশ করার জন্য মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরোর জন্য আরবি ভাষায় خذف (খাযাফ) শব্দটি নির্দিষ্ট। আর এই তথ্যটিও কখনো আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ভাষাবিশেষজ্ঞ আলেমগণ দাবি করেন যে, আরবি ভাষায় একটি শব্দও অন্য শব্দের مرادف বা সমার্থবোধক নয়। যে-শব্দগুলোকে আমরা সমার্থবোধক মনে করে থাকি তাদের মধ্যে পরস্পর যে-সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব অবশ্যই লক্ষণীয়।

মোটকথা, 'নিযামুল কুরআন'-এর রচয়িতা সুরা ফিলের যে-তাফসির করেছেন তার প্রেক্ষিতে এখানে سجيل শব্দের উল্লেখ কেবল অপ্রয়োজনই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের বিপরীত ও বেখাপ্পা হয়ে পড়ে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের সারমর্ম এই যে, যদি طَيْر-কে تَرْمِي ক্রিয়ার কর্তা মেনে নেয়া হয়, যেমনটা জমহুর মুফাস্সিরিনে কেরাম করেছেন, তা হলে বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়াই সুরাটি পরিষ্কারভাবে তার মর্মার্থ বুঝিয়ে দেয়। আর আয়াতগুলোর পূর্বাপর সামঞ্জস্য এবং কথার পারস্পরিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাসও যথাবস্থায় ঠিক থাকে।

কিন্তু 'নিযামুল কুরআন'-এর তাফসির অনুযায়ী যদি বলা হয়, تَرْمِي ক্রিয়ার কর্তা طَيْر নয়, বরং أنت (তুমি) সর্বনাম, তা হলে এই অবস্থায় 'পাখির ঝাঁক প্রেরণ করা'র উদ্দেশ্য ও কার্য সম্পর্কে কুরআন (সুরা ফিল)

একেবারেই নীরব। তা ছাড়া বাক্যগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে ত্রুটি ঘটে।

কেননা, أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ 'আল্লাহ কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন নি' এবং تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ 'তারা তাদের ওপর প্রস্তরবর্ষণ করছিলো' বাক্য দুটির মধ্যস্থলে وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ 'তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন' বাক্যটি তার উদ্দেশ্য বুঝানোর ক্ষেত্রে মোটেই স্পষ্ট নয় এবং আগের ও পরের বাক্যগুলোতে এর প্রতি কোনো ইঙ্গিতও নেই। বরং বাক্যটি উটকো ও সম্পর্কহীন, যা নিজেই নিজের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য দায়িত্বশীল এবং অর্থ স্পষ্ট করতে না পেরে ত্রুটিপূর্ণ। যদি বাক্যের এই সম্পর্কহীনতাকে বাইরের সাহায্য দ্বারা সমাধান করা হয় এবং আয়াত থেকে উদ্ভূত স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাবে তার নীরবতাকে বাইরের সহযোগিতায় দূর করা হয়, তবে বালাগাতের (অলঙ্কারশাস্ত্রের) নিয়ম অনুযায়ী বাক্যটি অস্পষ্টা ও দুর্বোধ্যতার দোষে দূষিত হয়ে ওঠে, যা বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাক্যের মধ্যে উপস্থিত থাকে এমনভাবে যে, পূর্বাপর বাক্যগুলো দ্বারা তা স্পষ্ট হয় না এবং বাক্যগুলো সেদিকে ইঙ্গিতও করে না। ফলে বাক্যটিতে আবশ্যকভাবে ত্রুটি ঘটে এবং খামাখাই দুর্বোধ্যতার দোষ আপতিত হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা হেকমতকে নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করে নেয়া বৈধ মনে করা হয় এবং কোনো প্রমাণ ছাড়াই বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহ তাআলা পাখির ঝাঁকসমূহ হেরেম শরিফের আঙিনা থেকে মৃতদেহ অপসারণ করে তাকে পবিত্র করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আর আয়াতগুলোর বিষয়বস্তুর বিন্যাস ঠিক থাকা এবং ত্রুটি থেকে বাক্যের রক্ষিত থাকার সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সুরাটির মধ্যে যে-উদ্দেশ্য ও হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে এবং যা বাইরের সাহায্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী নয়, (অর্থাৎ, تَرْمِيهِمْ —'আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য পাখির ঝাঁক প্রেরণ করা হয়েছে') তাকে খণ্ডন করে অযৌক্তি সাব্যস্ত করা হয়। অথচ মৃত মানুষের লাশগুলোকে হেরেম শরিফ থেকে সরিয়ে

তাকে পবিত্র করার ব্যাপারে ইতিহাসের বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত বিদ্যমান। আল্লামা ইবনে কাসির লিখেছেন—

وذكر النقاش في تفسيره أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر.

"নাক্কাশ তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেছেন, পানির প্লাবন এসে মৃত মানুষের লাশগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সাগরে ফেললো।"[১৪২]

আর তৃতীয় প্রশ্নের সারমর্ম এই যে, আর وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ আয়াতের তাফসিরে 'নিযামুল কুরআন'-এর রচয়িতা তাঁর তাফসিরের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ আরব কবিদের যে-কবিতা ভূমিকারূপে পেশ করেছেন, যদি তাকে সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় এবং আয়াতটির নীরবতার অবসান করার জন্য বালাগাতের নীতিকে বাদ দেয়া হয়, তারপরও এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, আবু নাওয়াস বা নাবিগার মতো আরব কবিদের কবিতায় যদি এই জাতীয় কল্পনা পাওয়া—যায় যখন কোনো সেনাবাহিনী যুদ্ধে যাত্রা করে, তখন লাশের মাংসভোজী পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের সঙ্গে চলে—তবে এই কল্পনা থেকে এ-কথা কীভাবে অবধারিত হয় যে, কবিতাদের এই কল্পনার ভিত্তি বাস্তবের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং নিছক কবিসুলভ কল্পনা নয়, যাতে তা কুরআন মাজিদের তাফসিরের জন্য প্রমাণরূপে কাজে আসতে পারে? এই ঘটনার কিছুকাল পরে মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, যখন আমরা সেসব যুদ্ধের বিস্তারিত অবস্থাবলি অধ্যয়ন করি এবং সেসব যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিষয় এবং সাধারণ থেকে সাধারণ ঘটনার বিবরণও সিরাত ও ইতিহাসের কিতাবে সংরক্ষিত দেখি, তখন তাদের কোনো একটি যুদ্ধের বিবরণেও এ-বিষয়টির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না যে, লাশভোজী পাখির ঝাঁক শুরু থেকেই মুসলমান বা মুশরিক সেনাবাহিনীর যাত্রাপথে সঙ্গে সঙ্গে চলতো। যেমন, বদর যুদ্ধ, অহুদ যুদ্ধ, হুনাইনের যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধের অবস্থাবলি এ-জাতীয় ঘটনার বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ নীরব। বরং এর বিপরীতে প্রমাণ বিদ্যমান যে, বদরের যুদ্ধে কুরাইশের নেতাদের লাশগুলো উঠিয়ে একটি পরিত্যাক্ত কূপের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। এমন কোনো কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, মুসলমানদের

---

[১৪২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

সঙ্গে বা মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে শুরু থেকেই লাশভোজী পাখির ঝাঁক সহযাত্রী ছিলো এবং তারা যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহগুলোর সৎকার করেছিলো। একইভাবে আরব ছাড়া পৃথিবীর অন্য যুদ্ধগুলোর কোথাও এমন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং, এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আরব কবিদের এমন উক্তি কবিসুলভ অতিরঞ্জিত কল্পনার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁদের প্রশংসিত ব্যক্তির বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করে এমনও অতিরঞ্জন করতেন যে, মানুষ তো মানুষ, লাশভোজী পশু-পাখিও তার বীরত্বের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো এবং এ-কারণে তারা তার সেনাবাহিনীর সহযাত্রী হয়ে চলতো। অথচ বাস্তব অবস্থা শুধু এতটুকু যে, প্রশংসিত ব্যক্তি তার শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে দেয়ার পর পরাজিত বাহিনীর সৈন্যদের লাশগুলোর ওপর চিল, শকুন, কাক ইত্যাদি মাংসভোজী পাখি পতিত হয়ে তাদের ছিঁড়েকুরে খাওয়ার জন্য লেগে যেতো। এই সাধারণ কথাটিকে কবিরা তাঁদের সূক্ষ্ম চিন্তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। আবু নাওয়াসের এ কবিতাটি—যাকে মুফাস্‌সির সাহেব প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন—নিজেই কি এ-কথা প্রকাশ করে না যে, এটা শুধু কবিসুলভ সূক্ষ্ম কল্পনা? কেননা, তিনি বলেন, 'আমার প্রশংসিত ব্যক্তির সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাখির ঝাঁক রয়েছে। কারণ, তারা আমার প্রশংসিতের বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী।' তবে কি এটাও মেনে নিতে হবে যে, ওইসব মৃতদেহের মাংসভোজী পাখিদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের বুদ্ধিমত্তার চেয়েও বেশি হতো। ফলে তারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই এটাও বুঝতে পারতো যে, অমুক দল জয় লাভ করবে আর অমুক দল এবং এইজন্য তারা যে-দল জয় লাভ করবে তার সহযাত্রী হয়ে চলতো, যে-দল পরাজয় বরণ করবে তার সহযাত্রী হতো না?

আর যদি নিজের মনগড়া তাফসিরের জন্য এসব বিস্ময়কর বিষয়ও মেনে নিতে কোনো আপত্তি না থাকে, তবে জানি না, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম ও জমহুর মুফাস্‌সিরের তাফসিরটি মেনে নিতে কেনো এত ইতস্তত করা হচ্ছে।

আর বসরায় 'উষ্ট্রযুদ্ধ' সংঘটিত হওয়া আর হিজাযে পাখিদের দ্বারা এইভাবে প্রকৃত অবস্থা জেনে ফেলা যে, তারা মানুষের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাঞ্জায় নিয়ে উড়ছিলো, তবে তা থেকে এটা কীভাবে অবধারিত

হয় যে, ওইসব লাশভোজী পাখি উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী বা যারা জয় লাভ করেছিলো তাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলে চলে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গাছপালা ও ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে আস্তানা বানিয়েছিলো? বসরায় কি চিল, শকুন, কাক ছিলো না এবং যা-কিছু আজ পর্যন্ত হচ্ছে তা-ই কি তখনো হয়ে থাকবে না যে, যুদ্ধশেষে যখন ময়দানে লাশ পতিত হলো, তখনই চারদিকের দূর-দূরান্ত থেকে মৃতদেহের মাংসভোজী পাখিরা এসে পৌঁছলো এবং কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাঞ্জায় নিয়ে উড়ে গেলো এবং আকাশে তাদের ওড়াউড়ির দ্বারা হিজাযবাসীও প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলো। যেমন, শকুন সম্পর্কে প্রাণীবিজ্ঞানীদের বর্ণনা এই যে, আল্লাহ তাআলা তার ঘ্রাণশক্তি এত প্রখর করে দিয়েছেন যে তারা লাশের ছড়িয়ে পড়া গন্ধ বা মুক্ত স্থানে ছড়ানো মাংসের গন্ধ বহু মাইল দূর থেকে অনুভব করতে পারে এবং দ্রুত গতিতে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য তাফসিরে وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ আয়াতটির তাফসিরের জন্য বাইরে থেকে কবিসুলভ কল্পনাপ্রসূত কবিতাগুলোর সাহায্য গ্রহণ করা এবং বিশুদ্ধ ও ঐতিহাসিক সত্য থেকে বিমুখ হওয়া, বরং স্বয়ং কুরআন মাজিদের বাক্য থেকে বাইরের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ঘটনার যে-পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয় তা থেকে অন্যদিকে সরে যাওয়া কোনোভাবেই সঠিক নয়।

আলোচ্য তাফসিরের ওপর চতুর্থ প্রশ্নের বিবরণ এই যে, যদি মেনেও নেয়া হয় যে, تَرْمِي ক্রিয়ার কর্তা কুরাইশ, তবে فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ আয়াতের শুরুতে الفاء للجزاء (পরিণামজ্ঞাপক فاء) প্রবেশ করে প্রমাণ করছে যে, সে যে-বাক্যের শুরুতে প্রবেশ করেছে তা تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ আয়াতটির ফল ও পরিণাম। আলোচ্য তাফসির অনুযায়ী এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যখন কুরাইশ আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর প্রস্তরবর্ষণ করলো তখন আল্লাহ তাআলা আবরাহার সেনাবাহিনীকে ভক্ষিত তৃণ-সদৃশ বানিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, সবাই ওখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো এবং হাতি ও মানুষ সবই ভক্ষিত তৃণের মতো হয়ে গেলো।

এখন প্রশ্ন এই যে, কুরাইশের যাযাবরসুলভ প্রস্তরবর্ষণ দ্বারা কোনো বিরাট সেনাবাহিনীর—যাতে দৈত্যাকৃতির হাতির সারিও রয়েছে—

এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া যে, তারা পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাতে চাইলেও বাঁচাতে পারতো না, স্বাভাবিক কার্যকারণের হিসেবে কি যুক্তিযুক্ত মনে করা যেতে পারে? সাধারণ বুদ্ধি কি এটা বলে না যে, আবরাহা যখন দেখলো যে, সে এবং তার সেনাবাহিনী কুরাইশদের ভীষণ প্রস্তরবর্ষণ সহ্য করতে সক্ষম হবে না, তখন সে কেনো ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে গোটা সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করালো? কেনো সে যে-উপত্যকার ভেতর দিয়ে এদিকে এসেছিলো ওই উপত্যকা হয়ে পলায়ন করলো না? আর এটা স্পষ্ট যে, তখন কুরাইশের কাছে প্রস্তরবর্ষণের জন্য কোনো যন্ত্র ছিলো না যে, তারা আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর হাজার হাজার মণের ভয়ঙ্কর প্রস্তরসমূহ এত দ্রুত গড়িয়ে ফেলতে পারতো যে, সব সৈন্য, হাতি, ঘোড়া, উট সবই ওখানে চাপা পড়ে থেকে যেতো এবং ভক্ষিত তৃণের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

আর কুরাইশের ওপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তো এভাবেও পূর্ণ হয়ে যেতো যে, তারা এমন বিরাট সুসজ্জিত সেনাবাহিনীকে যাযাবরসুলভ প্রস্তরবর্ষণ দ্বারা পরাজিত করে পলায়ন করতে বাধ্য করলো।

অবশ্য এ-কথা তখনই সঠিক হতে পারতো এবং বিশ্বাস করা যেতো যে, যদি এমন প্রস্তরবর্ষণকে স্বাভাবিক কার্যকারণের সাধারণ নিয়ম থেকে ভিন্ন সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অলৌকিক কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করা হয় এবং বলা হয় যে, সাধারণ যুদ্ধপদ্ধতির বিপরীতে এটা একটা মুজিযা ছিলো। কিন্তু এই অবস্থায় আলোচ্য তাফসিরের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, কুরআন মাজিদের এই সুরাটির বর্ণনাশৈলী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলছে যে, ওখানে যে-অবস্থা ঘটেছিলো তা আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতি কার্যক্রমের অধীনতায় হয়েছিলো। এ-কারণে যারা এই ঘটনাকে নিজের চোখে দেখেছে বা প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে বর্ণনা শুনেছে, তারা এ-ব্যাপারে অবহিত আছে যে, এই ঘটনা কী বিস্ময়কর ও অসীম কুদরতের কারিশমায় কী পরিমাণ বিস্ময় সৃষ্টি করে ঘটে গেছে এবং তা কুরাইশদের জন্য একটি শিক্ষা এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ; যে-কুরাইশরা তাদের ক্ষমতার গর্বে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের পিষে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো তারা যেনো বুঝে নেয় যে, যে-মহান সত্তা কা'বা গৃহের

হেফাজতের জন্য এমন গাইবি ব্যবস্থা করেছেন তিনিই আজ ইবরাহিম আ.-এর কা'বার প্রকৃত মর্যাদার আহ্বানকারীর হেফাজত ও সংরক্ষণের তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন।

মোটকথা, নিরস্ত্র মানুষের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বর্ষণে দৈত্যাকৃতির হাতির দল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরিহিত সেনাবাহিনীকে পলায়নের সুযোগ না দিয়ে ওই স্থানেই তাদেরকে ভক্ষিত-ভূষির মতো করে দেয়া তেমনই বিস্ময়কর যেমন বিস্ময়কর পাখিদের নিক্ষিপ্ত কঙ্করসমূহ বন্দুকের গুলির মতো লাগা বা তাদের এমন ভয়ঙ্কর জীবাণু বহনকারী হওয়া যার দ্বারা একটি বিরাট সেনাবাহিনী ভক্ষিত ভূষির মতো হয়ে যায়। কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, এই ঘটনা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার অলৌকিক নিদর্শন। প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কোনো কারণই এমন ঘটনা ঘটাতে পারে না।

যদি এ-কথাটি অস্বীকার করা না হয়, তবে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম এবং জমহুর ইলামায়ে কেরামের তাফসির, এমনকি কুরআন মাজিদের আয়াত থেকে প্রাপ্ত তাফসিরকে ত্যগাম করে এমন তাফসির অবলম্বন করার কোনো যক্তিযুক্ত কারণ নেই যা ভাষা ও রেওয়ায়েত উভয় দিক থেকেই রুগ্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।

পঞ্চম প্রশ্নটির উদ্দেশ্য এই যে, আলোচ্য তাফসিরে অর্থ পরিষ্কার করার জন্য যদি আরব কবিদের কবিতাসমূহ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়ই মনে করা হয়, তবে এর কারণ কী হতে পারে যে, অর্থ পরিষ্কার করার জন্য ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কবিতাগুলোকে—যাতে এই ঘটনার সমসাময়িক আবদুল মুত্তালিবের কবিতাগুলোও অন্তর্ভুক্ত—পরিত্যাগ করা হলো? এসব কবিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াকে সঙ্গত মনে করা হলো এবং আরব কবিদের এমন একটি কল্পনাকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা হলো যার ভিত্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে এবং যার প্রতি কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহের কোনো ইঙ্গিত নেই? বরং এতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে পাখির উপস্থিতির বিষয়টি গোটা ঘটনাপ্রবাহের জন্য ছিলো না; আল্লাহ তাআলার কুদরত বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে প্রেরণ করেছিলো। এ-কারণেই تَرْمِيهِمْ-এর পূর্ববর্তী আয়াতে وَأَرْسَلَ বলে আল্লাহ তাআলা পাখিদের

আগমনকে বিশেষভাবে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। অন্যথায় জানা কথা যে, দুনিয়ার কারখানায় যা কিছু ঘটে ও হয়ে থাকে, তার সবকিছুই কুদরতের হাতেই হয়ে থাকে।

তা ছাড়া تَرْمِيهِمْ-এর পরে فَجَعَلَهُمْ বলে এটা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, رمى বা প্রস্তরবর্ষণের পরিণতি—অর্থাৎ, كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ বা আবরাহার সেনাবাহিনীর ভক্ষিত-ভূষির মতো হয়ে যাওয়া—আমার নিজের কাজ ছিলো; তাতে অন্যকারো হস্তক্ষেপ ছিলো না। অন্যথায়, ওখানে পাখিদের উপস্থিতি যদি সাধারণ অবস্থার মতো হতো এবং আবরাহার সেনাবাহিনীর كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ 'ভক্ষিত-ভূষির মতো হয়ে যাওয়া' কুরাইশের প্রস্তরবর্ষণের ফল হতো, তবে বর্ণনাশৈলী এমন হতো না। তখন বলা হতো, তাদের মাথার ওপর পাখিদের ঝাঁকের পর ঝাঁক উড়ছিলো, যখন তোমরা তাদের ওপর প্রস্তরবর্ষণ করলে, তখন তারা ভক্ষিত তৃণ বা ভূষির মতো হয়ে গেলো।

মোটকথা, আরবে ইসলামের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালেই আরব কবিদের এমন কবিতাবলি বিদ্যমান, যাতে পরিষ্কারভাবে এ-কথার স্বীকৃতি রয়েছে যে, ঘটনাটির বাস্তবতা তা-ই যা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের রেওয়ায়েতসমূহ প্রকাশ করছে। সুতরাং, এসব কবিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আরব কবিদের একটি সাধারণ কল্পনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত আবদুল মুত্তালিবের কবিতাগুলো পরিষ্কারভাবে এই সত্যটি ঘোষণা করছে যে, কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে আবরাহার সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি না দেখে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকলো এবং তারা কা'বা গৃহকে কা'বা গৃহের মালিকের হাতে সোপর্দ করে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো এবং কী ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। আবদুল মুত্তালিব বলেন—

لاهُمَّ إن العبدَ يَمنع رَحْله فامْنَعْ حلالَكْ

"হে আল্লাহ, একজন দাসও তার দলবলকে রক্ষা করে। সুতরাং তুমি তোমার বিধিসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত সম্পদ ও লোকজনকে রক্ষা করো।"

আর অবশেষে শত্রুর মোকাবিলায় নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা এবং বাহ্যিক কারণে কা'বা গৃহের হেফাজত থেকে নিরাশার ভাব এই বাক্যে প্রকাশ করেছেন—

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك

"আমাদের কিবলাকে যদি তুমি শত্রুর করুণার ওপর ছেড়ে দিতে চাও, তা হলে যা খুশি করো।"[১৪৩]

আবদুল মুত্তালিব আসহাবুল ফিলের ঘটনার সমসাময়িক লোক, কুরাইশ গোত্রের নেতা এবং কুরাইশের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ও সন্ধির জন্য দায়িত্বশীল। তিনি স্বীকার করছেন যে, কুরাইশ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে কা'বা গৃহ ও আবরাহার ব্যাপারটিকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে কী ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করছিলো। পক্ষান্তরে আলোচ্য তাফসির এ-ব্যাপারে জোর দিচ্ছে যে, কুরাইশরা অবশ্যই আবরাহার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

"সুতরাং, দেখুন ব্যবধান কতটুকু!"

এই ঘটনা বর্ণনা করে বলা কবিতাগুলো যাবতীয় জীবনচরিত-গ্রন্থে সহিহ সনদের সঙ্গে বর্ণিত আছে। এমনকি সাধারণ রেওয়ায়েতগুলোর মতো এই ঘটনা সম্পর্কে দ্বিমত পর্যন্ত নেই; শুধু এই একটি মতই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে বর্ণিত হয়ে আসছে। কিন্তু আফসোস! তারপরও এটিকে প্রণিধানযোগ্য মনে করা হয় না।

তা ছাড়া, যদি মেনেও নেয়া হয় যে, এই কবিতাগুলো আবদুল মুত্তালিবের নয়, তারপরও কবিতাগুলো দ্বারা সর্বাবস্থায় এটাই তো প্রমাণিত হয় যে, যে-আরববাসী ও হিজাযবাসীর সামনে কুরআন মাজিদ আসহাবুল ফিলের ঘটনা বর্ণনা করছে তাদের কাছে ইসলামের পূর্বকালে এই ঘটনা সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত সর্বজন-স্বীকৃত ছিলো যা এই কবিতাগুলো দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এটাই তারা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে শুনেছে বা নিজেদের চোখে দেখেছে। এ-কারণে ইসলাম পরবর্তী

---

[১৪৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

যুগের আরব কবিরা তাদের কবিতায় বিনা মতভেদে এই সত্যকে প্রকাশ করে আসছেন।

কবি আবদুল্লাহ বিন যাবআরি বিন আদি আস-সাহমি এই ঘটনার উল্লেখ করে বলছেন—

تنكلوا[144] عن بطن مكة إنها ... كانت قديما لا يرام حريمها

لم تخلق الشعرى ليالي حرمت ... إذ لا عزيز من الانام يرومها

سائل أمير الحبش[145] عنها ما رأى ... فلسوف ينبي الجاهلين عليمها

ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم ... بل[146] لم يعش بعد الاياب سقيمها

كانت بها عاد وجرهم قبلهم ... والله من فوق العباد يقيمها

"দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ আল্লাহর ঘরের শত্রুরা বিতাড়িত হয়েছে। কারণ, প্রাচীনকাল থেকেই মক্কার অধিবাসীদেরকে কেউ পদানত করতে পারে নি।/ শি'রা নক্ষত্র নিষিদ্ধ রাত সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, ওইসব নিষিদ্ধ রাতকে সৃষ্টিজগতের কোনো পরাক্রান্ত সত্তা করায়ত্ত করতে পারে না।/ (আবিসিনিয়ার) সেনাপতি (আবরাহাকে) জিজ্ঞেস করো, সে কী দেখেছে? যারা জানে তারা অজ্ঞ লোকদের জানাবে।/ ষাট হাজার (হানাদার) সৈন্যের মধ্যে কেউ দেশে ফিরে যেতে পারে নি। আর রুগ্‌ণ লোকটি (আবরাহা নিজে) পলায়ন করলেও বাঁচতে পারে নি।/ এই ভূখণ্ডে ইতোপূর্বে আদ ও জুরহাম সম্প্রদায় বসবাস করেছে। সকল বান্দার উপরে থেকে আল্লাহ এই ভূখণ্ডকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।"[১৪৭]

আবদুল্লাহ বিন কায়স আর-রুকিয়্যাত বলছেন—

كاده الأشرمُ الذي جاء بالفيـــ ... ـــل فولّى وجيشُه مهزومُ

---

[১৪৪] تنكلوا -এর জায়গায় تنكبوا -ও বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ : ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে গেলো, প্রত্যাবর্তন করলো।

[১৪৫] সিরাতে ইবনে হিশামে এখানে الحبش-এর জায়গায় الجيش বর্ণিত হয়েছে।

[১৪৬] সিরাতে ইবনে হিশামে بل শব্দটি নেই।

[১৪৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড; সিরাতে ইবনে হিশাম প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮।

واستَهلَّتْ عليهِمُ الطيرُ بالجنـــ ... ـــدل حتى كأنه مَرْجومُ

ذاك من يَغزُهُ من الناسِ يَر ... جعْ، وهو فَلٌ من الجيوش ذميمُ

“কা'বার নিকটবর্তী হয়েছিলো আশরাম (আবরাহা) হাতি নিয়ে; কিন্তু সে পালালো এবং তার বাহিনী পরাভূত হলো।/ পাখি পাথর নিয়ে জানদাল নামক স্থানে তাদের ওপর আক্রমণ করলো। ফলে সেই বাহিনী প্রস্ত রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো।/ বস্তুত, যে-মানুষই কা'বার ওপর আক্রমণের অপচেষ্টা চালায় তাকে ধিক্কৃত, নিন্দিত ও পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হয়।”

আবু কায়স সাইফিয়্যু বিন আল-আসলাত আনসারি আবরাহার সেনাবাহিনীর ধ্বংসের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও সাহায্যপ্রাপ্তির বর্ণনা দেন এভাবে—

فقوموا فصلوا ربَّكم وتمسَّحوا ... بأركان هذا البيت بينَ الأخاشبِ

فعندكمُ منه بلاءٌ ومصدَق ... غداةَ أبي يَكْسومَ هادي الكتائبِ

كتيبتُه بالسهلِ تُمسي ورَجْلُه ... على القاذفات في رءوسِ المناقبِ

فلما أتاكم نصرُ ذي العرشِ ردَّهم ... جنودُ المليكِ بين سافٍ وحاصبِ

فوَلَّوْا سِراعا هاربين ولم يَؤُبْ ... إلى أهله ملْحُبْشِ غيرِ عصائبِ

ওঠো, তোমাদের রবের জন্য সালাত আদায় করো এবং কঠিন পর্বতমালার মাঝে অবস্থিত গৃহের (কা'বার) বরকতময় প্রান্তসমূহ স্পর্শ করো।/ এ-গৃহের জন্য নিশ্চিতভাবে তোমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে, বিপুল সৈন্যের পথপ্রদর্শক আবু ইয়াকসুমের (আবরাহার) ভোরে—/ তার অশ্বারোহী বাহিনী রয়েছে সমতলভূমিতে, আর পদাতিক বাহিনি রয়েছে পাহাড়-প্রর্বতের শীর্ষদেশে।/ এরপর যখনই আরশের অধিপতির সাহায্য তোমার কাছে এলো, অমনি রাজার বাহিনীকে তা বিতাড়িত করলো : কিছুকে মাটির নিচে চাপা দিলো আর কিছুকে পাথর দিয়ে আঘাত করলো।/ তারপর তারা দ্রুত পিছু হটে পালালো; কিন্তু তাদের আবিসিনীয় স্বজনদের কাছে ফিরে যেতে পারলো না।”[১৪৮]

---

[১৪৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

ষষ্ঠ প্রশ্নের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইসলামের পূর্বের ও পরের আরবের প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ আরব কবিদের কবিতায়, সিরাতের গ্রন্থসমূহে এবং মুসলিম ও অমুসলিম ইতিহাসবিদদের ইতিহাসগ্রন্থে বিদ্যমান। তাতে ধর্মীয়, ওই দেশীয় ও জাতীয়—সব ধরনের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু একটি যুদ্ধ সম্পর্কেও একথা প্রমাণিত হয় নি যে, আরববাসীরা বা কুরাইশরা শুধু যাযাবরসুলভ প্রস্তরবর্ষণে যুদ্ধ করেছে। বরং ওই যুগের প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র তরবারি, তীর, বর্শা ইত্যাদি দ্বারাই তারা যুদ্ধ করতো। যুদ্ধে তারা মানজানিক বা প্রস্তর-ক্ষেপণাস্ত্রও ব্যবহার করতো। আর যদি এ কথা স্বীকার করা না হয় তবে আরবের ইতিহাস থেকে কোনো প্রমাণ আনা হোক যে, কেবল প্রস্তরবর্ষণের কোনো প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কেননা, ইতিহাস তো আজ পর্যন্ত এটাই বলে আসছে যে, আরববাসীদের তরবারি চালনার পারঙ্গমতা এবং কথায় কথায় কোষ থেকে তরবারি বের করা ছিলো তাদের দৈনন্দিক কাজ।

আর যদি বলা হয় যে, ওই বিশেষ ঘটনায় হস্তী-বাহিনীর মোকাবিলায় তরবারির যুদ্ধ বা সম্মুখসমর অসম্ভব ছিলো এবং এ-কারণে প্রস্তরবর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিরোধ করা হয়েছিলো এবং তার প্রমাণের জন্য এটিই একমাত্র প্রথম ও শেষ ঘটনা, তবে এই বিশেষ ঘটনার জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আবশ্যক, যা থেকে স্পষ্ট হতে পারে যে, পূর্ববর্তী মুফাস্সিরিনে কেরাম থেকে বর্ণনাকৃত তাফসিরটি ভুল এবং নতুন তাফসিরটিই সঠিক। অথচ এ-ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

সুতরাং, যদি আরবের যুদ্ধের ঘটনাবলির মধ্যে তার দৃষ্টান্ত উপস্থিত না থাকে এবং এই বিশেষ ঘটনার জন্যও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া যায় এবং হিজাযের আঞ্চলিক রেওয়ায়েতসমূহ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা সবার ঐকমত্যে এটা প্রমাণিত হয় যে, আবরাহার বিরাট সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় কুরাইশরা কোনো যুদ্ধই করে নি এবং তারা মোকাবিলা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কা'বাকে কা'বার মালিকের হাতে সোপর্দ করে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো, তা হলে নিছক আরবি ভাষার প্রতি লক্ষ করে দুটি সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে—যা আরবি ভাষার নিয়ম অনুযায়ী দুর্বল ও রুগ্ণ এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ ও পূর্ববর্তী উলামায়ে

কেরামের রেওয়ায়েতসমূহের বিপরীত—অবলম্বন করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে এই সত্যটিও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক যে, সিরাত ও তাফসিরের কিতাবসমূহে বহুল পরিমাণে এমন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যাদের সম্পর্ক বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা প্রাচীন উলামায়ে কেরামের সঙ্গে স্থাপিত বলে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও গবেষক ও বিশেষজ্ঞ মুফাস্‌সিরগণ সেসব রেওয়ায়েত গৃহীত ও স্বীকৃত হওয়ার মান কমিয়ে দেন এই কথা বলে যে, এই রেওয়ায়েতগুলো ইসরাইলি। অর্থাৎ, রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এবং আবু হুরাইরা রা.-এর সঙ্গে সনদের দিক থেকে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো ওইসব রেওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত নয় যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর এই ভিত্তির ওপরই পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত। বরং এগুলো আবদুল্লাহ বিন সালাম রা., কা'বা আল-আহবার রা. এবং ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. প্রমুখ বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের ওইসব কাহিনি ও উক্তি থেকে গৃহীত যা তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পর প্রাজ্ঞ ইহুদি আলেম হওয়ার কারণে মুসলমানদের মজলিসে বয়ান করতেন। আর মুসলমানরা তাওরাত ও ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহ এই সীমা পর্যন্ত বর্ণনা করতে পারবে যে, তা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের বাণীর বিরোধী হবে না—নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই অনুমতির প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহকে গল্প ও কাহিনি আকারে বর্ণনা করায় ক্ষতি আছে বলে মনে করতেন না। এ-কারণে সুরা ফিলের তাফসিরেও এই কি সম্ভাবনা আছে যে, ترمي ক্রিয়ার কর্তাকে পাখির ঝাঁক মেনে নিয়ে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম থেকে যে-রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে তা ইসরাইলি রেওয়ায়েত, যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, সুরা ফিলের আয়াতগুলোর এই তাফসির পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে নয়? এর জবাবে বলা হবে, না, তার সম্ভাবনা নেই। কেননা, যে-যুগে ঘটনাটি ঘটেছিলো এবং যে-সময়ে সুরা ফিল নাযিল হয়েছিলো উভয় কালেই এই ঘটনার মাধ্যমে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার মোকাবিলায় খ্রিস্টধর্মের

ভীষণ অবমাননা হয়েছে। এ-কারণেই দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ এই অবমাননায়—যা কুদরতের হাতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বের মোকাবিলায় খ্রিস্টধর্মের হয়েছিলো—ক্রুদ্ধ হয়ে আসহাবুল ফিলের ঘটনা প্রমাণহীন ও অহেতুক ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। আর ইহুদিরা ও ইহুদি আলেমগণও তাদের চিরন্তন হিংসুটে স্বভাবের কারণে এই একত্ববাদের কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব সহ্য করতে পারতো না যা প্রবীণ নবী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ইসরাইলি শাখার ওপর ইসমাইলি শাখার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং, নিঃসন্দেহে এ-কথা বলা বাস্তবানুগ হবে যে, যে-ঘটনাটির প্রচার ইহুদি ও নাসারাদের এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য হয় না, তার সম্পর্তিক রেওয়ায়েতগুলোকে ইসরাইলিয়্যাত ও ইসরাইলি রেওয়ায়েত কোনোক্রমেই বলা যেতে পারে না। বরং এই রেওয়ায়েতগুলোর সত্যতার বড় প্রমাণ এই যে, যে-সময় সুরা ফিল নাযিল হয়, ঘটনাটি ঘটার পর তখনো পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি, কিন্তু তারপরও তার মিথ্যা প্রতিপাদনে কোনো বিরোধী দল বা ব্যক্তির দুঃসাহস হয় নি এবং কোনো একজন লোকও এ-কথা বলে নি যে, সুরা ফিলের আয়াতগুলোর দাবি সঠিক হোক বা না হোক, কুরাইশের মধ্যে ঘটনা সম্পর্কে যে-ধরনের কথা প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ ভুল। আর যদি এটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতো, তবে ইতিহাস তা নিজের বুকে সেভাবেই সংরক্ষণ করে রাখতো যেভাবে বিরোধীদের সব ধরনের অনর্থক ও বিদ্রূপাত্মক উক্তি এবং শত্রুতামূলক ঘটনাবলিকে আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত রেখেছে।

সুতরাং, একজন নীতিবান ও সত্যান্বেষী মানুষের জন্য এই সত্যকে স্বীকার করা আবশ্যক যে, সুরা ফিল সম্পর্কিত ঘটনাটির বিবরণসমূহ যেভাবে আরবের রেওয়ায়েতসমূহে, আরব কবিদের কবিতাসমূহে এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম থেকে উদ্ধৃত তাফসিরসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা-ই সঠিক তাফসির।

পূর্ববর্তীযুগের উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত সুরা ফিলের তাফসির এ-কারণেও প্রণিধানযোগ্য যে, তার দ্বারা ওইসব ত্রুটি ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না যা তা আধুনিক যুগের তাফসিরে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তা এইজন্য যে, আমরা যদি বাইরের ব্যাখ্যা ও বিবরণ বাদ দিয়ে কেবল কুরআন মাজিদের আয়াতগুলোর অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে তাফসির করি,

তবে আয়াতগুলোর যোগসূত্র, বিষয়বস্তুর পর্যায়ক্রম ও সুরার সামঞ্জস্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও অর্থগত গোলমাল ছাড়াই ঠিক থাকে এবং আয়াতগুলোর অর্থ এই হয়

"তুমি কি দেখো নি যে, তোমার প্রতিপালক হাতিঅলাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি কি তাদের দুষ্কৃতিমূলক দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দেন নি? এবং তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছেন যারা তাদের ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ করছিলো। অবশেষে তোমার প্রতিপালক তাদেরকে ভক্ষিত-ভূষির মতো করে দিলেন।"

আয়াতগুলোর এই পরিষ্কার ও সঠিক তরজমায় মন লাগিয়ে দেখুন কীভাবে একটি আয়াত অপর আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এবং বাইরে থেকে কোনো ধরনের সংযোগ ব্যতীত নিজেই পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে। তা অবশ্য কুরআন মাজিদে বর্ণিত মুজিযাসমূহের স্বর্ণশৃঙ্খলে একটি কড়া (আংটা) বৃদ্ধি করছে।

আর কুরআনের বাইরে আরবে গদ্য ও পদ্যের রেওয়ায়েতগুলো উল্লিখিত পরিষ্কার ও স্পষ্ট তরজমার জন্য কোনো বাহ্যিক সংযুক্তি ব্যতীত ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণের মর্যাদা রাখে।

উলুমুল কুরআনের তাফসিরের একজন নতুন দাবিদারও পূর্ববর্তী যুগের জমহুর উলামায়ে কেরামের বিপরীতে সুরা ফিলের তাফসির করেছেন। নতুন মুফাস্সির সাহেব রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিস সমূহ শরিয়তের দলিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মনে করেন। তিনি হাদিস অবিশ্বাস করাকে তাঁর মতাদর্শ বানিয়ে নিয়েছেন এবং ধর্মসেবার নামে তাঁর লেখালেখিতে ওই খোদাদ্রোহিতাকে বিশেষ প্রকারে পেশ করে হাদিস অবিশ্বাস করার প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং জানা কথা যে, তাঁর দৃষ্টিতে পূর্ববর্তীযুগের মুফাস্সিরিনে কেরামের মতাদর্শের কী মূল্য থাকতে পারে।

সুরা ফিলের এই নুতন তাফসির 'নিযামুল কুরআন'-এর রচয়িতার তাফসির থেকে গৃহীত; কিন্তু নতুন মুফাস্সির সাহেব প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান—উভয় জ্ঞানেই শূন্য এবং এসব কিছু সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজিদের অনেক তাফসির অস্তিত্বে আসার ফলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য মুফাস্সির সাজতে

চেয়েছেন। এ-কারণে তিনি 'নিযামুল কুরআন'-এ বর্ণিত জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে গেছেন এবং নিছক বক্তৃতার আকারে আয়াতগুলোর শব্দার্থ ও মর্মার্থ থেকে ভিন্ন নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু বিষয় তার সঙ্গে যুক্ত করে পেশ করেছেন যা দেখলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি এমনসব বাক্যের তাফসির করছেন যা তাঁর ধারণামতে নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশে অসম্পূর্ণ এবং বর্ণনাপদ্ধতিতে ত্রুটিপূণ। তা এমনকিছু সংযুক্তির মুখাপেক্ষী যা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে এবং ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করতে পারে।

নতুন মুফাস্‌সির সাহেব বলেন—

"ক্ষুদ্র বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে বুঝে নাও যে, মক্কাবাসীর এক বিরোধী শক্তি (আবরাহা) কুরাইশের ওপর আক্রমণ করতে চাইলো। কিন্তু এমনভাবে যে, আক্রমণটি হবে অতর্কিত এবং কুরাইশদেরকে সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় পাকড়াও করা হবে। তার জন্য বিরোধী শক্তি এই পরিকল্পনা করলো যে, তারা উপত্যকা হয়ে গোপনে মক্কায় এসে পৌঁছবে এবং সেনাবাহিনীর ভয়ঙ্কর হস্তীদল কুরাইশদেরকে পিষে ফেলবে। এই ছিলো তাদের গোপনীয় ষড়যন্ত্র (كَيد)। এই ষড়যন্ত্রকে গোপন রাখার জন্য আবরাহা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিলো মক্কাবাসীদের রক্ষা করা। ফলে এ-ব্যাপারে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেলো যাতে পুরো পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। যে-যুগে গোলাবারুদ জমিনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশকেও আগুনে রাঙিয়ে দিতো না সে-যুগে লাশভোজী বড় বড় পাখি, যেমন চিল, শকুন ইত্যাদি সেনাবাহিনীর সঙ্গ নিতো। যখনই কোনো সেনাবাহিনী কোনো দিকে যাত্রা করতো, এসব পাখি তাদের আল্লাহ-প্রদত্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুমান করে নিতো যে, এখন আমাদের খাদ্যেহচ্ছে। আসহাবুল ফিলের সেনাবাহিনী তাদের গতিবিধি মক্কাবাসীদের থেকে গোপন রাখলেও ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি— طيرا أبابيل। অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, ওই আবাবিল পাখি নয় যা আমাদের এলাকায় সন্ধ্যাকালে উড়ে বেলায়—আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর উড়ে উড়ে তাদের সঙ্গী গেলো। এইভাবে আকাশে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক জমিনের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলো। মক্কাবাসীরা জানতো এই জাতীয় পাখির ঝাঁড়ের ওড়ার অর্থ কী। 'এই ধোঁয়া থেকে তারা আগুনের

সন্ধান পেয়ে' তারা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলো এবং আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর এমনভাবে প্রস্তর বর্ষণ করলো যে, হাতির পালসহ গোটা সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলো। কুরআন মাজিদ মক্কাবাসীদের এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।”[১৪৯]

এই তাফসিরটিরও ওপর যে-প্রশ্নাবলি উত্থাপিত হয়, 'নিযামুল কুরআন'-এর রচয়িতার সুরা ফিলের তাফসির প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, ভ্রান্তিমূলক তাফসিরের অনুকরণে রচিত তাফসির বিবেচনাযোগ্য নয়। তবে নতুন মুফাস্‌সিরের তাফসিরে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথাবার্তা যোগ করে দিয়ে কুরআন মাজিদকে যে-লুকমা প্রদান করা হয়েছে তার অবান্তরতা প্রকাশ করে দেয়া একান্ত আবশ্যক। মুফাস্‌সির সাহেব তাঁর বানোয়াট অতিরিক্ত কথাগুলো যোগ করেছেন এইজন্য যে, তাঁর মনগড়া তাফসির অনুযায়ী (তাঁর মতে) আয়াতগুলোর অর্থে যে-ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা হয়েছে এবং আয়াতগুলোর যোগসূত্রের মধ্যে যে-শূন্যতা ছিলো তা পূর্ণ করা হয়েছে।

একদিকে 'নিযামুল কুরআন' রচয়িতার তাফসিরি উদ্দেশ্যসমূহকে নিজের বলে চালিয়ে দেয়া আর অন্যদিকে অনুসৃত বিষয়সমূহের মধ্যে মুজতাহিদ সেজে অজ্ঞতামূলক অতিরিক্ত কথামালার সংযুক্তি ও অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস—এই দুটি বিষয় একত্র হয়ে নতুন মুফাস্‌সির সাহেবের সুরা ফিলের তাফসিরকে অদ্ভুত মোদক বানিয়ে দিয়েছে।

আপনি পুনরায় একবার চিহ্নিত বাক্যগুলো পাঠ করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরা ফিলের আয়াতগুলোর সাধাসিধে অর্থের প্রতিও মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করুন, তা হলে আপনি নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়বেন যে, আসহাবুল ফিলের ঘটনা সম্পর্কে এই নতুন মুফাস্‌সির যে-কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন তা কোথা থেকে এসেছে।

সুরা ফিলের আয়াতগুলোতে তো এসব কথার পাত্তা পর্যন্ত নেই। জানি না, নতুন মুফাস্‌সির সাহেব এগুলোকে কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে তাঁর দাবি এই যে, তিনি ঘটনা-সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলোকে ভুল এবং তিলকে পাহাড় বলে মনে করেন এবং তিনি যা কিছু বলছেন

---

[১৪৯] তুলুয়ে ইসলাম, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৮।

স্বয়ং কুরআন মাজিদ থেকেই বলছেন। অথচ ঘটনা-সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলো মুফাস্‌সির সাহেবের অতিরিক্ত সংযুক্তির বিপরীতে বর্ণনা করছে—

১. আবরাহা তার সেনাবাহিনী নিয়ে—যাতে হাতির পালও ছিলো—ইয়ামান থেকে প্রকাশ্যে মক্কার উদ্দেশে বের হয়েছিলো এবং এ-কারণে তার যাত্রাপথে কোনো কোনো আরব গোত্র বাধা প্রদান করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলো। ২. মক্কার উদ্দেশে আবরাহার বের হওয়ার সংবাদ আরবের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ৩. সুতরাং, আবরাহার এই যুদ্ধপ্রচেষ্টা গোপন ষড়যন্ত্র ছিলো না, প্রকাশ্য অভিযান ছিলো। ৪. আবরাহা হিজাযে পৌঁছে আবদুল মুত্তালিবকে ডেকে এনে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলো যে, কুরাইশের সঙ্গে আমার কোনো দেন-দরবার নেই। আমি কেবল কা'বা গৃহ ধ্বংস করতে এসেছি। ৫. আবদুল মুত্তালিব এবং কুরাইশরা মোকাবিলার শক্তি না থাকার ফলে আবরাহার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নি; বরং তারা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। ৬. আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিলো কা'বা গৃহকে রক্ষা করা, কুরাইশদেরকে রক্ষা করা নয়। কেননা, আবরাহা কা'বা শরিফকেই ধ্বংস করতে এসেছিলো।

কুরআন মাজিদে এসব অতিরিক্ত কথামালার উল্লেখ নেই, নতুন মুফাস্‌সির সাহেব যা জোরে-শোরে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকৃত বিবরণের পেছনে ঐতিহাসিক বা হাদিসভিত্তিক প্রমাণও নেই। সুতরাং, এমন বিবরণের ওপর যে-তাফসিরের ভিত্তি তা নিঃসন্দেহে মনগড়া তাফসির এবং নিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিমূলক ও অর্থহীন।

বলা যেতে পারে যে, মুফাস্‌সির সাহেবের এসব অতিরিক্ত সংযুক্তির ভিত্তি হলো كيد শব্দটি যা সুরা ফিলের اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ আয়াতে রয়েছে এবং তিনি এর অর্থ করেছেন 'গোপনীয় ষড়যন্ত্র'।

কিন্তু এই কথাটিও নিরর্থক। কারণ, প্রথমত শুধু كيد শব্দ দ্বারা এই দীর্ঘ কাহিনী কী করে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে যে-পর্যন্ত না কুরআনের ভেতরে বা বাইরে কোনো প্রমাণ না থাকে। দ্বিতীয়ত, আরবি ভাষায় كيد শব্দটির অর্থ কখনোই 'গোপনীয় ষড়যন্ত্রে'র জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দুরাচারমূলক 'প্রচেষ্টা'র অর্থও প্রদান করে থাকে, চাই

তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক। আবার শব্দটি কখনো শুধু যুদ্ধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

كيد শব্দটি ষড়যন্ত্র, ধোঁকা, প্রতারণা, অশ্লীলতা, যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই সবগুলো অর্থের মধ্যেই 'দুরাচারমূলক অপচেষ্টা'র অর্থ রয়েছে। কুরআন মাজিদ বিভিন্ন স্থানে كيد শব্দটিকে 'চেষ্টা' ও 'কর্মপন্থা'র অর্থে বা 'প্রকাশ্য প্রচেষ্টা'র অর্থে ব্যবহার করেছে। সুরা হজে বলা হয়েছে—

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (سورة الحج)

"যে-কেউ মনে করে আল্লাহ তাকে[১৫০] কখনোই দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু লম্বিত করুক,[১৫১] পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক; তারপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কি-না।" [সুরা হজ : আয়াত ১৫]

এখানে كيد শব্দের অর্থ শুধু কর্মপন্থা ও প্রচেষ্টা, প্রকাশ্য বা গোপনীয় কোনো শর্তের সঙ্গেই তা শর্তযুক্ত নয়।

সুরা আম্বিয়ায় হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাহিনিতে আছে—

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ () قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ () وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (سورة الأنبياء)

'তারা বললো, "ওকে পুড়িয়ে ফেলো, সাহায্য তোমাদের দেবতাগুলোকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।" আমি বললাম, "হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" ওরা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা (চক্রান্ত) করেছিলো। কিন্তু আমি ওদেরকে করে দিলাম

---

[১৫০] এখানে ه সর্বনাম দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। জালালাইন, সাফওয়াতুল বায়ান ইত্যাদি।

[১৫১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহর সাহায্যের প্রধান উৎস ওহি। রজ্জু লম্বিত করে আকাশে আরোহণ করে ওহি বন্ধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই ধরনের প্রচেষ্টা কখনো সফল হবে না।

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।' (তারা সফলকাম হলো না।) [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৮-৭০]

সুরা আস-সাফ্‌ফাতে বলা হয়েছে—

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ () فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ

(سورة الصافات)

'তারা বললো, "এর জন্য এক ইমারত[১৫২] নির্মাণ করো, এরপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।" তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিলো; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় (হীন ও অপদস্থ) করে দিলাম। [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ৯৭-৯৮]

এই দুটি স্থানে বক্তব্য এই যে, মুশরিকরা যখন হযরত ইবরাহিম আ.-এর তাওহিদের স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণসমূহের মোকাবিলা করতে অক্ষম ও নিরুত্তর হয়ে গেলো, তখন তারা সত্যকে গ্রহণ করে নেয়ার পরিবর্তে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, এই ব্যক্তি আমাদের দেবতাসমূহের (প্রতিমাসমূহের) সঙ্গে ধৃষ্টতামূলক আচরণ করেছে। সুতরাং তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত দগ্ধ করে ফেলো। হযরত ইবরাহিম আ. তাদের এই সিদ্ধান্ত নিজ কানে শুনছিলেন। কিন্তু তিনি এতে সামান্য পরোয়া করলেন না এবং নিজের সত্য প্রচারের ওপর সুদৃঢ় থাকলেন।

কুরআন মাজিদ মুশরিকদের এই সিদ্ধান্তকে كيد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। অথচ তা গোপনীয় ছিলো না, প্রকাশ্য ছিলো।

মোটকথা, كيد শব্দটি 'গোপনীয় ষড়যন্ত্র' অর্থের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যে পর্যন্ত স্পষ্ট কথায় বা স্পষ্ট ইশারায় বুঝা না যায় যে, অমুক স্থানে كيد শব্দের অর্থ 'গোপনীয় ষড়যন্ত্র' হওয়া উচিত, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শব্দকে সেই অর্থে সঙ্গে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে না।

জানা কথা যে, সুরা ফিরে كيد শব্দটিকে এই অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করার পক্ষে কোনো পরিষ্কার বর্ণনা নেই এবং স্পষ্ট ইঙ্গিতও নেই। এমনকি স্বয়ং নতুন মুফাস্‌সির সাহেবের বর্ণনা থেকেও এটা প্রকাশ পাচ্ছে যে,

---

[১৫২] চারদিকে পাকা প্রাচীরযুক্ত ইমারত, যাতে আগুন প্রজ্জ্বলতি করা হয়েছিলো।

তাঁর কাছে নিজের বর্ণিত 'গোপনীয় ষড়যন্ত্র'-এর কাহিনির জন্য كَيْد শব্দটি ছাড়া কুরআন মাজিদের মধ্য থেকেও কোনো প্রমাণ নেই এবং বাইরে থেকেও কোনো প্রমাণ নেই। ফলে তিনি আবরাহার সেনাবাহিনী পরিচালনা-সংক্রান্ত কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বিনা প্রমাণে এতটুকু বলে ক্ষান্ত হয়েছে যে, 'এই ছিলো আবরাহার গোপনীয় ষড়যন্ত্র' এবং তিনি كَيْد শব্দটির এই ব্যাখ্যা কোথা থেকে পেয়েছেন তা বলার কষ্টটুকু স্বীকার করেন নি।

এই প্রশ্ন আরো গুরুত্ব বহন করে এ-কারণে যে, যদি ধরে নেয়া হয় এখানে كَيْد শব্দটির অর্থ 'গোপনীয় ষড়যন্ত্র'ই, তারপরও এর অর্থ এই নয় যে, গোপনীয় ষড়যন্ত্রের বিবরণ তা-ই যা নতুন মুফাস্‌সির বর্ণনা করেছেন। কেননা, গোপনীয় ষড়যন্ত্রকে কোনো নির্দিষ্ট বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হলে তার জন্য প্রমাণ ও সনদ আবশ্যক।

তা ছাড়া সুরা ফিলে 'আসহাবুল ফিল'-এর উল্লেখ একটি ঘটনার মর্যাদা রাখে। তো এ-ক্ষেত্রে নিছক যৌক্তিক সম্ভাবনা অর্থহীন। বরং অত্যন্ত জরুরি হলো ঘটনাটির মৌলিক অংশসমূহ ও বিস্তারিত বর্ণনা স্বয়ং কুরআন মাজিদেই বিদ্যমান থাকবে এবং মুফাস্‌সিরগণের মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মুখাপেক্ষী হবে না। তারপর যদি খুঁটিনাটি বিবরণও পেশ করা হয় তবে তার জন্যও কুরআনের ভেতর থেকে বা বাইরে থেকে বিশুদ্ধ সনদ ও প্রমাণ থাকা আবশ্যক। অন্যথায়, ঘটনা আর ঘটনা থাকবে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তিষ্কের নতুনত্ব সৃষ্টির খেলনা হয়ে থাকবে।

নতুন মুফাস্‌সির সাহেবের তাফসিরে 'গোপনীয় ষড়যন্ত্র'-সম্পর্কিত বিবরণ প্রসঙ্গে সম্ভবত বলা যেতে পারে যে, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ আয়াতে 'পাখির ঝাঁক প্রেরণ' ও كَيْد উভয়টি মিলে উল্লিখিত বিবরণ প্রকাশ করছে। কিন্তু এমন কথা বলা অনর্থক ও নিষ্ফল। কেননা, এই আয়াতে কেবল বলা হয়েছে যে, 'আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছি পাখির ঝাঁক'। আর নতুন মুফাস্‌সির সাহেব বলেছেন যে, আকাশের শূন্যমণ্ডলে বারুদ ও গোলার ব্যবহারের পূর্বে লাশভোজী পাখিরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে উড়ে যেতো এইজন্য যে, তাদের

অভিজ্ঞতা তাদের বলে দিতো এখন তাদের খানা-খাদ্যের ব্যবস্থা হবে। আর আরব কবিদের কবিতা থেকে 'নিযামুল কুরআন' রচয়িতাও এই প্রমাণ প্রদান করেছেন যে, যখন দুটি সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাদের অবস্থান থেকে যাত্রা করতো তখন তাদের মাথার ওপর পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলতো, যাতে তারা মৃত সৈন্যের লাশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

তো নতুন তাফসির অনুযায়ী এই দুটি বিষয় থেকে বড়জোর এই সারমর্ম হতে পারে যে, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ আয়াতটি প্রকাশ করছে যে, যুদ্ধের সাধারণ অবস্থার মতো এখানেও আল্লাহ তাআলা আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তারা লাশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু গোপনীয় ষড়যন্ত্রের বিবরণসমূহ— ১. কুরাইশদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা হবে এবং তাদেরকে অতর্ক অবস্থায় পাকড়াও করা হবে; ২. এই উদ্দেশ্য নিয়ে আবরাহা গোপনে উপত্যকার পথে মক্কায় পৌঁছার পরিকল্পনা করলো; ৩. কিন্তু আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিলো মক্কাবাসীদের রক্ষা করা, ফলে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেলো যার মাধ্যমে আবরাহার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলো, তা এই যে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে তাদের সেই সেনাবাহিনীর ওপর উড়ে উড়ে তাদের সঙ্গী হয়ে গেলো আর এইভাবে জমিনের গোপনীয় ষড়যন্ত্রের রহস্য আকাশের পাখিরা ফাঁস করে দিলো; ৪. মক্কাবাসীরা জানতো যে এই জাতীয় পাখিদের ওড়ার অর্থ কী – এই ধোঁয়া থেকে তারা নিচের আগুনের সন্ধান পেলো— وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ আয়াত থেকেও প্রকাশিত হয় নি এবং كيد শব্দ থেকেও নয়। এবং এ-দুটিকে একত্র করে ভাবার্থ বের করলেও উল্লিখিত বিবরণসমূহের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এটাও প্রকাশিত হয় না যে, আসহাবুল ফির যে-ষড়যন্ত্র করেছিলো তা গোপনীয় ষড়যন্ত্রেরই আকরে ছিলো।

এ-কারণেই নতুন তাফসিরে পূর্ববর্তী মুফাস্সিরিনে কেরাম রহ.-এর পন্থাকে খণ্ডন করে 'গোপনীয় ষড়যন্ত্রে'র বিবরণসমূহ প্রমাণিত করতে পারা যায় নি এবং যা-কিছু বলা হয়েছে মস্তিষ্কপ্রসূত ও মনগড়াই বলা হয়েছে। আর যদি নতুন মুফাস্সিরের কাছে এসব বিবরণের জন্য কোনো

অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক প্রমাণ থাকে তবে তার জন্য কেবল এটাই বলা যেতে পারে—

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"[১৫৩]

আলোচ্য তাফসিরে ঘটনাটি-সম্পর্কিত বিবরণসমূহ নিজের পক্ষ থেকে রচনা করে যে-রূপ ও আকৃতি দেয়া হয়েছে তাতে মুফাস্‌সির সাহেব বিভিন্ন জায়গায় এ-কথার ওপর জোর দিয়েছেন যে, কুরাইশদের ওপর আক্রমণ করা এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়াই আসহাবুল ফিলের উদ্দেশ্য ছিলো। আর আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিলো তাদেরকে রক্ষা করা। এ-কারণেই ওইসব ঘটনাই ঘটেছে যা সুরা ফিলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে ঘটনাটি সম্পর্কে যে-ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণিত হয়েছে এবং যা অনায়াসে সুরা ফিলের আয়াতগুলোর তাফসির করছে তা বাদ দিলেও সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের হাদিসসমূহ নতুন তাফসিরটি মৌলিক কথাগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত মীমাংসা প্রদান করছে এবং প্রমাণ করছে যে, আবরাহা বা আসহাবুল ফিলের এই আক্রমণ কুরাইশদের ধ্বংস করার জন্য ছিলো না; বরং কা'বা গৃহকে ধ্বংস করার জন্য ছিলো। সুতরাং, আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিলো কা'বা গৃহকে রক্ষা করা, কুরাইশকে রক্ষা করা নয়।

ইমাম বুখারি তাঁর সহিহুল বুখারিতে আল-মিসওয়ার বিন মাখরামা থেকে হুদাইবিয়ার ঘটনা সম্পর্কে যে-দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন তাকে উল্লেখ আছে—

"মুসলমানগণ যুদ্ধ করার জন্য নয়, বাইতুল্লাহ শরিফের যিয়ারতের জন্যই মক্কায় যাচ্ছিলেন; কিন্তু মুশরিকরা মনে করলো তাঁদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য রয়েছে। ফলে খালিদ বিন ওয়ালিদ (তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি) অগ্রগামী সেনাদল নিয়ে মুসলমানদের বাধা প্রদান করার জন্য

---

[১৫৩] সুরা বাকারা : আয়াত ১১১।

অগ্রসর হলেন। আবু বকর রা. তাদের দেখে বললেন, আল্লাহর কসম, আমাদের উদ্দেশ্য কা'বা শরিফের যিয়ারত ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যদি মুশরিকরা আমাদের এই সৎ উদ্দেশ্য পূরণে বাধা দেয় তবে আমরা নিঃসন্দেহে যুদ্ধ করবো। তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পথ পরিবর্তন করে চলো। যাতে আমরা কোন্ দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছি তা যেনো খালেদ জানতে না পারে। এবং অকস্মাৎ আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করবো। তারপর যখন মুসলমানগণ 'সানিয়্যাতুল মিরার' নামক টিলায় গিয়ে পৌঁছলো, যেখান থেকে খালেদের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করা যেতো, তখন রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উটনী (কাসওয়া) বসে পড়লো। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যতই তাকে উঠাকে চাইলেন, সে কিছুতেই উটলো না। সবাই বলতে লাগলো, কাসওয়া জিদ করেছে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তখন রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কাসওয়া জিদ করে নি এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যায় নি। তার অভ্যাসও এমন নয়। বরং তাকে আল্লাহ তাআলাই আটকে দিয়েছেন, যিনি হাতিওয়ালাদের আটকে দিয়েছিলেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তারা (কুরাইশরা) আল্লাহর সম্মানিত বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে যে-কোনো শর্ত আরোপ করতে চাইবে অবশ্যই তা আমি মেনে নেবো।"

আল-মিসওয়ার বলেন, এই কথা বলে তিনি উটনীকে ধমক দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো এবং দ্রুত চলতে লাগলো। এইবার তিনি মক্কার সরাসরি পথ থেকে সরে অন্য পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে হুদাইবিয়ার প্রান্তে একটি স্বল্প পানির কূপের কাছে অবতরণ করলেন।"

এই হাদিসে حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ 'আবরাহার হাতিকে যিনি আটকে দিয়েছিলেন তিনিই একে আটকে দিয়েছেন' বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, মক্কার মুশরিকগণ শাআয়িরুল্লাহ বা আল্লাহর সম্মানিত বস্তুসমূহের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে-বিষয়েরই দাবি জানাবে আমি তা-ই পূরণ করবো। রাসুলের এই বাণী পরিষ্কারভাবে এ-

কথা প্রকাশ করছে যে, 'হাতিকে আবদ্ধকারী' আল্লাহ যেভাবে কাসওয়াকে আটকে দিয়েছেন রাসুলে খোদা ও মুসলমানদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার জন্য যে, যদি কুরাইশের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ বাঁধে তবে তাঁরা হরম শরিফ ও কা'বার মর্যাদা ও সম্মানে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগতে দেবেন না, একইভাবে অতীতকালে তিনি আসহাবুল ফিলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে দেন নি, কারণ তারা হরম শরিফ ও কা'বা গৃহকে অবমাননা ও ধ্বংস করার জন্য এসেছিলো। যেমন, খালিদ বিন ওয়ালিদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর মোকাবিলা করার সংকল্প পরিস্থিতিকে যখন যুদ্ধের নিকটবর্তী করে দিলো তখন হরম শরিফের কাছে পৌঁছে রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উষ্ট্রী বসে পড়লো। যেনো নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জবানে সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সংকল্প রয়েছে; কিন্তু মক্কার জমিন আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের কেন্দ্রভূমি। মক্কায় আছে বাইতুল্লাহ, মাকামে ইবরাহিম, সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়ানোর স্থান, মসজিদে হারাম। এবং মক্কার সমগ্র ভূমি হরম। অতএব, এটা কখনো হতে পারে না যে, মক্কার মুশরিকদের (কুরাইশদের) সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনসমূহের মর্যাদা ও সম্মানের হানি ঘটে।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিষয়গুলো ওহির মাধ্যমে উপলব্ধি করছিলেন। তাই তিনি প্রথমে উটনী কাসওয়ার বসে পড়ার কারণ বর্ণনা করলেন, তারপর উল্লিখিত ঘোষণা দিলেন। আর যখন কা'বাতুল্লাহ এবং আল্লাহর পবিত্র নিদর্শনসমূহের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়ে গেলো, তার পরক্ষণেই আল্লাহর নির্দেশে কাসওয়া নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ালো এবং গন্তব্য স্থানের দিকে চলতে শুরু করলো।

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে আছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যে-ভাষণ প্রদান করেছিলেন তাতে বলেছিলেন—

"আল্লাহ তাআলা মক্কাকে হস্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন; কিন্তু আজ তিনি তাঁর রাসুল ও মুসলমানদেরকে তার ওপর অধিকার ও

নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দিলেন। সুতরাং, মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার এই হরমের মর্যাদা ও সম্মান এখনো তেমনই আছে যেমন এর পূর্বে ছিলো। যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তাদের কর্তব্য হলো এই সংবাদ অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়া।”

এই হাদিসেও রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা মক্কাকে আবরাহার হস্তি বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন কুরাইশদের খাতিরে নয়, বরং বাইতুল্লাহ ও হরম শরিফের সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে। আর মুসলমানদেরকে এই ভুল ধারাণ থেকে বাঁচানোর জন্য যে, তারা যেনো মক্কা বিজয়ের অনুভূতিতে এ-কথা ভুলে না বসে যে, মক্কায় যুদ্ধের অনুমোদন হরম শরিফের মর্যাদা আজ কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে।

রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভাষণ প্রদান করে প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার করে দিলেন এবং এ-ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করলেন যে, যেসব লোক এখন এখানে উপস্থিত নেই, উপস্থিত লোকেরা যেনো তাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেয়। বরং মুসলিম উম্মত এই সংবাদ সবসময় পৌঁছাতে থাকবে।

কুরাইশের অস্তিত্ব ও তাদের সুরক্ষা এবং হরম শরিফ ও কা'বা গৃহের অস্তিত্ব ও তাদের সুরক্ষা দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, প্রথমটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। এ-ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের দিন কোনো কোনো সাহাবির এই ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, আল্লাহ তাআলা সম্ভবত এই বিশেষ সময়ে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাফল্যের খাতিরে হরম শরিফের মান-মর্যাদা উপেক্ষা করারও অনুমতি দিয়েছেন। আনসার-নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদা রা.-এরও এই ভুল ধারণা হয়েছিলো। এই সংবাদ যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, সা'দ বিন উবাদা রা.-এর ভুল ধারণাকে কঠোরভাবে খণ্ডন করে দিলেন। কেবল তা-ই নয়, তাঁকে তাঁর সেনাদলের নেতৃত্ব থেকেও বরখাস্ত করে দিলেন। ইমাম বুখারি মক্কা বিজয়-সম্পর্কি উরওয়ার দীর্ঘ হাদিসে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে—

হযরত সা'দ বিন উবাদা রা. পতাকা উড়িয়ে যাওয়ার সময় আবু সুফয়ানকে দেখতে পেয়ে বললেন—

يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ

"আজ ভীষণ সংঘর্ষের দিন। আজ কা'বা প্রাঙ্গণে হত্যাকাণ্ড বৈধ বলে বিবেচিত হবে।"

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবু সুফয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আবু সুফয়ান রাসুলের কাছে অভিযোগ পেশ করে বললেন, সা'দ এমন এমন কথা বলছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বললেন—

كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ

"সা'দের কথা সত্য নয়; বরং আজ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কা'বার মর্যাদা সমুন্নত করবেন এবং আজ কা'বা গৃহে গিলাফ পরানো হবে।"

অন্য এক রেওয়ায়েত এরই সমার্থবোধক শব্দে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন—

يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله فيه قريشا.

"হে আবু সুফয়ান, আজ প্রেম ও করুণার দিন, আজ এমন দিন যাতে আল্লাহ তাআলা কুরাইশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"[১৫৪]

এই রেওয়ায়েতে যদিও আসহাবুল ফিলের কোনো উল্লেখ নেই, তারপরও মক্কা বিজয়কালীন এই ঘটনাটির প্রতি লক্ষ করলে যে-সত্যটি সর্বাবস্থায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে তা হলো, যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় হলো কা'বা ও হরম শরিফের সুরক্ষা, কুরাইশের সুরক্ষা নয়।

মক্কা বিজয়ের দিন শেষ পর্যন্ত মক্কার কুরাইশের ওপরই তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে আক্রমণ হয়েছিলো। কুরাইশের পলায়নের কারণে যুদ্ধাবস্থার উদ্ভব না হলেও যে-সকল কুরাইশ অল্প-বিস্তর যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলো তারা নিহত হয়েছিলো। কিন্তু হস্তিবাহিনীকে 'আটককারী' আল্লাহ তাআলা কুরাইশকে কোনো সাহায্য করেন নি; বরং মুসলমানদেরকেই সাফল্য দান করেছিলেন। কেনো? কারণ, মুসলমানদের যুদ্ধ ঘোষণা ছিলো কুরাইশের বিরুদ্ধে এবং তাঁরা এইভাবে

---

[১৫৪] কানযুল উম্মাল ও ফাতহুল বারি।

হরম শরিফ ও কা'বা গৃহের সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আর আসহাবুল ফিলকে ধ্বংস ও বিনাশের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো এইজন্য যে, তারা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে নি; বরং তারা এসেছিলো তাওহিদের কেন্দ্রস্থল বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করার জন্য। ফলে, কা'বাকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে কা'বার মালিক আসহাবুল ফিলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

আমরা নতুন মুফাস্‌সির সাহেবের কল্পিত কাহিনির বিপরীতে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহিহ হাদিসসমূহ দ্বারা অকাট্য ও সন্তোষজনক প্রমাণ পেশ করে দিয়েছি। কিন্তু আমরা এটা ভালো করেই জানি যে, তাদের দৃষ্টিতে তাদের মনগড়া কাহিনির বিরুদ্ধে হাদিসসমূহের প্রমাণ হাস্যকর ও বিদ্রূপের উপযুক্ত; কারণ তারা তাদের দাবিকৃত ইসলামি পুস্তকে[১৫৫] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের অন্য কতিপয় হাদিস নিয়ে মজা উড়িয়েছেন, বিদ্রূপ করেছেন এবং সেগুলোকে নির্ভরঅযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং, و إلى الله المشتكى 'আল্লাহ দরবারে অভিযোগ জানানো ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

মোটকথা, যেভাবে শক্তিশালী দলিল ও প্রমাণসমূহের আলোকে নতুন তাফসিরের মৌলিক বিষয় বা মনগড়া বিবরণসমূহের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি, একইভাবে অন্য অংশগুলো বাতিল ও ভিত্তিহীন।

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

"আমার উদ্যানের অবস্থা দেখে আমার বসন্তের অবস্থা অনুমান করে নাও।"

এই প্রবাদ বাক্যটির মতো মনে করে নিন যে, তাদের স্বরূপ কেমন হবে। অর্থাৎ, তাদের জন্য কুরআনের অভ্যন্তরীণ কোনো সনদও নেই এবং বাহ্যিক দিক থেকেও ইতিহাস বা হাদিসের কোনো সমর্থন নেই।

কিন্তু মনগড়া তাফসিরের জন্য নতুন মুফাস্‌সির সাহেবের এই দুঃসাহস কত বিস্ময়কর যে, তিনি তার মনগড়া তাফসিরের মোকাবিলায় প্রাথমিক যুগের মুফাস্‌সিরিনে কেরাম থেকে বর্ণিত তাফসিরের প্রতি বিদ্রূপ ও

---

[১৫৫] তুলুয়ে ইসলাম-এ।

পরিহাস করতেও দ্বিধা করেন নি। অথচ তাঁদের তাফসিরের সমর্থনে বহু সহিহ হাদিস, আরব রেওয়ায়েতসমূহ এবং নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান। তিলকে পাহাড় করার হাস্যকর চেষ্টা তিনিই করেছেন!

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

যদি মুফাস্‌সির সাহেব তাফসিরুল কুরআনের বাকি অংশেও এমন কারুকাজ করে থাকেন এবং ইসলামের খেদমতের জন্য এই পরিমাপকেই মানদণ্ড বানিয়ে থাকেন, তবে আমরা তাঁর এই দীনের খেদমতের ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা বলতে পারি—

گر ہمیں مکتب است وہم ملا + کار طفلاں تمام خواہد شد

"যদি মক্তব আর মোল্লার অবস্থা এমনই হয়, তবে তো পড়ুয়াদের দফা-রফা শেষ হয়ে যাবে।"

কয়েকটি ব্যাখ্যামূলক বিষয়

১। وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ আয়াতে أَبَابِيلَ বলা হয়েছে পাখিদের ঝাঁককে। শব্দটির অর্থে 'দলবদ্ধ হওয়া ও সারিবদ্ধ থেকে একে অন্যের পেছনে চলা'—বিষয় দুটি একইসঙ্গে রয়েছে। অর্থাৎ, ওইসব পাখি উদ্দেশ্য যারা ঝাঁকের পর ঝাঁক সারি বেঁধে ওড়ে এবং একে অন্যের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। যেমন অভিধানে আছে—

الأبابيل الفرق طيرا أبابيل متتابعة مجتمعة

"আবাবিল শব্দের অর্থ পাখিদের ঝাঁক, যারা দলবদ্ধ হয়ে একে অন্যের পেছনে চলতে থাকে।"

আর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেছেন— الأبابيل اى تتبع بعضها بعضا 'আবাবিল শব্দের অর্থ একে অন্যকে অনুসরণ করা।' মুজাহিদ রহ. থেকেও এমন বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে : আর সারিবদ্ধ হয়ে এমনভাবে উড়তে থাকে যে, একে অন্যের পেছনে লেগে রয়েছে, যা ছোট পাখিদের কোনো কোনো প্রজাতির স্বভাবগত ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। কতিপয় ভাষাবিদ বলেন, এটি إبالة শব্দের বহুবচন। আর

অধিকাংশের মতে শব্দটি এমন বহুবচন যার একবচন নেই : الأبابيل جمع لا واحد له।

২। تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ আয়াতে حجارة শব্দটিকে سجيل-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটা এই সত্য প্রকাশ করছে যে, তার দ্বারা ওই বস্তু উদ্দেশ্য যাকে ফারসিতে 'সাঙ্গে গিল' এবং উর্দু ভাষায় 'কঙ্কর' বলা হয়। আর পাথর বা পাথরের টুকরোকে سجيل বলা হয় না। বরং পাথরকে حجر আর পাথরের খণ্ড বা টুকরো পাথরকে حصى বলা হয়।

আরবি ভাষাবিদগণ পাথর ও পাথরের মতো কঠিন বস্তুসমূহের মধ্যে যে-পার্থক্য বর্ণনা করে থাকেন তার সারমর্মও এটাই। অর্থাৎ, حجر পাথর আর حصى খণ্ড খণ্ড বা টুকরো টুকরো পাথর। سجيل অর্থ কঙ্কর বা সাঙে গিল। الخذف। মাটির পাত্রের ভেঙে যাওয়া টুকরোসমূহ।

সুতরাং, যে-ব্যক্তি حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ-এর অর্থ পাথর বা খণ্ড খণ্ড পাথর বুঝে নিয়ে تَرْمِيهِمْ-এর তরজমা করেছেন 'প্রস্তর বর্ষণ করছিলো', তিনি ভুল করেছেন। কেননা, এটা আরবি ভাষা ও আরবের পরিভাষার বিপরীত। সুতরাং, এই অর্থের ওপর ভিত্তি করে যে-তাফসির করা হয়েছে তা-ও সঠিক হতে পারে না। যদি বলা হয়, কুরআন মাজিদ রূপক অর্থে প্রস্তরখণ্ডকে سجيل বলেছে, তবে প্রমাণ করতে হবে যে, কী কারণে কুরআন মাজিদ আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করে এখানে রূপক অর্থ ব্যবহার করেছে।

আর যদি سجيل-এর আভিধানিক অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে এ-কথা বলতে হবে যে, কুরাইশরা মক্কার যে-পাহাড়ের ওপর আরোহণ করে কঙ্কর ছুঁড়েছিলো সেই পাহাড়ের ওপর এত কঙ্কর কোথা থেকে এলো? কারণ পাহাড়ের ওপর টুকরো টুকরো পাথর বা পাথরের খণ্ড তো পাওয়াই যায়; কিন্তু কঙ্কর পাওয়া যায় না।

৩। فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ আয়াতটি নির্দিষ্টভাবে এ-কথাই বুঝাচ্ছে যে, কঙ্করবর্ষণে এমন বিশাল সেনাবাহিনীর—যাতে হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য ছাড়াও দৈত্যাকার হস্তীযূথও ছিলো—ভক্ষিত তৃণ বা ভূষিত মতো

হয়ে যাওয়া এবং পলায়ন করে প্রাণ বাঁচানোর সুযোগও না পাওয়া আল্লাহ তাআলার অলৌকিক ক্ষমতাবলেই ঘটেছে; বোধগম্য ও স্বাভাবিক কার্যকারণে তা ঘটে নি।

উপদেশ ও শিক্ষা

এক.

ধর্মসমূহের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, জাতি ও সম্প্রদায়সমূহকে তাদের পাককাজের কারণে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শাস্তি প্রদানের বিধান তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী দুই যুগে দুইভাবে বিভক্ত রয়েছে।

ক। যতদিন পর্যন্ত সত্য ধর্মের অনুসারীবৃন্দ এবং আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসুলগণের অনুগতদের সংখ্যা শত্রু ও বিরোধীদের মোকাবিলায় এত কম ছিলো যে, সাধারণ অবস্থায় তারা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিলো, ততদিন পর্যন্ত পুরাটা সময়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জমিন ও আসমান, অর্থাৎ, পার্থিব ও ঐশী উপকরণসমূহ দ্বারা তাদের সাহায্য ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছিলো এবং সত্যের শিক্ষা ও সততা থেকে বিমুখ উদ্ধত ও অবাধ্যাচারী জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর ওপর আল্লাহ তাআলা সরাসারি বিভিন্ন পার্থিব শাস্তি ও আসমানি আযাব নাযিল করছিলেন। যেমন, নুহের সম্প্রদায়, আদ, সামুদ, আসহাবুল আইকাহ, ফেরআউন, ফেরআউনের জাতি এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতিসমূহ সবাই এ-ধরনের শাস্তি ও আযাব দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। এই সময়কাল হযরত মুসা আ. পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে।

খ। যখন সত্য ও সততার জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের সংখ্যা এই পর্যায়ে আসে পৌঁছলো যে, তারা শত্রুদের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত, তখন আল্লাহ তাআলার বিধান হলো এমন যে, সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ও মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হলো তারা যেনো যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলা করে এবং সত্যধর্মের সুরক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে। তার সঙ্গে সত্যনবীদের মাধ্যমে এই

প্রতিশ্রুতিও দেয়া হতে থাকলো যে, পরিণতিতে আল্লাহ তাআলার সাহায্য এবং বিজয়ই তোমাদের প্রাপ্য—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।"[১৫৬]

আর কোনো কোনো সময় এই সাহায্য ও বিজয় যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরেশতাবাহিনী প্রেরণের দ্বারাও পূর্ণ হয়ে থাকে, আবার কোনো কোনো সময় তার প্রয়োজনও মনে করা হয় না।

মোটকথা, যখনই কোনো জাতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর এবং আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসুলগণের সত্যতা জেনে নেয়ার পর শত্রুতা ও অহমিকায় স্ফীত হয়ে সত্যের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি সত্যকে মুছে ফেলার জন্য নিষ্ফল চেষ্টায় মেতে উঠেছে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কর্মফলের চরকায় উঠিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আস্বাদন করিয়ে অস্তিত্বের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলেছেন। আর তাদেরকে শাস্তি প্রদানের বিধান সাধারণভাবে দুইযুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও হেকমত কোনো বিশেষ কর্মপন্থার পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং, সম্ভবত আমাদের এই বিভাজনের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমও থাকতে পারে। অবশ্য অনুসন্ধান ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে আমাদের এই বিভাজন নিঃসন্দেহে সঠিক।

দুই.

কা'বাতুল্লাহর বিরুদ্ধে আসহাবুল ফিলে অভিযান আবাধ্যাচারী জাতি ও সম্প্রদায়ের শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত বিধানের দ্বিতীয় যুগে ঘটে থাকলেও তা এমন পরিস্থিতি ও এমন যুগে ঘটেছিলো যার সঙ্গে প্রথম যুগের সামঞ্জস্যশীলতা ছিলো। অর্থাৎ, হযরত ইসা আ.-কে আসমানে তুলে নেয়ার পর ফাতরাতে ওহির (ওহি বন্ধ থাকার) সময়ে কোনো রাসুল ছিলেন না, কোনো নবীও ছিলেন না এবং সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও চোখে পড়তো না। সত্য ধর্মের অনুসারী থাকলেও তারা ছিলো সংখ্যায় নগণ্য ও বিচ্ছিন্ন; তারা এমন কোনো শক্তিশালী দল ছিলো না যে কা'বা

---

[১৫৬] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৯।

গৃহকে রক্ষা করার জন্য মুখোমুখি যুদ্ধ করতে পারতো। বরং দেখা যাচ্ছে, হযরত ইসা আ.-এর ধর্মের একজন দাবিদারই ইবরাহিমি কা'বা ও তাওহিদের কেন্দ্রকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলো।

আর মক্কার মুশরিকগণ শিরক ও কুফরের অবলম্বনকারী হওয়া সত্ত্বেও কা'বা তথা বাইতুল্লাহর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। কিন্তু তারা আবরাহার দৈত্যাকৃতির হস্তীযূথসহ বিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে কা'বাকে কা'বার মালিকের হাতে সোপর্দ করে পাহাড়ের ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। এই অবস্থায় মাত্র দুটি পন্থাই হতো পারতো : প্রথম পন্থা এই যে, আবরাহা ও তার সেনাবাহিনী (আসহাবুল ফিল) সফলকাম হয়ে আল্লাহর ঘর কা'বাকে ধ্বংস করে দিতো; আর দ্বিতীয় পন্থা ছিলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের এমন নিদর্শন (মুজিযা) প্রকাশ করেন যা পার্থিব কার্যকারণ ও উপকরণের উর্ধ্বে থেকে তাওহিদের কেন্দ্র ও গোটা বিশ্বের কেবলা কা'বা গৃহের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার যিম্মাদার হবে এবং আবরাহা ও তার সেনাবাহিনী আসহাবুল ফিলকে অবাধ্যাচারী জাতি ও সম্প্রদায়সমূহকে শাস্তি প্রদানের প্রথম যুগ অনুযায়ী ধ্বংস করে দেবেন, যাতে এই ঘটনা বিশ্বের মানুষের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা লাভের কারণ হয়। ফলে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পন্থারই প্রকাশ ঘটেছিলো এবং তাঁর অস্বাভাবিক কুদরতি ক্ষমতা আসহাবুল ফিলের ওপর যে-আসমানি আযাব নাযিল করেছিলো, সুরা ফিলে সেটাই বর্ণিত হয়েছে।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ

"তা এইজন্য যে, আল্লাহ তাআলা সত্য।"[১৫৭]

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ

"আর তা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়।"[১৫৮]

তিন.

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মগ্রহণের কয়েকদিন পূর্বে আসহাবুল ফিলের ঘটনাটি ঘটেছিলো।[১৫৯] এটা ছিলো

---

[১৫৭] সুরা হজ্জ : আয়াত ৬।

[১৫৮] সুরা ইবরাহিম : আয়াত ২০।

সেই সময়, যখন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাওহিদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সত্যশিক্ষার দাবিদার সব জায়গাতেই ছিলো; কিন্তু সত্যশিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। ধর্ম ও আদর্শসমূহের আসল রূপ ও প্রকৃতিকে পরিবর্তন ও বিকৃতির ব্যাধি সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছিলো। প্রতিটি জায়গাতেই কুফর ও শিরকের ব্যাপক বিস্তার ছিলো। কোথাও প্রতিমাপূজা হচ্ছিলো, কোথাও নক্ষত্রপূজার তৎপরতা ছিলো, কোনো কোনো স্থানে অগ্নিপূজাই ছিলো ইবাদতের উদ্দেশ্য, আবার কোথাও কোথাও বস্তুপূজাই ছিলো ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। কোথাও ত্রিত্ববাদ জায়গা করে নিয়ে হযরত ইসা আ.-কে মাসিহ ইবনুল্লাহ (ইসা আল্লাহর পুত্র) বানিয়েছিলো। কোনো কোনো সম্প্রদায় উযাইর ইবনুল্লাহ (উযাইর আল্লাহর পুত্র) বলে ধর্মের নামে চালিয়ে দিয়েছিলো। মোটকথা, গোটা বিশ্বজগতে হয়তো আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হচ্ছিলো অথবা প্রতিমাপূজা, বস্তুপূজা, নক্ষত্রপূজা, প্রাণিপূজা ইত্যাদি দার্শনিক চিন্তা-চেতনার আড়ালে শিরক ও কুফরকেই প্রবল করে তুলছিলো। এভাবে পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া সবকিছুই ছিলো; যা ছিলো না তা হলো এক আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগি।

এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হলো যে, এখন হেদায়েতের আলো ও দীপ্তি এবং রিসালাতের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। তা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষকেই নয়, বরং সমগ্র জগতের মানবকুলকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করবে; বস্তুপূজার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও ইবাদতের শিক্ষা প্রদান করবে; পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে; বিপথগামী দাসদেরকে সত্যিকার মালিক ও মনিবের সঙ্গে মিলেয়ে দেবে; বিচ্ছিন্ন সম্পর্ককে জোড়া দেবে এবং অজ্ঞতার শৃঙ্খলসমূহ ছিন্ন করবে। তা হবে হযরত ইবরাহিম আ.-এর প্রার্থনা এবং হযরত ইসা আ.-এর সুসংবাদের নির্যাস। এবং তা হবে তাওহিদের কেন্দ্র কা'বার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার

---

[১৫৯] সিরাতের কিতাবসমূহে প্রবল মত এই যে, এই ঘটনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মগ্রহণের পঞ্চাশ দিন পূর্বে ঘটেছিলো।

আহ্বানকারী, যা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সবচেয়ে প্রাচীন ও পবিত্র গৃহ এবং যার নির্মাণের গৌরব হযরত ইবরাহিম আ. ও হযরত ইসমাইল আ.-এর মতো নবীদ্বয়কে প্রদান করা হয়েছে। আজ ইসরাইলের (ইসহাকের) বংশধর থেকে 'সত্যের দাওয়াতের আমানত' ফেরত নেয়া হয়েছে। কারণ তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অসিয়ত বিস্মৃত হয়েছে। তারা হযরত ইয়াকুব আ.-এর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো—

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (سورة البقرة)

"আমরা আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এরই ইবাদত করবো। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।"" [সূরা বাকারা : আয়াত ১৩৩]

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাদের থেকে ওই আমানত ফেরত নিয়ে আজ ইসমাইল আ.-এর বংশধরকে দান করা হয়েছে। সময় অত্যাসন্ন যে, রিসালাত ও নবুওতের চাঁদ হেরাগুহা থেকে উদিত হবে এবং সত্যের সূর্য হয়ে গোটা পৃথিবীর ওপর দীপ্তিমান হবে। তাঁর ধর্ম ইবরাহিমি ধর্ম বলে অভিহিত হবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম ঘর কা'বা পুনরায় পৃথিবীর কেবলা ও বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থল হবে।

একদিকে আল্লাহ তাআলার এই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু অপরদিকে পৃথিবীর এক তুচ্ছ অস্তিত্ব ইয়ামান ও হাবশার ক্ষণস্থায়ী রাজত্বের দম্ভে চাচ্ছিলো যে, তাওহিদের কেন্দ্র ও সত্যধর্মের কা'বা বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করে দিয়ে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিয়ে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্র সানআর 'আল-কুল্লাইস' গির্জাকে মানবজগতের উদ্দিষ্ট কেবলা ও প্রশংসিত কা'বা বানিয়ে দেবে। এইভাবে সে তাওহিদের স্থলে ত্রিত্ববাদী শিরকিপনার প্রসার ঘটাবে। সে মনে করেছিলো, আমার বিরাট সেনাবাহিনী এবং শক্তি ও প্রতাপের মোকাবিলায় গোটা আরব অক্ষম ও অসহায়। তার এই বিশ্বাস ছিলো যে, তার ভয়ঙ্কর হস্তীবাহিনী যখন কা'বাতুল্লাহকে মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য অগ্রসর হবে, তখন আল্লাহর

ঘরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। এইজন্য সে শক্তি ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রদর্শন করে ইয়ামান থেকে যাত্রা করেছিলো এবং পথিমধ্যে যে-গোত্রগুলো তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলো তাদেরকে পদদলিত করে সে অগ্রসর হচ্ছিলো। কুরাইশের সরদার আবদুল মুত্তালিব তার সামনে উপস্থিত হলে সে অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেছিলো, আমার উদ্দেশ্য কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়; কা'বা গৃহকে ধসিয়ে দেয়া ও ধ্বংস করাই আমার উদ্দেশ্য। আবদুল মুত্তালিব অপূর্ব ও শিক্ষণীয় ভঙ্গিতে তাঁর অপারগতা ও প্রতিরোধে অক্ষমতা প্রকাশ করে কা'বাকে কা'বার মালিকের হাতে সোপর্দ করে দিলেন এবং গোটা সম্প্রদায়সহ আবরাহার প্রতিরোধের পথ থেকে সরে গেলেন।

এখন মোকাবিলা মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়; বরং ফেরআউনের মতো ও হামানের মতো মনুষ্যশক্তি আল্লাহর শক্তির সঙ্গে লড়তে চাচ্ছে। এখানে মানুষের উদ্দেশ্য অন্য মানবদের উদ্দেশ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং আল্লাহ তাআলার পবিত্র উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক অশুচি হীন অস্তিত্বের অপবিত্র উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাচ্ছে। পরিণাম কী হলো। তা-ই হলো যা হওয়া উচিত ছিলো। আল্লাহর অলৌকিক শক্তির সামনে মনুষ্যশক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। আর আসহাবুল ফিলের অসৎ উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সৎ উদ্দেশ্যের সামনে خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ-এর[১৬০] প্রয়োগক্ষেত্র হয়ে থাকলো।

আজ আসহাবুল ফিলের নাম-চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। সানআ নগরীর আল-কুল্লাইস গির্জারও অস্তিত্ব নেই। মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায়ও বেঁচে নেই যাদের চোখ সেই দৃশ্য দেখেছিলো। কিন্তু তাওহিদের কেবলা ও সত্যের কেন্দ্র কা'বাতুল্লাহ আগের মতোই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়ে আছে। আর আজো কুরআন মাজিদ তার সুউচ্চ মাহাত্ম্য জোরেশোরে ঘোষণা করছে—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (سورة آل عمران)

---

[১৬০] "সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"—সুরা হজ : আয়াত ১১।

'নিশ্চয় মানবজাতির জন্য (আল্লাহকে স্মরণ করার উদ্দেশে) সর্বপ্রথম যে-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা তো বাক্কায় (মক্কার অপর নাম বাক্কা), তা (পুরোপুরি) বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৭]

চার.

সুরা ফিল পাঠ করলে দুটি বিষয় পরিষ্কার বোধগম্য হয় :

একটি এই যে, এই সুরায় এক অবাধ্যাচারী ও খোদাদ্রোহী দলের ধ্বংসপ্রাপ্তির উপদেশমূলক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে কা'বাতুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা রক্ষার এক শিক্ষণীয় পরিণতির প্রকাশ ঘটেছে।

বাকি থাকলো এই বিষয়টি যে, এই ঘটনা বর্ণনা করার যে-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাতে কী রহস্য ও প্রজ্ঞা নিহিত আছে। তো যদিও আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও হেকমত আয়ত্ত করা নশ্বর মানুষের সম্ভাবনা-পরিধির বাইরে, তারপরও সূক্ষ্ম অনুমানের প্রেক্ষিতে দুটি হেকমত দৃষ্টির সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে :

ক। এই ঘটনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মগ্রহণের একটি শক্তিশালী নিদর্শনের ভূমিকা রাখে। কারণ, আল্লাহ তাআলার প্রকৃতিক শৃঙ্খলার প্রকাশিত চিত্রমালা আমাদেরকে এই সংবাদ প্রদান করে যে, এই পৃথিবীর কারখানায় যখনই কোনো বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়, তার অস্তিত্বপ্রাপ্তির পূর্বে অবশ্যই এমন লক্ষণ ও এমন নিদর্শন প্রকাশ পায় যা দেশে শিক্ষা গ্রহণকারী চোখ এবং সত্যসন্ধানী মানুষ আসন্ন বিপ্লবের অনুমান করতে পারে। শুধু মানুষই নয়, আল্লাহ তাআলা প্রাণিজাতির মধ্যেও এমন অনুভূতিশক্তি দিয়েছেন যে, তারা তুফান ও ভূমিকম্পের মতো ঘটনা কেবল আলামত ও লক্ষণ দ্বারাই বুঝতে পারে এবং সময় হওয়ার পূর্বেই তাদের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার দ্বারা দূরদর্শী মানুষকে সেসব সত্য সম্পর্কে অবহিত করে থাকে।

দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দৈনন্দিন পরিবর্তনকেই দেখুন এবং তার দ্বারা এই বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করুন। অন্ধকার রাতের কয়েক ঘণ্টার আয়ু যখন শেষ হয়ে আসে এবং জগতোজ্জ্বলকর সূর্যের উদয়ের

ফলে রাত তার অবসানের বার্তা পেয়ে যায়, তখন এমনটা হয় না যে, রাতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সূর্য বিশ্বজগতে তার দীপ্তোজ্জ্বল মুখের আলো ছড়িয়ে দেয়; বরং এমনটা হয় যে, প্রথমে আকাশের পূর্ব দিগন্তে ঊষার শুভ্রতা প্রকাশ পায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধকারকে আলোতে রূপান্তরিত করে। এই সময় প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তি এটা বুঝে নেন যে, আকাশে সূর্যের আলো বিকীর্ণ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। যারা নিদ্রামগ্ন তারা অন্ধকার রাতের আকস্মিক মৃত্যু আর ভোরের শুভ্রতার ঘোষণাকারী সূর্যোদয় সম্পর্কে উদাসীনই থেকে যায়; কিন্তু সচেতন ব্যক্তি এই লক্ষণ দেখে দীপ্তিময় দিবসের আগমন সম্পর্কে অবগত হয় এবং উদাসীনতা ও অজ্ঞতার নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে। যাতে দিবসকে আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যের আলো বিকীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিকেজে যোগ্য করে তুলতে পারে।

বস্তুজগতের এই পরিবর্তনের মতো আত্মিক জগতেও 'আল্লাহর নীতি' একইভাবে প্রচলিত ও প্রবহমান আছে। কেননা, গোটা সৃষ্টিজগতের 'রব' (প্রতিপালক) একমাত্র 'ওয়াহ্‌দাহু লা-শারিকা লাহু'র[১৬১] সত্তা। সুতরাং প্রতিটি জগতের[১৬২] জন্য আল্লাহ তাআলার নীতি ও নিয়মের মধ্যেও ঐক্য ও সমতা বিদ্যমান।

আত্মিক জগতে বস্তুজগতের উপস্থিতির ফলে এই পরিবর্তন তো ঘটেই চলেছে যে, যখনই আল্লাহ তাআলার তাওহিদ ও একত্ববাদের ওপর শিরক ও কুফরির অন্ধকার প্রবল হয়ে উঠেছে, তখনই আল্লাহর বিধান কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্র বা চন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্রের মাধ্যমে ওই অন্ধকারকে কর্পূরে[১৬৩] পরিণত করে দিয়েছে। কিন্তু তখনো বিশ্বজগৎ এমন আলোর প্রার্থী ছিলো যার উদয়ের পর আলো ও অন্ধকারের পার্থক্য এতটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আর কখনো কুফরের অন্ধকার তাওহিদ ও একত্ববাদের আলোর ওপর এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না যে, মরীচিকা ও আবে-হায়াতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, যদি

---

১৬১ তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

১৬২ বস্তুজগৎ ও আত্মিক জগৎ।

আলোকোজ্জ্বল দিবসের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোনো চামচিকা (কৃত্রিম অন্ধ, দিনকানা) দেদীপ্যমান সূর্য দেখতে না পায় তবে এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার যে, ত্রুটি কার—সূর্যের না চামচিকার?

মোটকথা, যখন ওই সময় অত্যাসন্ন হলো যে, নবুওত ও রিসালাতের জগতোজ্জ্বলকারী সূর্য (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদিত হবেন এবং শিরক ও কুফরের অন্ধকার পর্দাসমূহ— ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ —ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে, তখন আসমানে ও জমিনে সৌভাগ্য-উষার শুভ্রতার এমন লক্ষণ ও নিদর্শন প্রকাশ পেতে শুরু করলো। সত্যদর্শী চোখ ও সত্যিকার হৃদয় অনুভব করতে পারলো যে, অচিরেই আত্মিক জগতে এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হবে এবং সেই সময় আসছে যাতে অন্ধকার রাতের কাহিনির অবসান ঘটবে, সত্যের সূর্য অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং অন্তর ও জবান সমস্বরে এ-কথা বলতে বাধ্য হবে যে—

نہ شبم نہ پرستم کہ حدیث خواب گویم

چوں غلام آفتابم ہمہ زآفتاب گویم

"আমি রাতও নই, রাতের পূজারীও নই যে, স্বপ্নের কথা বলবো।/
যখন আমি সূর্যের দাস, তখন সবকিছু সূর্য থেকেই বলবো।

আত্মিক জগতের এই জাজ্বল্যমান প্রদীপ[১৬৪] মক্কার ভূমি থেকে উদিত হওয়ার ছিলো এবং এই পবিত্র স্থানটি তাঁর বিস্তৃত ও ব্যাপক দাওয়াতের কেন্দ্রস্থল হওয়ার ছিলো, যেখানে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সবচেয়ে প্রাচীন গৃহ কা'বাতুল্লাহ গোটা বিশ্ব ও বিশ্বাবাসীর কেবলা। এই মহাবিপ্লবের সময় শিরক ও কুফরের অন্ধকার শেষ কামড় দিতে চাইলো এবং সূর্যের আলোর ওপর প্রবল হওয়ার চেষ্টা করলো। এই চেষ্টার দৃশ্য আবরাহা ও তার সেনাবাহিনী আসহাবুল ফিলের বদৌলতে পৃথিবীর চলমান পর্দায় দৃষ্ট হলো : কোনো-না-কোনোভাবে তাওহিদের কেন্দ্র

---

[১৬৪] কুরআন মাজিদেও বস্তুজগতের সূর্যকে প্রদীপ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا 'এবং তিনি সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ।' এ-কারণে আমি আত্মিক জগতের সূর্যকেও প্রদীপ বললাম।—লেখক

কা'বাতুল্লাহকে ধ্বংস করে দিয়ে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্র আল-কুল্লাইসকে সৃষ্টিজগতের কেবলা ও ইবাদতের উদ্দিষ্ট স্থান বানিয়ে দেয়া হোক, যাতে শিরকের অন্ধকার এমনভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে যে, সূর্য আর উদিত হওয়ারই সুযোগ না পায়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়কে কোনো শক্তিই রুখে দিতে পারে না এবং আল্লাহ তাআলার সংকল্পের বিরুদ্ধে কোনো সত্তাই জয়ী হতে পারে না। ফলে দুনিয়া দেখলো যে, এই দৃশ্য খুব দ্রুতই চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং তাকে মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দেয়া হলো। তার কিছুকাল পরেই নবুওত ও রিসালাতের জগতোজ্জ্বলকারী সূর্য দীপ্তিমান সূর্য আল্লাহ তাআলার সমগ্র সৃষ্টিকে আলোকিত করে দিলো।

সুতরাং, এখন বলা উচিত যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে পবিত্র জন্মগ্রহণের পূর্বে যে-নিদর্শনগুলো প্রকাশ পেয়েছিলো এবং সৌভাগ্য-উষার লক্ষণ ও আলামত বলে অভিহিত হয়েছিলো তার মধ্যে আসহাবুল ফিলের ঘটনাও একটি বিরাট নিদর্শন এবং অতি উচ্চস্তরের আলামত।

খ। এই ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে তাঁর অতি বড় এক অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারা যেনো ভুলে না যায় যে, তারা কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও আবরাহা (আসহাবুল ফিল) কা'বা গৃহকে ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে যে-অভিযান পরিচালনা করেছিলো তা প্রতিহত করতে অক্ষম ছিলো। সে-সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের অলৌকিক নিদর্শনরূপে শত্রুদের অনাচারমূলক ষড়যন্ত্র এবং তাদের অসৎ সংকল্প দুটিই নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

তোমরা কি এই উপদেশমূলক ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ করো নি যে, এ-সবকিছু তোমাদেরকে খুশী করার জন্য ছিলো না, কারণ তোমরা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুফরের পঙ্কিলতায় নোংরা ছিলে; বরং তা করা হয়েছিলো কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য, যা প্রবীণ নবী ইবরাহিম আ. ও তরুণ নবী ইসমাইল আ.-এর হাতে নির্মিত হয়েছিলো। তার সম্পর্কে ইবরাহিম আ. বলেছিলেন—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (سورة إبراهيم)

"হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরদের কতিপয়কে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের কাছে, হে আমার প্রতিপালক, এইজন্য যে, তারা যেনো সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭]

এবং তা (আবরাহা ও আসহাবুল ফিলকে ধ্বংস) করা হয়েছিলো পবিত্র হরম শরিফের খাতিরে, যার ইবরাহিম আ. আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

(سورة إبراهيم)

'স্মরণ করো, ইবরাহিম বলেছিলো, " হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে (মক্কা মুকাররমাকে) নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমাপূজা থেকে দূরে রেখো।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৫]

আজ আবার সেই সময় এসেছে যে, আল্লাহ তাআলার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাকে প্রতিমা ও প্রতিমাপূজার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে ও মুসলমানদেরকে নগণ্য ও দুর্বল মনে করে এবং নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার গর্বে স্ফীত হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করছো। তবে কি তোমরা মনে করো যে, যে-মহান সত্তা আসহাবুল ফিলের শক্তি ও অহমিকাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তোমাদের তোমাদের প্রতাপ ও অহঙ্কারের তেমন দুর্দশা ঘটাতে পারবেন না?

অনুধাবন করো এবং বিষয়টির সত্যতার ওপর চিন্তা করো এবং আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত হও।

সুরা ফিলের পরে সুরা কুরাইশের মাধ্যমেও এই বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, এই সুরায় কুরাইশদেরকে এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বা তাদের ওপর এই অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে যে, আরবের গোত্রগুলো কথায় কথায় যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সাধারণ ও তুচ্ছ ব্যাপারে হানাহানি-মারামারি করা সত্ত্বেও মক্কার হরমের মধ্যে কেমন নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে; শুধু তা-ই নয়, বরং হরম শরিফে কা'বা গৃহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে হরমের বাইরেও শীত ও গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে তাদের প্রিয় বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়া ও ইয়মানে নির্ভয়ে ও নিরাপত্তার সঙ্গে যাতায়াত করতে পারছে, এমনকি কেউ তাদের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারে না।

তারা কি আল্লাহ তাআলার এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না এবং কা'বার সত্যিকার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য তাঁর সর্বশেষ নবী (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে যে-সত্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, সেই আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত হবে না? তাদের জন্য এমন আচরণ কিছুতেই শোভনীয় নয়। কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ () الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (سورة قريش)

"তারা যেনো এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করেন এবং তাদেরকে ভয় থেকে নিরাপদ রাখেন।" [সুরা কুরাইশ : আয়াত ৩-৪]

পাঁচ.

আবরাহা খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলো। এজন্য সে কিছুতেই বাইতুল্লাহর (কা'বা শরিফের) মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বরদাশত করতে পারছিলো না। কা'বার অস্তিত্ব তার অন্তরে যেনো কাঁটার মতো বিঁধছিলো। সে ভাবলো, কা'বা সাধারণ পাথরের তৈরি একটি সাদামাটা ঘর। তার মোকাবিলায় যদি গির্জার আকারে একটি অত্যন্ত সুন্দর ও তুলনারহিত অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়, যা মহামূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা দ্বারা সুশোভিত হবে, তা হলে সমগ্র আরবের মনোযোগ কা'বা গৃহ থেকে সরিয়ে ফেলতে

পারবো এবং এভাবে উপাসনাকেন্দ্রটিকে গোটা বিশ্বাবাসীর তীর্থে পরিণত করবো। এই ভাবনা ভেবে সে একদিকে ইয়ামানের রাজধানী সানআয় 'আল-কুল্লাইস' নামে একটি অতুলনীয় গির্জা নির্মাণ করলো। আর অপরদিকে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে বাহানা বানিয়ে কা'বা গৃহকে ধ্বংস করার আয়োজন করলো। তার পরিণাম কী হয়েছিলো তা ইতোপূর্বে বিস্ত ারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু এই ঘটনায় এ-কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয় যে, পৃথিবীর সব সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে কা'বা গৃহের প্রতি খ্রিস্টানরাই সবচেয়ে বেশি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করবে এবং তারা তাদের সভ্য ও অসভ্য সব যুগে ও সবসময়ে কা'বা গৃহের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকবে এবং সবসময়ই তাওহিদের এই কেন্দ্রটির পেছনে লেগে থাকবে। অতীতকালের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, খ্রিস্টানরা যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই কার্যত তাদের শত্রুতা প্রকাশ না করে ছাড়ে নি। যদিও আল্লাহ তাআলা এ-ব্যাপারে তাদের সব ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকে সবসময় নস্যাৎ করে দিয়েছেন, কিন্তু তারা সর্বদা তাদের অন্তরগত শত্রুতাভাব এবং হিংসা ও বিদ্বেষের প্রমাণ না দিয়ে থাকে নি।

ছয়.

কা'বা গৃহকে বাইতুল্লাহ, অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ঘর বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলা কোনো ঘরে বসবাস করেন বা তিনি কোনো গৃহের মুখাপেক্ষী। প্রকৃত সত্য এই যে, তাঁর উদ্দেশে একনিষ্ঠ ইবাদতের জন্য দুনিয়ার সব প্রান্ত থেকে ছুটে আসা মুসলমান ও ইবাদতকারীদের জন্য কা'বা গৃহকে তিনি কেন্দ্রস্থল বানিয়েছেন। তা এ-কারণে যে, আল্লাহ তাআলা দিক ও অবস্থান থেকে পবিত্র; আর মানুষ তার প্রতিটি কাজের মধ্যে দিকসমূহের কোনো একদি দিকের মুখাপেক্ষী। ফলে অত্যন্ত জরুরি ছিলো যে, গোটা বিশ্বের তাওহিদের অনুসারী ও ইবাদতকারীদের ইবাদত ও ধর্মীয় জীবনযাপনের জন্য একটি কেন্দ্রস্থল হোক, যাতে তারা অনৈক্য ও বিভক্তি থেকে রক্ষিত থাকে এবং সমষ্টিগতভাবে একত্বের শিক্ষা লাভ করে।

এ-কারণে এই পবিত্র ঘরটিকে শাআয়িরুল্লাহ বা আল্লাহর নিদর্শন নির্ধারণ করা হয়েছে যাকে সকল নবী ও রাসুলের মুজাদ্দিদ হযরত

ইবরাহিম আ. ও তাঁর পবিত্রাত্মা পুত্র হযরত ইসমাইল আ. সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। এই গৃহ ছিলো তাওহিদের ঘোষণার সবচেয়ে প্রাচীন স্মৃতি—

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (سورة الحج)

"এবং (স্মরণ রেখো) কেউ আল্লাহর নির্দেশনাবলিকে সম্মান করলে তা তার হৃদয়ের তাকওয়াসঞ্জাত (অন্তরের পরহেযগারিমূলক বিষয়সমূহের অন্তর্গত)। [সুরা হজ : আয়াত ৩২]

সুতরাং, কোনো মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে কা'বা গৃহের সম্মান করবে এই জন্য যে তা দেবতা বা নিজেই উপাস্য। কারণ, যে-ব্যক্তি এমন বিশ্বাস রাখে সে মুসলমান নয়; তাকে বরং মুশরিক বলা হবে। কা'বার মর্যাদা কেবল এইজন্য যে, তা আল্লাহ তাআলার নিদর্শন ও তাওহিদের কেন্দ্রস্থল। যেমন, একজন আল্লাহর পরিচয়জ্ঞানী (আরিফ বিল্লাহ) ব্যাপারটিকে ব্যক্ত করেছেন এই বাক্যে—

قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہے

"চিন্তাশীল মানুষ কেবলাকে কেবলা-প্রদর্শক বলে থাকেন।"

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"সুতরাং, হে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

contents

মাকতাবাতুল ইসলাম

ISBN 978-984-90977-4-7

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
১১/১ ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০